তালাক ও অন্যান্য গল্প

মহাশ্বেতা দেবী

মনীষা

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারী, ১৯৬৪

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
কালান্তর প্রেস,
৩০/৬, ঝাউতলা রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৭

সূচীপত্র

তালাক
ও
অন্যান্য গল্প

১ তালাক

কুলসমের শাদিয়ার পর কুলসম বাপকে বলেছিল, 'কি দেখেছিলে বলতে পার? জমি নি, জিরেত নি, হাঁস মুরগি, কিছু নি? না কি তোমার ঘরে পুষ্যি নি, তাই পুষতে সাধ হইছিল?'

কিন্তু কুলসম পরে বুঝেছিল আসগর মানুষটা ভারি ঠাণ্ডা। 'নিনু' হয়ে থাকতে জানে। কুলসমকে ও বলেছিল, 'তোর বাপে টাকা দিবে যি? মুরগি পেলো ডিম বেচলে পেট চলে না?'

কুলসমের বাপ টাকা দিয়েছিল মেয়ের হাতে। মুরগি পেলে হাঁস পেলে। ডিম বেচে কুলসম যা পেত, হাতে রাখত। আসগর শরীরে খাটত ভূতের মত। ডায়মণ্ডহারবারে ডিম মুরগি বেচে যা পেত সব বউকে দিত।

তখন কুলসমের মনে আর দুঃখ ছিল না। বড় বোনের মত ওর পানের বরজ নেই, ছোটটার মত তিনখানা লাঙল। কিন্তু শান্তি ছিল, সুখ ছিল।

কুলসমকে আসগর সরম খুইয়ে গোবর কুড়োতে, জ্বালানী আনতে বলেনি কোনদিন। জীবনে কুলসম দোকান থেকে সওদা আনেনি। সবাই হিংসে করত কুলসমকে। ওর বাপ গনু এসে মাঝে মাঝেই মেয়ের কাছে দু-একদিন থাকত। বলত, 'হেথা বড় শান্তি মা! ফুলি দুলির সোংসারে পয়সা বেস্তর, কেচা-কেচিও খুব।'

সেই শান্তি অনেক, অনেক দিন ছিল! কুলসমের ছেলে ইস্কুলে পড়ল, জাহাজে কাজ পেল। বিয়ে হল ছেলের। থেসে গেল খিদিরপুরে। সবাই বলত, 'চাবলের গনু তিনটে মেয়ের বিয়ে তিনোরকম দিইছিল, তা কুলি ভেরাদা সুখ পেল। দেক, ছেলেটা অব্দি কেমন দাঁইড়ে গেল। হবে নে কেন তাই বল? বাপ যেয়ে ছেলেরে ইসকুলে দে আসত, নে আসত। নিজে জানে না কিছু, কিন্তু পিত্যহ সপ পেতে লন্টন জেবলে ছেলেরে পড়তে বসাত। কুলির ভাগ্য ভাল।'

সবাই বলে কুলির ভাগ্য ভাল। কুলি ছেলের টাকা মাটির নিচে পেতলের বোগনোয় জমায়, নিজে ডিম বেচে সংসার চালায়। এই বর্ষার আগেই কুলি ঘর ছাইবে আরেকখানা ঘর তুলবে, কিন্তু হঠাৎ ওর সুখস্বপ্নে মাটি পড়ল।

যেদিন আরসাদ ওকে পাড়াপড়শীর সামনে তিন তালাক দিল।

এই আরসাদই বলত, 'নিনু হয়ে থাকতে পার না? এট্টা না এট্টা কতা বলতেই হবে। এট্টা কতা হতে ভায়ে ভায়ে খুনোখুনি হয়, এট্টা কাটি হতে পেলয় অগ্নি জ্বলে যায়, ঝান না?'

সেই আরসাদই, নাতির অসুখে হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখাবে, না বড় ডাক্তার, তাই নিয়ে কুলির সঙ্গে তুলকালাম বাধাল।

কুলি বলল, 'হেথা এয়েছে, নেতাই ডাক্তার সমলে দিক। তা বাদে ওরা ঝেয়ে কলকেতায় বড় ডাক্তার দেকাবে ?'

কুলির বউ আরসাদের চাচাতো ভাইয়েরই মেয়ে। বউয়ের বাপ বলল, 'কেন ? তোমাদের অবচ্ছল রইতে নেতাই ডাক্তার কেন ?'

আরসাদ বলল, 'উ মাগীর কতা আমি শুনি না। আমার অন্তের অন্ত। ওরে আমি ডায়মনহারবার নে যাব।'

কুলি বলল, 'অবচ্ছল পয়সা তোমার, তাই না ?'

আরসাদ বলল, 'কার তরে টাকা পুঁতর্তোছস ঘরে ?'

'তোমার নাতির তরে গাইগরু কিনব বলিনি ?'

'জান আগে না দুদের বেবস্থা আগে ?'

'তুমি নে ঝেয়ে দেকাও, যদি টাকা থাকে ?'

'তোর টাকা, তাই গরম হয়েছে ?'

'ঝদি তাই হয় মড়াখেগো ?'

আরসাদ রাগে অন্ধ হয়ে চেঁচাতে শুরু করল। কুলিও চেঁচিয়ে পাড়া-প্রতিবেশী জমিয়ে ফেলল। তখন আরসাদ সদর্পে বলল, 'ঝা, তোরে আমি তালাক দিলাম।'

'তালাক দিলে ?'

'দিলাম।'

আরসাদ চেঁচিয়ে বলল, 'তালাক ! তালাক ! তালাক !'

'ই তুমি কি করলে গো ?'

কুলি মূর্ছা গেল।

মূর্ছা ভাঙল,অভিমান আর ভাঙে না কুলির। 'রইল যথাসর্বস্ব,' বলে কুলি পেতলের বোগনো থেকে চারশো টাকা নিয়ে, সোনার পেটি, রুপোর গোট নিয়ে পেটকাপড়ে বেঁধে ধবধবিতে বড়বোন ফুলির বাড়ি গিয়ে উঠল। বলল, 'ঝেথা চোক ঝায়, চলে ঝাব। ছেলে এসে বেবস্থা করুক ? উ মড়াখেগোর মুক দেকব না আমি।'

ফুলি বলল, 'তোর আড়াই কুড়ি বয়স হল, উর বয়স কোন্ না তিন কুড়ির কাচে হবে ? কোথা ঝাবি বল্ ? হেতা থাক্। তোর হাতে টাকাপয়সা আছে, ভাবনা কি তোর ?'

কুলি বলল, 'এমন নেমকহারাম হতে আছে ? আতকানা, তুমি চক্কে দেক না। লালটেম নে আমি দাঁইড়ে থাকি, তুমি বোনাইবাড়ি থে আসবে বলে ? পুরু ক্যাতা পেতে শুতে ভালবাস, কাপড় না ছিঁড়তে আমি ক্যাত করে দিই। দাওয়া বাঁদি, উটোনে শাকলঙ্কা আবজাই, লঙ্কা বিনে খেতে পার না। সেবার মিটিকেলে পাইটে তোমারে নতুন চশমা কইরে দিনু। সে তুমি টেনে থুইয়ে এলে। ফের করে দিতু এবারে ? কি জন্যি তালাক দিলে ? নাতির জন্যি ? ছোট ছেলের কাশি হয় নে ? জ্বর হয় নে ? নেতাই ডাক্তারের চিকিচ্ছেয় মোর

সান্নিপাতি অব্দি সেরে যায় সিবারে, তা বলার অস্বক সারত নে ?'

'উ ভাবিসনি একন।'

ফুলি নিজের কাজে গেল। মনে বড় সুখ ওর। দুটো সতীন নিয়ে ঘর করে ফুলি। স্বামীর সঙ্গে নিয়ত ঝগড়া হয় ওর। কুলির স্বামীভাগ্যকে চিরকাল হিংসে করেছে ফুলি। এক বুক সুখ নিয়ে ফুলি গিয়ে ছোট ছেলেকে বলল, 'ছিপ ফেলগা যা। উ মাছ ভিন্ন খায় না। আর দেখ, উর কাচে কাচে রইবি। তেমন বুজলে বলবি এটা ছাতা কিনে দেবে ?'

বড় বোনের বাড়ি থাকতে থাকতেই কুলি খবর পেল আরসাদের সেই চাচাতো ভাই এসে বাড়িতে উঠেছে। এখন দহরম মহরম খুব। নিয়ত মুরগি রান্না হচ্ছে। কুলির ছেলে ছুটি নিয়ে এখনও আসেনি।

ফুলি বলল, 'কত সাদের সোমসার তোর! তা পরের ভোগে গেল ? নিশ্চয় তোর অজানতে গোনা হইছিল কিছু ? না'লে আল্লা এমন শাস্তি তোরে দেলে কেন ?'

কুলি ফুলিকে দশকথা শুনিয়ে ছোট বোনের বাড়ি গেল। বোন বোনাই বলল, 'চেরকাল থাক না কেন ? হাতে টাকা অইতে তোমার ভাবনা কি বল ? আবার হাঁস-মুরগি কেন, একখানা ঘর তোল ?'

'সোমসারে থুতু ফেলিছি, ফিরে গিলব না।' বলে কুলি গুম হয়ে বসে রইল। বুকে যেন কুলকাঠের আংরা জ্বলে। তিলে তিলে গড়া সংসার পেছনে ফেলে আবার কি সেই সব কাজ করতে পারে কুলি ? ধান কালিয়ে গেলে সেদ্ধ করে হাঁসকে খাওয়াতে পারে ? নিমনিমে সন্ধ্যায় নতুন করে আয়-তি-তি-তি বলে হাঁস-মুরগি তুলতে পারে ঘরে ?

ছেলে এসে বলল, 'তুমি যেথা চল মা। সব খানি ভেসে গেল।'

'যাব কি পরপুরুষের সঙ্গে অইতে ? তোর বাপ একন পরপুরুষ না ?'

'বাপ বলে ··'

'কি বলে ?'

'যা হয়েচে তা হয়েচে। এর রূপায় হয়, তাই বলছিল। তা ভিন্ন...'

'কি ?'

'বাপ ভাতজল মুকে দেয় নে। দিনরাতে কানতেছে। বলে এ আমি কি কন্নু।'

কুলির মনে বিজাতীয় আনন্দ হল।

'আর কি বলে ?'

'যার জন্যি বেঁচে জীয়ে আচি, তারেই তালাক দেলাম। বউয়ের নানা বলে রূপায় হয়।'

'কি রূপায় ?'

ছেলে পা দিয়ে মাটি খুঁড়ল। বলল, 'সে তারা বলবে।'

তারা সবাই এল দুলির বাড়ি। কুলির টাকায় পাঁচজন চা-পান-বিস্কুট

খেল। বউয়ের দাদু প্রবীণ, বিজ্ঞ, প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। সবাই তাঁকে মানে।

কুলি ঘরের ভেতর থেকে শুনতে লাগল সব। গলা খাঁকরে বউয়ের দাদু বললেন, 'হারা, তো মা কি সোমসার চায় ? সোয়ামী চায় ?'

কুলির চোখে জল এল। হারা বলল, 'নিছয়'।

'তবে আর কি। ক কুড়ি টাকার মামলা।'

আবার নিকে বসুক কুলসম। গাঁয়ের ইরফান মণ্ডল রাজী আছে। বসবাসের ক রাত কাটলে ফের ইরফান কুলিকে তালাক দেবে। তখন আরসাদ তাকে বিয়ে করে নিয়ে যাবে ঘরে।

কুলি শুনে ছি ছি ছি করে উঠল। পঁয়ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে একবার অন্য কারও দিকে চায়নি কুলি। ছেলেকে সামনে রেখে বোনাইদের ভাত দিয়েছে। আজ, এই বয়সে, সাতাশ বছরের ছেলের সামনে সে এই কাজ করবে ?

'তবে যাও মর গা।'

বলে পাঁচজন রেগে চলে গেল।

আরসাদ পরদিন কাঁদতে কাঁদতে এল। বলল 'তারে বল ফুলি এ না হলি গোনা হয়। নইলে আমি এমন কথায় সায় দিই ?'

'আ গো, সি শোনে না পাঁচজনের কতা।'

'বলগা, আমি আপ্তঘাতী হব। ফাঁলডল খাব।'

কুলি ঘর থেকে ডেকে বলল, 'দুলি, বলগা যেয়ে, যি মনিষ মোরে সওদা করতে দেত না, পতে বেরোতে দেয় নে, সি মোরে ই কতা বলে কি করে ?'

কাঁদতে কাঁদতে আরসাদ চলে গেল।

কদিন বাদে খবর এল, সব বেচেবুচে দিয়ে আরসাদ ফাঁকর হয়ে যাচ্ছে। হাঁস-মুরগি, ঘরটুকু, সব নিতাই ডাক্তার পাঁচশো টাকায় কিনে নিয়েছে।

কুলি দিনেমানে চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'হাতের পেটো, উপোর গোটবিচে, সব্বস্ব থুয়ে এসেছিনু দুলি। সজনাতলায় পুঁতে একেছিনু। নে আসি।'

'হারার বাপ ঘরে অইতে ঝাবি ?'

'ঝাব আর এসব। নেতাই ডাক্তারের ঘরে মোরে যেতে দেবে কেন ?'

দুলি আর বোনাই চোখে চোখে হাসল। সব এখন তাদের না হোক কিছু কিছু তো হবে ?

'একা ঝাবি ?'

'বুড়ো হইছি। ভয়টা কি ?'

রাতোভিতে পাঁচ মাইল হেঁটে বাড়ি এল কুলি। সব সুনসান। সপ পেতে শুয়েছিল আরসাদ। কুলি ওর গায়ের কাছে মাটিতে পা ঠুকল।

'বউ আলি ?'

'মর মড়াখেগো। আমি তোর বউ কিসে রে! শোন্, আমার পেটকাপড়ে সব্বস্ব টাকা-গয়না। দুলিরে ধোঁকা দে চলে এইছি। চল্ রাতেভিতে চলে ঝাই দুজনা?'

'কেমন করে?'

'এলে চেপে? সি বারে দেকে আসিনি সব? কলকাতা ঝাব, বেকবাগানে অইব। ঘর নেব। তুমি একদিকে থাকবা আমি একদিকে অইব। নয় কাজ করব? নয় তুমি বিড়ি বাঁধবা? আমি তোমার ভাত ফুইটে দেব। তুমি নামিয়ে নেবা। কোন গোনা থাকবে না!'

'এক ঘরে যে?'

'মোরে হেঁপো উগী এরফানের ঘরে ঠেলছিলে, ই তা হতে ভাল নয়?'

'হারা কি বলবে?'

'ঝা মনে হয় তা বলবে। বলব মোরা স্তি-পুরুষের মত অই না বাপ। বুড়ো হইচি, ই এট্টা অব্যেস, তাই গোনা করিছি বল করিছি।'

'মানুষ জানলি?'

'ঝা মনে তা বলবে। লাও, ওটো।'

রাতে ওরা দুজনে চোরের মত রেলস্টেশনের দিকে হাঁটা দিল। কাল ঢি ঢি পড়বে গ্রামে। সবাই ছিছি করবে। কিছু ভাবল না কুলি।

আরসাদ বলল, 'দেকতে পাই না যি? হাতটা ধর্ তুই।'

'লাটিগাচা দাও, এক মুড়ো ধরতেছি। একা আমি তোমার হাত ধরতে পারি? দেকে পা ফেল। আলে হোঁচট খাবে।'

২ আশ্রয়

'চলে যান।'

ডাক্তার বললেন। তাঁর গলায় রাগ নেই, অনুকম্পাও নেই, শমীককে কাঁদতে দেখে তাঁর চোখের দৃষ্টি আরও ভাবলেশহীন হয়ে গেল। কিছুটা ক্লান্ত, কেননা এ ঘর থেকে বেরোবার সময়ে মাথা উঁচু করে নীরবে বেরিয়ে যেতে তিনি কম লোককেই দেখেছেন।

শমীকের চোখে অবশ্য একটু জল এসেছিল মাত্র। তার পরই সে পিঠ সোজা করে বসল। পকেট হাতড়ে দেখল টাকা আছে। থাকবার কথা-ও বটে। কেননা বিয়ের পর বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াবে বলে টাকা নিয়েই বেরিয়েছিল শমীক। ডাক্তারের টেবিলে টাকা রেখে সে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে অভিজিৎ, প্রবীর, তার দুই বন্ধু। তাদের মুখেও কথা নেই। শমীকের বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতে যেতে 'রিপোর্টটা জেনে যাই' বলে সেই যে শমীক ঢুকল, ওর সঙ্গে তারাও ঢুকেছিল।

এখন দু'জনেই বিমূঢ়, হতবাক। হাজরা রোডের মোড় দিয়ে মানুষ ভেসে যাচ্ছে। হাজরা পার্কে একজিবিশন, আশুতোষ কলেজে গানের অনুষ্ঠান। অবিরাম জনস্রোতের দিকে চেয়ে প্রবীর বললে, 'শমীক, তুই বাড়ী চলে যা। আমি মিতাদের ওখানে একটা খবর দিই।'

প্রবীরের গলার আওয়াজ ভারী, মোটা কাঁচের ওপারে চোখদুটো বিস্ফারিত, 'অভিজিৎ, তুই শমীকের সঙ্গে যা।'

'তুই কোথায় যাচ্ছিস?' শমীক আস্তে, সিগারেট ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করল। প্রবীরের এই দায়িত্বজ্ঞান, মিতাদের বাড়ীতে খবর দিতে হবে সে কথাটা মনে পড়বার মত বুদ্ধিমন্ত স্বভাব, শমীকের ভারী খারাপ লাগল। ঘৃণ্য, অসভ্যতা যেন, অথচ ঠিক এইসব গুণের জন্যেই ও প্রবীরকে পছন্দ করে।

'মিতাদের বাড়ী।'

'আমিও যাব।'

'তুই!'

প্রবীর কথা খুঁজে পাচ্ছে না দেখে শমীকের হঠাৎ আনন্দ হল, 'আমি-ই। কেননা আমার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবার কথা ছিল। যা বলবার সেটা আমিই বলব।'

অভিজিৎ সাধারণতঃ বেশী কথা বলে না। কথা বলে না, অন্যের ইচ্ছে অনিচ্ছে তামিল করে, যে যা বলে তাতেই 'হ্যাঁ' বলে সেরে দেয়। অথচ তার ভয়ঙ্কর জেদ আছে, মতামতের শেষ নেই, অন্য সময় কথা বলতেই নাকি তার আলস্য বোধ হয়।

এখন সে বলল, 'কেন, বিয়ে হবে না কেন?'

'অভিজিৎ!' প্রবীরের মুখ দেখে মনে হল শমীক মিতাকে বিয়ে করবে এর চেয়ে নোংরা কোন প্রস্তাব সে ইদানীং শোনে নি।

'হোয়াই নট! যদি ওদের বিবাহিত জীবন দু বছরের মতও হয়, তাহলেও আমি বলব ওদের বিয়ে করা উচিত।' অভিজিৎ শূন্যে ঘুষি মারল, 'মিতা নিজেই এ কথা বলবে।'

'নো, থ্যাংক য়ু। মিতার জন্যে বলছিস, তোর বোন যদি এ অবস্থায় পড়ত তাহলে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতিস?'

'নিশ্চয়। রুচিরাকে আমি উৎসাহ দিতাম, সঙ্গে থাকতাম। বিয়ে করবে বলে যখন স্থির করেছ তখন করাই উচিত।'

'অভিজিৎ, তুমি একটি হামবাগ। তোমাকে এ কথাটা বলতে হল বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু সত্যি কথা বলবার দিন এসে গেছে আমার, তাই নয় কি?'

শমীক ওদের দিকে চেয়ে হাসল, 'না, এখন আর আমি কিছু বানিয়ে বানিয়ে বলতে বাধ্য নই।'

সে এগিয়ে গেল, ট্যাক্সিতে উঠল

গোপালের ট্যাক্সি। গোপাল তার বাড়ীর কাছেই থাকত, এখন উঠে গেছে। মাঝে মাঝেই শমীকের কাছে আসত। কবে, কোন ছোটবেলা 'অভয়াচরণ' ইস্কুলে দু'জনে একসঙ্গে পড়েছে সেই দাবীতে বুকে চাপড় মেরে বলত টাকা দিতে হবে, কেন না পুলিসকে ঘুষ দিতে হবে। ফর্ম লিখে দিতে হবে, নইলে গোপালের দাদা হাসপাতালে ঔষুধ পায় না। আরো অনেক দাবি জানাত। যদিও, কিছুদিন বাদে টাকা চেয়ে না পেয়ে সে নিজেই চেঁচিয়ে বলে, 'তুই কোন কালে আমার বন্ধু নোস। 'আমার বন্ধু ছিল রজত। ওরা এখনো দশটা বিলিতী কুকুর পোষে, জানলি!'

তবু, শমীকের ভাল লাগে গোপালকে। ওর শক্ত সমর্থ শরীর, বিশ্রী কথাবার্তা, ভদ্রলোকের প্রতি ঘোর অবিশ্বাস অথচ পুরোপুরি অভদ্র হতে না পারবার অসুবিধে—দেখলে স্বস্তি পায় শমীক। বন্ধুদের মধ্যে শমীক সবচেয়ে ঠাণ্ডা, মিতভাষী, নিরীহ, তার সঙ্গে গোপালের বন্ধুত্ব অনেকের চোখেই আশ্চর্য ঠেকে।

'তোর বিয়েতে আমি ভাই, ফ্রি ট্যাক্সি সার্ভিস দেব। আমার প্রেজেন্ট ওটাই, বুঝলি না?' গোপাল হ্যা হ্যা করে হেসেছিল। 'যেখানে খুশী সেখানে ঘুরবি, মিটারে যত ওঠে উঠুক না।' এখন গোপালের সাদা জামা, হাতে বেলফুলের মালা, তার সামনে পরমহংসদেবের ছবি, তার মা-বউ-ছেলেমেয়ের ছবি এবং নিজের ফোটো ঢাকা বেলফুলের গোড়ে। গোপালের চওড়া ঘাড়, হাতের কবজি দেখে শমীক নতুন করে মুগ্ধ হল। না, গোপালের সঙ্গে সহজ হতে আর বাধা নেই কিছু। যদিও এখন মনে হচ্ছে মা, বাবা, ভাই, বোন, দাদা, বউদি, মিতা, কারো সঙ্গেই সে সহজ হতে পারে নি, যা মনে করে তা বলতে পারে নি, প্রথম চোটটা অভিজিতের উপরেই পড়ল. বেচারা!

'ওরা কোথায়!'

'আসবে, পরে আসবে।'

'এখন!'

'চালা। একটু ঘুরে ঘুরে চ। হাওয়া খেয়ে যাই।'

'তা মন্দ বলিস নি, স্বাধীনতা বলে তো আর থাকবে না কিছু। কিন্তু তোর মুখটা পেল্লায় সাদা দেখাচ্ছে। বিয়ে করতে হবে বলে কি ভয় খেয়ে গেলি না কি?'

এ কথাটা গোপাল ঘণ্টা খানেক বাদেও বলল। আরো বলল, 'তোমার মতলব আমি বুঝতে পারছি না ব্রাদার! তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ না কেন!'

শমীক বলল সে বিয়ে করবে না বিয়ে করবে। না এ-কথাটা মিতাকে কি বলবে, কি ভাবে বলবে তাই মনে মনে ভেবে নিতে সময় লাগছে। হাজার হলেও আট বছর মেলা মেশা করে বিয়ের দিন ঠিক করে তারপর বিয়ে

হবে না কথাটা দুম করে বলা সহজ নয়।

এ কথা শুনে গোপাল ট্যাক্সি থামাল। পাশে ভিক্টোরিয়া স্কোয়্যার, রাস্তা নিরিবিলি, সে ঘাড় ফিরিয়ে সে শমীককে গালি দিতে থাকল। শেষ অবধি সে আবার গাড়ী চালিয়ে দিল। মিতাদের বাড়ীর দিকে। সে-কথাটা বারবার বলল গোপাল, তার মানে একটাই দাঁড়াল। গোপাল মেয়েদের অপমান সহ্য করতে পারে না, কোনমতেই না। দরকার হলে সে শমীককে মারতে মারতে নিয়ে যাবে ও বাড়ী, কিন্তু বিয়ে তাকে করতেই হবে।

'বিয়ে করবে! আমার কি হয়েছে তা জানিস?'

'কি।'

শমীক নাম বলল।

'তার মানে কি?'

শমীক মানেটা-ও বলল। শুনে গোপালের মুখ অভিজিৎ বা প্রবীরের চেয়ে অনেক হতভম্ব হয়ে গেল, বিমূঢ়। সে নিজেকে গালি দিয়ে বলল 'ভুল করলাম শমীক, তোর শ্বশুরবাড়ী এসে গেছে।'

'এসে গেছে, এসে গেছে!' কলরব উঠল, ঝাঁকে ঝাঁকে শাঁখ বাজল, উলু পড়ল। এদিকে রেজিস্ট্রি হলে কি হয়, আচার অনুষ্ঠান মাঙ্গলিক যা কিছু সব হবার কথা ছিল।

'আশ্চর্য, শমীক টাইমের খেয়াল রাখবে তো!' মিতার দাদা কোঁচা সামলে প্রায় ছুটে এলেন। বিয়ে না দেবার জন্য তিনি যত ব্যস্ত ছিলেন, এখন বিয়ে দেবার জন্যে প্রায় ততই ব্যস্ত হয়েছেন। 'সময়টা পেরিয়ে যাওয়া ঠিক নয়, কোনমতেই ঠিক নয়।'

বাড়ীর সামনে গাড়ীর সার, আলোর সাজা, নিমন্ত্রিতদের ভিড়, মিতার দাদার ব্যস্তসমস্ত মুখ, শমীকের মনে হল একটু আগে মনে হচ্ছিল, এ সবটাই একটা বিপুল ঠাট্টা, মস্ত প্রহসন। একটি কথা বলে সে নিবিয়ে দিতে পারে এদের মুখের হাসি, আয়োজনের সবটুকু আনন্দ।

এখন সে সাহস হারিয়ে ফেলছে। কেমন করে বলবে, কি বলবে এদের? হঠাৎ প্রবীরের মুখ দেখতে পেল। প্রবীর, একা প্রবীর তাকে বাঁচাতে পারে। হয়তো ইতিমধ্যেই সব বলেছে প্রবীর এদের, হয়তো জেনে গিয়েছে এরা কিন্তু মিতার দাদাকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। সে দরজা খুলে ধরল, 'নিতাইদা, একটু আসুন, প্রবীর, আয়।'

সব বলা হয়ে গেল। প্রবীরকে রাজী করাতে তার বড়ই কষ্ট হয়েছে। অবশ্য প্রবীর রাজী হওয়াতেও সব সমস্যা মেটে নি। এ কিছু সম্বন্ধ পাতিয়ে বিয়ে দেওয়া নয় যে পাত্র না এলে তখনি আরেক জনকে ধরে পিঁড়িতে বসাবে। মিতার রাজী হওয়া চাই। প্রবীরের সঙ্গে বিয়ে হলে অবশ্য পুরুত ডেকেও হতে পারে। কিন্তু এ-সব কথা ভাববার দরকার কি? হঠাৎ শমীক দেখল নিতাইদা প্রবীরের সঙ্গে কানে কানে কি কথা বলছেন। বোধ হয়

জেনে নিচ্ছেন ওর মাইনে-টাইনে কত, দেখেই তার ভেতরে গরম হয়ে উঠল সব। প্রবীরের কানের কাছে নিতাইদার মুখ না দেখলে হয়তো শমীক কখনোও এর পরেও মিতার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ঝুলোঝুলি করত না।

মিতা শমীকের কথা শুনে কেঁদে চলল। তার মুখের চন্দন ভেসে গেল, মুখের চেহারা আবার জবজবে হয়ে গেল, বিশ্রী। এমনিতে তবু ওর কুশ্রীতা বরদাস্ত করা যায়। কনের সাজে তাকানো যাচ্ছিল না। ওকে কাঁদতে দেখে শমীকের বুকটা জুড়োল। এখন মনে হল অসার, বড় অসার কথা বলে বলে সময় নষ্ট করা, কেননা আয়ু নেই তার, সময় নেই হাতে। অদৃশ্য ফুটো দিয়ে কোথায় যেন শমীকের আয়ুর জল গলে চলে যাচ্ছে। চুঁইয়ে চুঁইয়ে শেষ হচ্ছে, 'মিতা, তুমি যদি আমায় সত্যি ভালবাস, তবে গলার ঐ মুক্তোটি ফেলে দাও, ফুটোটা বন্ধ হোক।' সে অস্ফুটে বলল। মিতা এতটুকু আশ্চর্য হল না। শমীকের কাছ থেকে অসংলগ্ন কথা শোনা যাবে এটাই স্বাভাবিক।

'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।' সে কাঁদতে কাঁদতে বলল।

শমীক বলল, 'এই কথাটা তুমি কয়েকবার বললে, কিন্তু একবারও বললে না যে সব সত্ত্বেও আমায় বিয়ে করতে চাও, আমাকেই।'

মিত আত্মসমর্থনের জন্যে, তার প্রেম যে ঠুনকো নয় তা বলবার চেষ্টায় আর একবার কাঁদল।

'যাগ গে, এ-সব কথায় কথা বাড়ে মিতা।'

'তোমার এ-সব কথা বলতে খারাপ লাগছে না?'

না। কেননা তোমার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না তাতে আমার একটুও দুঃখ নেই।'

'আশ্চর্য!'

'কেননা তুমি-ও আমায় বিয়ে করতে না মিতা, যদি না নিতাইদা'র সেই বন্ধু, সেই যে লাল রোডস্টার গাড়ী যাঁর, তিনি এমন করে তোমায় না ডোবাতেন। এ আটবছর ধরে তুমি তাঁর আশাতেও ছিলে, অস্বীকার করতে পার?'

'তুমি এত নেমে গেছ?'

মিতা চেঁচিয়ে উঠল। শমীক একটু হেসে বললে, 'আমি যাচ্ছি মিতা। তোমার মনে রাখা উচিত সব ভাঁড়িয়েই আমি তোমায় বিয়ে করতে পারতাম। সেবাযত্ন করতে বাধ্য করতাম তোমায়। সে-সব কিছুই করছি না। প্রবীরকে বিয়ে করলে তুমি সুখি হবে, ও হবে খুশি। কেননা আমার জন্যে একটা মহৎ কাজ করে ফেলে মহৎ হবার জন্যে ওর আনন্দের সীমা থাকবে না।'

আর সময় নেই, সত্যিই সময় নেই। যার সামনে এত কম সময়, দু'বছর, মাত্র দু'বছর, তারপর নিঃশ্বাসের কষ্ট, একদিন কিডনী ধর্মঘট করবে, লিভার থসথসে হয়ে উঠল, শরীর আর রক্ত নেবে না,—শরীর রক্ত নেবে না ও কথা

ভাবতে গিয়েই শমীকের মাথা ঘুরে গেল। এখন আর একটি মুহূর্ত সে অপব্যয় করতে পারে না। শমীক নিচে নেমে এল। গোপাল বসে ছিল ট্যাক্সির দরজা খুলে।

'বাড়ী যাবি ?' আবার গড়ের মাঠে গোপাল প্রশ্ন করল।

'না।'

বাবার চেহারা মনে পড়ল। আজ বাবা বসে থাকবেন। শমীক কখন এসে বিয়ের খবরটা দিয়ে যায় সেজন্যে বসে থাকবেন। দাদা এখানে থাকে না, বোনেদের বিয়ে হয়ে গেছে, ভাই ছুটি পায় নি। মা আর বাবা বসে থাকবেন, হয় শমীক, নয় শমীকের বন্ধুরা কেউ খবরটা না দিয়ে যাওয়া পর্যন্ত।

'সবাই সমান!' শমীক স্বগতোক্তি করল। বাবা, মা, দাদা, ভাই, বোন সবাই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কেন বাবার কথায় সে পড়া ছেড়ে দিল! কেন দাদার বড় বড় আদর্শের ভাঁওতায় ভুলে ঢুকে পড়ল চাকরীতে। কেন ভাই বোনের জন্যে সে নিজেকে বঞ্চিত করে দিনের পর দিন, দিনের পর দিন। কে বলতে পারে ওরাই শমীকের রোগের কারণ নয়?

'চেনা লোকের মুখ দেখতে চাই না গোপাল।' শমীক ককিয়ে উঠল।

'তবে একটা কিছু ঠিক কর্। আমায় বাড়ী যেতে হবে।' গোপালের মুখে এ-কথাটা এ-সময়ে শমীকের কানে বাজের মত ফাটল, বুকে বিঁধে গেল। সময় নেই, ওকে বাড়ী যেতে হবে। সময় নেই, তাই ও এখন ফিরে যাবে ওর মা-বউ-ছেলেমেয়ের সংসারে। শমীককে যদি জীবিত পৃথিবী, মানুষের দুনিয়া টিকেট কেড়ে নিয়ে হল থেকে বের করে দেয়, তাহলে গোপাল একা একা শমীকের ভার বইতে পারবে না। অথচ গোপালকেই শমীক সব চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য বন্ধু ভেবেছিল।

'ঠিক আছে। তুই বাড়ী যা।'

'তুমি ?'

'তুমি' সম্বোধনটা শমীকের কানে বাজল, এ-সময় তুমি বলাটা লক্ষ্য করবার মত বই কি।

'আমি একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে যাচ্ছি। ভাল লাগছে না।'

গোপাল চলে গেল। গোপাল নেই, শমীক একা। অন্ধকার, সব অন্ধকার। রাত হয়েছে তাই নির্জন হয়ে গেছে মাঠ, পথ, নিভে যাচ্ছে আলো। এই সময়ে, এখন শমীক হঠাৎ বন্ধু চাইল, জীবনের উত্তাপ, বলতে হবে, সব বলতে হবে খুলে, এখন ভালবাসা চাই। নইলে জোর পাচ্ছে না শমীক, দুর্বল হয়ে পড়েছে, এখন বন্ধু চাই।

বন্ধু এল। বাতাসের ঝাপটা থেকে মুখ বাঁচিয়ে, এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে, বন্ধু শমীককে তার ঘরে ডাকল।

রাত, অনেক রাত।

বন্ধুর ঘরে শমীক বন্ধুর কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে যাচ্ছে। শমীকের সব টাকাই বন্ধুর আঁচলে, তাই মুখে হাসি এঁকে রেখে মেয়েটি সব শুনে যাচ্ছে। তার চেহারা ছেলেমানুষ, ঠাটবাটের আড়ালে গ্রাম্য মুখ, ক্লান্ত, চোখদুটি ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বাঁচে।

'আজ আমার বিয়ে হবার কথা ছিল।'

মেয়েটি সে কথা আগেই বুঝেছে। বুঝতে পেরেই তার করুণা হয় মনে। আহা, সেজেগুজে লোকটা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে পেল না? মেয়েটিই বোধ হয় কোন না কোন ভাবে বিশ্বসঘাতকতা করেছে।

'ও-কথা আর ভাববেন না, মেয়েটি কোমল স্বরে বলল।'

'মেয়েরা হচ্ছে জামাকাপড়ের মত। যে হুকে টাঙাও সেখানেই ঝুলে থাকবে। মিতা শেষ অবধি প্রবীরকে বিয়ে করতে রাজী হল।'

শমীক আবার কাঁদল। কি ঘেন্না হচ্ছে নিজেকে। এ-সব জিনিস খেয়ে কাঁদাকে সে কতই ঘেন্না করত, দুর্বলতা মনে করত। কিন্তু মেয়েটি এখনো কাঁদছে না। শমীকের দুঃখে ওর চোখে এক ফোঁটা জলও নেই। শমীকের সন্দেহ হল ও এখনো ঠিক বুঝতে পারে নি অসুখটা কতখানি ভয়ানক, কি মারাত্মক তার পরিণাম।

'আমার কি হয়েছে জান? ল্যিউকোমিয়া।'

'বেশ নামটি।' মেয়েটি হাই চেপে বলল। আগের কথাগুলো ও ঠিক শোনে নি। ভয়ানক ঘুমে, ক্লান্তিতে তার ভেতরটা মাছের পটকার মত ফুলে উঠেছে, কথাগুলো শুনলেও তার কানে যায় নি।

'বেশ নাম। কি বলছ তুমি? জান এর নাম রক্তে ক্যান্সার হওয়া?' বলতে বলতে ডাক্তার আজ যে-সব কথা বলেন নি, তার রোগের লক্ষণের কথা, তাও যেন এখন মনে হতে লাগল সব জানা, অনেকদিনের জানা।

'শরীরে আর রক্ত হয় না, রক্ত দিয়ে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তারপর একদিন আর রক্ত দিলেও ঢোকে না শরীরে, শরীরে আর রক্ত নিতে পারে না, এখান দিয়ে ঢোকায়, ভচ্ করে বেরিয়ে যায়, তারপর আস্তে আস্তে শরীর কুঁকড়ে যায়, আলকাতরার মত কালো হয়ে ঠাণ্ডা মেরে যায়।'

মেয়েটি এতক্ষণে বুঝেছে রোগের কথা হচ্ছে। সে হঠাৎ ভয় পেল। সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে বলল, 'আপনার অসুখ আছে?'

'নইলে আর বলছি কি?'

শমীক আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েটি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। আস্তে গিয়ে সে দরজা খুলে চাপা গলায় বলল, 'বেরোন বেরিয়ে যান!'

দরজার বাইরে লম্বা বারান্দা দিয়ে রাজু হেঁটে যাচ্ছিল, মাঝে মাঝেই ঘরে এসে মেয়েটির দরজার কাছে দাঁড়াচ্ছিল। কান পেতে শুনছিল এ-ঘরে আবহাওয়া কেমন, তার সাহায্যের দরকার আছে কি না। রাজুর দীর্ঘ শরীর ভাল ধুতি পাঞ্জাবিতে ঢাকা, হাতে বেল ফুলের গোড়ে মালা। বিপদে পড়া

খা কোণঠাসা হলে তার ভেতর থেকে নোংরা ও নীচ রাজু চক্রবর্তী বেরিয়ে আসে। এই সব নোংরামি ও নীচতার জন্যই সে ভদ্রপরিবারের সন্তান হওয়া সত্ত্বেও বহুদিন ধরে নির্বাসিত। এখন রাজু এ-বাড়ির মেয়েদের অভিভাবক। সে নিজেই নিজেকে বহাল করেছে। এ ঘরের মেয়েকে প্রৌঢ় রাজুকে অপছন্দ করে, কেননা রাজু তার মত আনকোরা নতুন মেয়ে কে বড়ই যন্ত্রণা দেয়, টাকা কেড়ে নেয়। তবু রাজুকে যে দরকার সে-কথা সে জানে। রাজু ছাড়া তারা অসহায়। এ শহরের মানুষদের এক একটা রাজুর চেয়েও ভয়ানক। মেয়েদের বাঁচতে হলে, শান্তিতে রোজগার করতে হলে রাজুকে চাই।

এখন রাজু চাপা হুংকার দিয়ে ঢুকে পড়ল।

'কি হয়েছে? কি করেছে লোকটা তোর! অ্যাঁ!'

চোখ ঘুরিয়েই সে বুঝতে পারল মেয়েটির বালিশের নিচে টাকা আছে, দেখতে পেল শমীকের হাতঘড়ি, পাঞ্জাবির বোতাম নতুন কলম। কলমে সই করবে, মিতার শখ ছিল।

'কি হয়েছে!'

'এই দেখ না, লোকটা কি ভয়ানক সব রোগ নিয়ে এখানে এসেছে, ওর হবে, আমারও হবে, আলকাতরার মত বর্ণ বেরুবে, রক্ত বেরুবে না আরো কত কি!'

শমীক বলতে চেষ্টা করল না, তার সে-সব কিছুই হয় নি। তার যা হয়েছে তা দুরারোগ্য ব্যাধি, আজ বিকেলেই জানা গেল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে মৃত্যুদণ্ড জেনে গেল, বিয়ে গেল ভেঙে, মনের কি ভয়ানক অবস্থায় সে কথা বলবার মানুষ খুঁজছিল তাই বোঝাতে চেষ্টা করল। কিন্তু রাজু কিছুই বলল না।

'অ্যাঁ, এত বড় রোগ নিয়ে এখানে আসা? বিয়ে ভেঙে গেছে, বন্ধু বলতে নেই সব জানা আছে, বেরোও এখন থেকে।' রাজু দক্ষ হাতে শমীকের জামার বোতাম ও কলম বের করে নিল। ওকে বের করে দিল।

তারপর সে মেয়েটিকে হুংকারে হুংকারে কাঁদিয়ে ছাড়ল। বলল, 'সুন্দর মুখ দেখলেই কাত! ও বিয়ে ভেঙে যাওয়া-টাওয়া বাবুদের, ঐ লেখাপড়া জানা ছেলেদের নতুন জোচ্চুরি। ও-সব বলে ঢুকে পড়ে। আর ঐ সর্বনেশে রোগ।'

কিছুক্ষণ বাদে মেয়েটি কেঁদেকেটে জানলায় উঁকি দিল, আবার নেমে এল। আবার বেরুতে হবে, রাজু তাকে নিঃস্ব করে রেখে গেছে। তা ছাড়া অনেকের চেয়ে সুন্দ রাজুকে তার আরো ভয়ানক বলে বিশ্বাস হয়েছে। এই আধ ঘণ্টাতেই।

শমীক দাঁড়িয়ে ছিল তখনো। মেয়েটি বলল, 'কি হয়েছে? বাড়ী যাবার পয়সা নেই।'

শমীক মাথা নাড়ল।

'আমারও সব কেড়ে নিয়েছে, সব। শুধু স্টেশনে যাবার ভাড়া দিয়েছে।'

'সেটা আমি তোমায় দেব'খন। তুমি বাসে চেপে যেও। এখন চল, তোমার সব কথা শুনব। আমার কথাও বলব। আমার দুঃখের কথা শুনলে পরে তবে তুমি...

এতক্ষণে এই প্রথম শমীকের মনে বিশ্বাস এল। অন্যের দুঃখ তার চেয়েও বেশী,এ জানতে পারলে তবে যেন সে সইবার মত একটু ভরসা পায়। একজনের দুঃখকে আশ্রয় করে তবে আর একজন দাঁড়াতে পারে।

ওরা দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

৩ কাগা বগা গীতিকা

এক গেলাস চা আর একটি ছোট পাউরুটি মেঝেতে নামিয়ে রেখে মোহিনী বলেন, কাগা বগারে কই! চা দিয়া গেলাম, পরে যেমুন না শুনি ঠান্ডা কইরা চা দিছিল। আরো কই, গেঞ্জি লুঙ্গি যেমুন না কাচে, সাবান দিয়া দিমু।

যাঁকে বলেন, তিনি বলতে গেলে মোহিনীর জন্মজন্মান্তরের স্বামী। মোহিনীর যখন তিন বছর, তখনি নাকি তিনি উত্তুমির মেলায় গলার পুঁতির মালাটি সদানন্দের গলায় পরিয়ে দেন। ধলেশ্বরী নদীতীরে মাঘের প্রভাতে সে দৃশ্য দেখে এয়োজনে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। দেখ দেখ। নাইয়া বুঝি অম পূর্ব জনমের বউ, মাথাখানা [illegible] দিল না, দিল আমাগো সদার গলায়।

—হাত ফুল [illegible]!

বড়দের কথায় [illegible] না [illegible] সদানন্দ মালাটি আবার মোহিনীকেই পরিয়ে দেয়।

তাতে বুড়িরা [illegible]।

—দ্যাখ দ্যাখ! [illegible] এমুন [illegible] দিনে .....

মহিলা ভাবাবেগে কেঁদেকেটে মোহিনীর [illegible] বলেন, মিত্রদের পেটি বসুর পোলার গলায় মালা দিল! [illegible]। আবাগো লো! ওর মাইয়ার বিয়া এহানেই হইব।

ছেলের মা একসময়ে বলতে গিয়েছিল, পোলাপানের কাজ দেইখা বিয়া ঠিক হয় নাকি?

কিন্তু মেয়েরা বড় হুলাহুলি করে। উত্তুমির স্নানের মেলায় এ যেন দেবতার কৌতুক। কেউ বলে, ফুল ছিটাও! কেউ বলে, চিনির মঠ ভাইঙা এ-ওর মুখে দেউক। কেউ বলে, জোকার দে গো!

মোহিনী আর সদানন্দ কিছুই বোঝেন।

কিন্তু অনেক পরে, সদানন্দর যখন বিশ বছর, যখন সে জমিদারের

কাছারিতে পাটের গাঁট গোনে, তখন সে মাকে বলেছিল, বিয়া বিয়া কর কেন? কন্যা আমি স্বপ্নে দেইখা থুইছি। আমি দেখছি স্বপনে, তুমি দেখছ চক্ষে। মোহিনীর কথা কই।

বাপও আপত্তি করেন। মোহিনীর বাবা এই জমিদারেরই আরেক কাছারিতে নায়েব। লবণ, কেরোসিন, চিনি ও কাপড় ছাড়া কিছুই কেনে না।

মা বলল, মাইয়া সাজাইয়া দিব। নাকখান যা চাপা, নয় তো মাইয়া সোন্দর। হটর হটর হাটে না, ফটর ফটর বাক্য নাই, পাকশাক জানে।

এমনি করেই বিয়ে হয়েছিল। পাড়াপড়শী বলেছিল, এই বিয়া ত অরাই ঠিক কইরা রাখছে। এই বিয়া হইতই।

মোহিনীর এখনো মনে পড়ে. কাঁঠাল কাঠের চাকি-বেলনা থেকে বাসন, কাপড়, ক্ষীর, দই, মিষ্ট, ফল, তরকারী, দশটা মানুষ বাঁকে বইতে পারে না এত জিনিস।

জমিদার বাড়ি থেকে বাপের বাড়িতেও মাছ এসেছিল. শ্বশুরবাড়িতেও। উৎকৃষ্ট টাঙাইল শাড়ি, সিঁদুর মাখানো টাকা।

এখন সে সব আশকেলে বাস্ কথা। একথা বাড়িতে ফনফনে অ্যালুমিনিয়ামের গেলাসে জল খেতে খেতে মোহিনী নিজেকেই বলে, তইন এক গেলাস জল উঠাতে হাত ভারাত। একেক খান বাসন আছিল ফুল কাসার। তেমুন একখান গেলাস আছে তোদের?

কেউ যদি বলে, কাকে বলো?

—কাগা বগারে কই।

স্বামী-স্ত্রীর কথা বন্ধ আজ ষোল বছর। বাক্যালাপ ওই অলক্ষ্য কাগা-বগাকে সাক্ষী মেনে।

কথা বন্ধ হত না। ছেলেরা হল দেশান্তরী, সেই দুঃখে মোহিনীকে ধরল আপনমনে বকা রোগে। আপন মনে ও বলে যেত কথা। তা নিয়ে অনেক অশান্তি, অনেক ঝগড়া।

সদানন্দ বলেছিল চল, ডাক্তারের কাছে লই। এমুন বকা ধরছ, মানষে ভাবে পাগল বা হইলে বুঝি!

মোহিনী জ্বলে উঠেছিল।

সব কি হল তার দোষে? হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হতে দেশ ছাড়তে সে বলেছিল? সদানন্দের উপযুক্ত ভাগনার হাতে সম্পত্তি বেচাকেনার ভার দিতে মোহিনী বলেছিল? কলোনিতে সবাই উঠল এসে। সকলের অবস্থা ফিরল, মোহিনীর অবস্থা কেন ফিরল না? আর, ছেলেরা দেশান্তরী হল কেন. জবাব দাও?

সদানন্দের মাথা হেঁট।

সম্পত্তি ভাগ্নে বেচেছিল। সদানন্দ তার কথায় ভুলে ব্যবসা করতে যায়। ফলে ভাগ্নের এখন রানাঘাটে পাকা বাড়ি, সদানন্দ আজও ধুবুলিয়া ছাড়িয়ে

এক কলোনিতে।

ছেলেরা লেখাপড়া শেষ না করেই চাকরি পেল, ঘর ছাড়ল। বড়জন চটকলে, ভালই রোজগার করে। বউ, মেয়ে, নাতি, নৈহাটিতে বাড়ি।

ছোটটা ছিল বোম্বেটে। এক সময়ে সে বোমা বাঁধত, পয়সা নিত। বাপকে বলত, বিজনেস করত্যাছি।

বোম্বেটে ছেলে ঘরের ট্রানজিস্টর, সদানন্দের ঘড়ি, মোহিনীর কানফুল চুরি করে বোম্বাই পালায়।

সেখানেও সে 'বিজনেস" করছে। সে দেশের মেয়ে বিয়ে করেছে। বাপ-মাকে একবার টাকা পাঠিয়েছিল।

ছোট ছেলে ছিল মোহিনীর প্রাণ। সদানন্দ বাসে চেপে কেষ্টনগর যেত, এখনো যায়, কোর্টের সামনে বসে ফর্ম লেখে আর তেমন অজ্ঞ মক্কেল পেলে জমির মামলার তদারকি করে।

বাপ বেরিয়ে গেলে ছোট ছেলে মাকে স্বপ্ন দেখাত। এমন মন্দ ব্যবসা সে করবে না। বাপের মতো সজনে ডাঁটা কিনেও ঘরে ফিরবে না। বাবা একেক মক্কেল ধরে বটে! কেসের তদারকি করল, মামলায় জিতল মক্কেল। নামিয়ে দিয়ে গেল একঝুড়ি তেঁতুল, নয়তো একথালা পাটালি গুড়।

—তুই কেমুন বেবসা করবি ?

—বাঙাল কথা ছাড়ো তো!

—কয়, মায়ের দুধ আর মায়ের ভাষা।

কি আশ্চর্য, কি আশ্চর্য, সেই তখন মোহিনী তার ছোট ছেলেকে যা বলত, এখন দেখ, সরকারই সে কথা দিকে দিকে প্রচার দিচ্ছে। মায়ের দুধ আর মাতৃভাষা দুই সমান সম্মানের।

তা ছোট ছেলের নাম মনোরঞ্জন, বর্তমানে সে নাকি মনোজকুমার। আর বড় ছেলে সুখরঞ্জন এখন শুধুই রঞ্জন।

ছোট ছেলে বলত, ভটভটিয়া চালাব, চোখে কালো চশমা, মানিব্যাগ খুলে তোমায় হাজার টাকা দেব।

—তাই দিস। ঘরখান সারাই। ওর বাপেও আর পারে না। এতদিন বাবদ খাটাখাটনি! দ্যাশে তো এমুন। আমিও করাতকলের ঘেস আইনা গুল পাকাইতে পারি না আর।

—পাকাও কেন ?

—যা পাই! লবণটা, তেলটা...

কিন্তু মুড়াগাছায় কোন ব্যাপারীর দোকানে বোম মেরে ক্যাশ ভাঙতে গিয়ে মনোরঞ্জন ওরফে ড্যানি, ওরফে বোম্বেটেকে ব্যাপারী চিনে ফেলে। বিচলিত মনোরঞ্জন একপাল ছাগলের মধ্যে বোমা ফেলে পালায়। এ দিক-ওদিক ক'দিন গা-ঢাকা দিয়ে এক রাতে ঘরে এসে শুয়ে থাকে। সকালে ছেলে, ট্রানজিস্টর, বাপের ঘড়ি, মায়ের দুল, সবই হাওয়া হয়ে যায়।

সদানন্দ ছেলের জন্যে চেষ্টা করতে গিয়ে দারোগার কাছে কয়েকবার"ও হো

হো হো" শোনে।

—ও হো হো, আপনার মত সৎ সজ্জন মানুষের ছেলে বোম্বেটে হয়ে গেল, ও হো হো, ছেলেকে মানুষ করতে হলে শাসনও দরকার, ও হো হো হো...

সদানন্দ ঘরে এসে বসে থাকে।

আর মোহিনী বিলাপ করে পাড়া জাগায়।

—যাও, কলকাতা যাও! তার ফটো কাগজে দেও। পোলা চইলা গেল, বাপের বুকে বাজে না?

সদানন্দ ঈষৎ হেসে বলে, সে তার পথ খুইজা নিছে। আমি সে পথের লাগাল পাইতাম না মনোর মা! অহন খুইজা দেখ, ঘরে কিছু মাল রাইখা গেছে কি না। তাইলে কচু বনে ফালাইতে হইব, ডোবার জলে।

—তার উদ্দেশ করবা না?

—লাভ নাই।

—যাইবা না কলকাতা?

—কেমনে কইরা? বুঝ না তুমি, ধরতে পারলে পুলিসে মারতেও পারে। যেখানে থাকে, বাইচা থাকুক।

—আমার বুকে যে পোড়ায়!

মোহিনী সেই যে বকতে শুরু করল, রাতদিন বকত। ছেলে ওকে স্বপ্ন দেখাত গো! দুপুরে বাঁড়ুর ঝাল আর ভাত খেয়ে মা ছেলে কত কথা বলত। মোহিনী বলত [illegible]। তবু ভাবতে ভালো লাগত, ঘরদোর নতুন হয়েছে, সদানন্দ আর মোহিনী ভাত খাটে না। বস্তায় চাল থাকে, তেল-মশলা-[illegible]কেরোসিন!

ছেলে আর ফেরে নাই নিরুদ্দেশ।

ওর ভাবগতিক দেখে সদানন্দ বলেছিল, মাইনষে পাগল বলবে তাই চাও? চল ডাক্তারের কাছে যাই।

আর যত মোহিনী যাত্রার নায়িকাদের মতো উচ্চগ্রামে ঝড়ের মতো বকে গিয়েছিল।

—হিন্দুস্থান-পাকিস্তান আমি করাইছিলাম? দ্যাশ ছাড়তে আমি বলছিলাম? তোমার হাতে সর্বস্ব ছাইড়া আইলা না ক্যান্? আইলা যদি, সগলের আবস্থা ফিরে, আমার কেন এমুন হাল? কি আমার দৈব নিদারুণী বিয়া রে! আইবার সময়ে বাসন-কোসন সব ফালাইয়া, অহন কও আমি পাগল। কথা কইলে পাগল হয়?

সদানন্দ কাতর গলায় বলেছিল, আমি সইতে পারি না রে বউ! আমারে তুমি কাটিমকাটা কইরো না। অহন তুমি ছাড়া কেও নাই যে কথা কই, সেই তুমি আমারে আর কত বিঁধবা!

মোহিনী বলেছিল, বেশ! আমার কথায় যদি এমুন দহন, তয় আমি কমু না কথা।

সেদিনই রাতে মোহিনী বলেছিল, মাইনষেরে কই না, কাগা বগারে কই, ত্যাল ফুরাইছে, আর হেরিকেনডা সারাইতে হইব।

বড় দুঃখে সদানন্দ বলেছিল, উংরুমির মেলায় আমারে গলায় মালা দিছিল কি কাগাবগা? এই আমি নৌকায় ফিরি কি না দ্যাখতে জামির গাছের নিচে আইয়া পড়ত কি কাগাবগা? এই সেদিনও আমার জ্বর হইতে হেরিকেন নিয়া ডাক্তার আনছিল কি কাগাবগা?

মোহিনী নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, কাগাবগারে কই, এমুনই ভালো। মুখ খুললে আমি থামতে পারি না। বুক হুতাশে পুড়ে। আর কওন বলনের আছে বা কি?

সেই থেকে মোহিনী চুপ হয়ে যায়। সদানন্দ এ ব্যবস্থা ক্রমে মেনে নেয়। এমনি করে ষোল বছর কাটল। সদানন্দও সন্ধ্যায় ফিরে বলে, কাগাবগারে কই! চালের দাম কিন্তুক বাড়ত্যাছে খুব। তা ক্লাবের বীরেন কয়, কাকা! পাঁচ কাঠা রাইখা কি করবেন? দেন তিন কাঠা বেইচা।

—কাগাবগা জানে না, এ কাজ বেআইনী নয়?

—কাগাবগা এও জানে, যে যখন বীরুর নজর লাগছে, জমি ও এমুনি নিতে পারে। অহন তাদের রাইজ্য। যা দেয় হেই লাভ। দেউক, যা হয় দেউক।

—কাগাবগার যা মন লয় করুক। দ্যাশের রাজ্যপাট গেল তাই কিছু কই নাই!

সদানন্দ বলতে পারত, দেশে ছিল বিশ বিঘা জমি, মাটির চারচালা ঘর চারখানা, হাল-বলদ-গাই, যেমন অনেকের ছিল। তাকে "রাজ্যপাট" বলে না।

বরঞ্চ আস্তে বলে, কাগাবগারে কই, চুয়াত্তর চলত্যাছে, আমি আর কতকাল! দুটা পয়সা থাকলে থাকব। ঘরখান সারিসুরি কইরা নিলে একখান ভারাও দিতে পারে। অরা কাইরা নিলে থানাও দেখত না।

মোহিনী বলে, কাগাবগারের কই! টাকা যেমুন পোস্টাপিসে থোয়, আমিও সই দিমু।

—তাই হইব।

বীরু, চট্টরাজ ভটভটিয়া চেপে চলে আসে। বড় রাস্তার প্রায় ওপরে জমি। বীরু দোকান করে ছেড়ে দেবে। ওর বাবা এবং ও, এভাবে অনেক জমি সংগ্রহ করেছে। এরা তো বুড়োবুড়ি, ডরপোক মানুষ, ছেলেরা দেশান্তরী। বুড়োটা জানে, এমন জমিও এখানে আট হাজার টাকা কাঠা। তবে তা চাইতে সাহস করবে না।

—কাকা! বলেন কত নিবেন?

—তুমি তো জানই দর!

মোহিনী বলে, ক্যান্? যেমুন দরে বেচলা তোমার দুই কাঠা, তাই দাও। পাল তো ষোলো হাজার দিচ্ছে।

বীরু হাসিতে গলে পড়ে। এখন কৌতুক করে বলে, কাগাবগা কি বইলা গিছে কাকী ?

মোহিনী মাথা নাড়ে।

—কাগাবগার কথা, ঘরের কথা! ওই কথা আর কেউর জন্য নয়। টাকা যদি না দাও বীরু, বুড়াবুড়িকে মাইরা সগলটি লইয়া লও। টাকা লাগত না।

—তা কই না কাকী। তয় কাকা-কাকী সম্বোধন। বিবেচনা করতে কই। অত তো পারতাম না।

বীরুর হিসেব ছিল পাঁচ হাজার। মোহিনীর জেদাজেদিতে শেষ অবধি ওকে দশ হাজার এক টাকা দিতে হয়। মনুষ্যস্বভারের নিয়মে, বীরু ওদের চোদ্দ হাজার টাকা ফাঁকি দেয়, তবু নিজেকে মনে হয়, "ঠকে গেলাম গো!"

দিনে দিনেই ওরা পোস্টাপিসে গিয়ে টাকা জমা দেয়। যুগ্ম সাক্ষর। ডাকবাবুও চেনা।

এখন মোহিনী বড় ব্যাবুঝ জেদ ধরে।

—কাগাবগারে কই, ঘরখান সারুক।

—কত টাকা লাগব তা —কাগাবগা জানে না ?

—হিসাব নিছি আমি, দ্যাড় হাজার লাগব।

—কাগাবগা কি পরে কি হইব তা ভাবে না ?

—কাগাবগ্যারে কই, বড় ইচ্ছা আস্তা ঘরে থাকি, বড় ইচ্ছা চৌকি নূতন কিনি, বড় ইচ্ছা কাসার গেলাসে জল দেই, জল খাই। সকল হুতাশ রাইখা মরলে আবার জনম লইতাম! আর না। হুতাশ মিটলে আর জনমাইতে হয় না।

—কাগাবগারে এ কথা কে কইছে ?

—কাগাবগারে। কই ? হরিসভায় কুনোদিন যায় নাই, গেলেই শুইনা আইত। বীরুর বাপের হুতাশ আছিল, রেডিওর দোকান দিব। বীরু সেই হুতাশ মিটাইতেছে।

—কাগাবগারে কই, হুতাশ আমি রাখতাম না।

—কাগাবগারে কই, ঘর সারলে নূতন চৌকিতে লক্ষ্মী বসামু! কুনোদিন ছাওয়ালদের...

—অমঙ্গল হইব না।

—কাগাবগারে কই, কালই যেমুন মলান্দরে খবর দিয়া তয় কিষ্টনগর যায়। সে জনা পুরানা মিস্ত্রির।

"কাগাবগারে কই" কথাটি এখানে সকলে জানে। কিন্তু এ জায়গার মানব মানচিত্র খুবই পুরনো। নতুন নতুন মানুষজন দূরে ঘর বেঁধেছে। পুরনো কলোনির মানুষজন তেমনই আছে।

মলান্দ এসে দাঁড়ায়।

—ঘর কি ফালাইয়া নয়া তোলবেন ?

—তাই কি পারি ?

—আমিই তোলছিলাম। দ্যাখেন, মাটির দ্যাল দিছিলাম বইলা আজও কেমন...এ দ্যাশে মাটির ঘর দ্যাখলে শোনলে দিন যায় শক্ত হয়।

পুরানা টিন দ্যাখ মলন্দি।

—পুরোনারও তো...

– দ্যাহ তুমি। বারিন্দা এবার বাড়াইমু।

—ছাওয়ালরা আসব ?

মোহিনী হাসেন। বলেন, কাগাবগা ডিম ফোটায়, ছা' পালে, সগল পক্ষীর কথা কই। চক্ষু ফুটল, উড়তে শিখল, তখন পক্ষীর ছা' উড়াল দেয় গো মলন্দি। বাসায় ফিরে না।

মলন্দির মনে হয়, বুড়োবুড়ির শেষ জীবনে শুধু নিজেদের জন্য ঘর পাকাপোক্ত করতে চাওয়াটা বড় বেহিসেবী কাজ হচ্ছে। কতদিন ভোগ করবেন ?

ওর মনের কথা বুঝে মোহিমী বল্লেন, মনুর বাপ দুঃখ তো করল কত বৎসর! তোমরা আমাদের গরিবই দেখছ! বলতেও ইচ্ছা যায় না। এক সময়ে ওই মানুষ কাঁঠাল কাঠের চৌকিতে ঘুমাইছে, মাঘ মাসে সার্জের কোট আর শাল গায়ে দিছে, ভাতের পাতে নিত্য পরমান্ন খাইছে! সগলই...নাও, লও, ঘর দেখ, বুইঝা শুইঝা সারাইবা। বেঙের আধুলি!

—জমি বেইচা মা কত পাইলেন ?

—হ, লক্ষ টাকা পাইছি।

—আমারে কত দিবেন ?

—সে জনা আসুক। কথা কইয়া লইও।

মলন্দিও নিশ্বাস ফেলে।

—ঘরের বাসন তৈজস তো দেখত্যাছি। ঠাইকরেনের ঘরেও চোর পড়ে না, আমার ঘরেও না। অহন তো ঘর বান্ধার মানুষ বিস্তর। বানায়ও কইতরের খাঁচা। আমি কাম পাই না। বীরুবাবুরা ক্লাব ঘরটা বানাইয়া লইল, দিল যা...ঘর আমি নৈতন কইরা দিমু। পাকা খুঁটা দিছিলাম, দু'খান পালটাইতে হইব। পুরানা টিন...দেখি সারগাছির বাবু যদি...

বড় আতিপিতি ধায় মলন্দি এদিক-ওদিক। বড় তাড়া দেন মোহিনী। সদানন্দ বর্তমানে বসেন লটারির টিকিটের দোকানে। এখন লটারির দিন। মোহিনী কাঠের ঘেঁসের গল্প দেন। কেমন করে যেন ওঁদের ব্যবধান ঘুচতে থাকে। মোহিনীর কথাবার্তা যেন অন্য রকম হয়।

—কাগাবগারে কই! চাউলের দাম যখন কম, তখন যদি কিনা থোয়, একখান ঘরে বইয়া তো চাউলই বেচা যায়।

—কাগাবগারে কই, এই বয়সে চাউলের জন্য ঘরে ডাকাত পড়লে ঠেকাইতে পারতাম না।

—তয় খাতা পিনচিলের দোকান দিতে বলি কাগাবগারে। এই বয়সে কিষ্টনগর আর কেন ?

—কাগাবগারে কই, ভাইবা দেখমু।

বীরুর দোকান ধাঁ ধাঁ করে ওঠে, উদ্বোধনের দিন সদানন্দের ঘরেও মিষ্টির বাক্স আসে। দোকানের নাম "লালী" এবং সারাদিন সেখানে রেডিও মেরামতির আওয়াজ চলে ও দূরদর্শনে বাংলাদেশের প্রোগ্রাম দেখতে ভিড় জমে।

মোহিনীর ঘর সারাই হয় ধীরে ধীরে। মলন্দি তার সম্বন্ধীকে নিয়ে আসে এবং এমন সযত্নে ঘরটিকে নতুন চেহারা দেয়, যেন ওরা তাজমহল বানাচ্ছে, যা ওদের অমর করবে।

দেড় হাজারে হয় না, দু' হাজার মতো লাগে। কিন্তু বারান্দা চওড়া হয়, সেও মাটির দেয়ালে ঢাকা, তাতেও কপাট আছে, খুপড়ি দুটি জানলা। মাটির দেয়ালই চুনকাম হয়। পুরনো টিন মলন্দি অনেক চেষ্টায় যোগাড় করে।

উঠোনে তুলসীমঞ্চ।

মোহিনী এই প্রথম একটি স্বপ্নকে বাস্তব হতে দেখেন। বড় নরম গলায় বলেন, কাগাবগারে কই। চৈত্রে-বৈশাখে তুলসীতে ঝারা বাধমু। বারিন্দার কোলে জবা, গেঁদা, অতসী, দোপাটি, পূজার ফুল আর অন্যের বারি হইতে ·

সনানন্দ ক্ষীণ হাসেন।

—কাগাবগারে কই, একদিন হরিসভায় শীতল দিক।

—কাগাবগা বলুক, লক্ষ্মী পাতুম, চৌকি!

—আর কাসার গিলাস ?

—কাগাবগারে কই! সে হুতাশ আব নাই। ঘর মনের মতো হইছে, সগল হুতাশ শান্তি!

—আর লক্ষ্মী পাইতো ?

—আবাইগারা কাছে থাউক, দূরে থাউক, তাগারো যেমুন অমঙ্গল না হয়, তাগারো বাপ যেমুন এটু শান্তি পায়, আমার সিন্দুর যেন থাকে!

কাগাবগারে কই! আমার দেহ তো আর বয় না। কিষ্টনগর আইতে যাইতে নাভিশ্বাস। না গেলেও নয়।

মোহিনী ঘরটি নতুন করার পর যেন অপার ক্ষমতাশালিনী দেবী। তিনি অশেষ করুণায় বলেন, হেই দুঃখ বেশি দিনের নয়। কাগাবগা বইলা দিক।

—কাগাবগা কি স্বপ্নাদেশ শুনাইছে ?

—কাগাবগা বইলা দিক, হেই কষ্ট বেশি দিনের নয়।

তুলসীমঞ্চ বাঁধতে বাঁধতে মলন্দি ভাবে, স্বামী স্ত্রী! সরাসরি কথা বলে না কেন ?

বউকেও ও শুধোয়। মলন্দি যদিও দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থিত নিভুঁই নিচাষী লোক, তবু ভারতের শ্রেষ্ঠ উৎপন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ও একজন নেতা।

ভারত-ভূমিকে ও এগারোটি সন্তান উপহার দিয়েছে। করকরে টাকার লোভে অপারেশন না করালে ও আরো ফসল ফলিয়ে যেত। ওর মন কৃষিকাজ জানে না, শরীর জানে।

বউ বিরক্ত হয়ে বলল, ঠিকই করে। তোমার মত রাত্রিদিন "কই গেলা হলার মা ? কই গেলা, ধলার মা," বইলা চেচায় না।

মলন্দির হলা-ধলা-মলা-রাণী-মেনি-মুচুকুন্দ, এরা সাতজনই ছটকে পড়েছে। শেষের চারজন দোকানে-বাজারে সাট্টার ঠেকে করে খাচ্ছে।

মলন্দি সহসা গভীর জ্ঞানে আলোকিত হয়।

—ঠাইকরেন বুঝি কি পাইছে স্বপ্ন। অহন কথাও কেমুন, সগলডি যেমুন পরিবর্তন। নিত্য "কাগাবগা আয় আয়" ডাইকা ভাত ছিটায় উঠানে, আবার সকড়ি মুক্ত করে।

বউ নিশ্বাস ফেলে বলে, পাউক, শান্তি পাউক! দুই পোলা থাইকাও নাই, বুড়াবুড়ি বড় কষ্ট পাইছে!

বস্তুত ঘরটি করতে পেরে মোহিনী এক অবাস্তব আত্মবিশ্বাসে ভোগেন। ঘর হবার কথা নয় হল। পোস্টাপিসে আট হাজার টাকা থাকার নয়, আছে! তাহলে সদানন্দ যাতে এখানে কোনো কাজ পান, তাও হবে। মনুর বাপ একশত টাকাই আনুক, আমার ঘেঁষের গুলের তো বান্ধা খরিন্দার। বারিন্দার এক কোনা ভইরা রাখছি। আমরা চালাইয়া নিব অরি মধ্যে। এই বয়সে কিষ্টনগর! বাসে তো লাচাইতে লাচাইতে যায়। অই হাড় ক'খান ? দেহে আছে কি!

বীরু চট্টরাজ এম. আর. শপ, কেরোসিন, সব কিছুর ডীলার। তদুপরি সে পঞ্চায়েত প্রধানকে পরিচালনা করে।

তার কাছেই যান মোহিনী।

—বীরু! তোমার লিগগা আমার ঘর হইল। আজ জল পড়ে, কাল সাপ পড়ে, সে হইতে মুক্তি পাইলাম, অহন...

—কি, বলুন ?

—মনুর বাপরে একটা দোকানের কামও যদি দিতা!

—আপনি চাইলেই হয়।

—চাইত্যাছি তো!

—কাকার বয়সে...বসতে পারে দোকানে..."লালী"তেই বসুক না, আমি লটারির টিকিটের দোকানও করুম "লালী লটারি"। তাঁ কাকিমা, টাকা ফেলেন কিছু, কাম হইব।

—টাকা কোথা, বীরু ?

—আরে! ডাক ঘরে থোন নাই ?

—সেই টাকা!

—সঙ্গে লইবেন না কি ?

বীরু খুব হাসে। যাক্ কৃষ্ণনগর যাক আর আসুক। বুড়ো মরলে বুড়ির কাছ থেকে—

মোহিনীও হাসেন।

—না বীরু! সঙ্গে আমরাও লইব না, তুমিও লইবে না। যাউক গা, বইলা গেলাম, দেইখ।

—দেখুম অবশ্যই। কথা দিতে পারত্যাছি না। যুবারাই ব্যাকার, বুড়াদের কাম কি হয়? আমি দেখেন না, কত্‌গুলানরে কামে লাগাইছি। আমার কারবার, অরাও কইরা থাউক।

—হ্যাঁ বীরু, চলি।

সন্ধেবেলা আদা-চা আর মুড়ি নামিয়ে দিয়ে মোহিনী বলেন, কাগাবগারে বলি, গরম গরম খাউক। আর বলি, কিষ্টনগরে যাওন ছাইরা দিক। বারিন্দায় বইসা গুল বেচুক। আমি মলিন্দার এট্টা পোলারে পাইলে ডবল গুল দিতেপারি।

সদানন্দ জবাব দেন না। চা-টুকু তারিয়ে তারিয়ে খান। তারপর বলেন, কাগাবগারে কই, নূতন চৌকি আনতাম কবে?

—কেন, বুধবার?

—তয় বুধবার। কাগাবগারে কই, কিষ্টনগর যামুই না ওই মাস হইতে। কোম্পানি বলছে, হপ্তায় একবার আইয়েন, টিকিট লইয়া যান। আপনার হাতের টিকিটে পাঁচ হাজার টাকা, দুই হাজার টাকা, দু'বার উঠছে। ঘরে বইসা বেচেন।

মোহিনী অবাক হয়ে যায়। তিনি যা চান তাই হচ্ছে?

— কাগাবগারে কই, এই বুধবারই আনুক।

বুধবারই নতুন চৌকি আসে। বাবুদোলের মেলায় কেনা লক্ষ্মী, কাঠের পেঁচা, মৃতা শাশুড়ীর পায়ের আলতা ছাপ, সকলেরই জায়গা হয়ে যায়। জীবনে এই প্রথম, পোকায় কাটা তসর পরে মোহিনী প্রতিবেশিনীদের ডেকে আনেন। নতুন চৌকিতে লক্ষ্মী বসাইলাম। যাইয়েন দিদি। মায়েরে একটু রান্না ভোগ দিমু, গাঙ্গুলী বউ রানব।

জমি বেচা, ঘর সারানো, ইত্যাকার কারণে ঈর্ষায় জ্বলে থাকা প্রতিবেশিনীরা বলেন, যামু দিদি।

সদানন্দ বিষ্যুৎবার আর বেরোন না।

—কাগাবগারে জিগাই, দেহগতিক ভাল তো?

—কাগাবগারে বলি, কেমন জানি লাগে।

মোহিনী কপালে হাত রাখেন। না, জ্বর নয়।

—কাগাবগারে কই! আজ শুইয়া থাউক। কাল তারে লইয়া যামু ডাক্তারের কাছে।

—কাগাবগা বলুক, ডাক্তার দেখানোর কি হইছে?

—কাগাবগারে কই, শুইয়া থাউক। বিশ্রাম তো হয়ই না। বয়স অহন বাড়ত্যাছে।

—ধইন্য কাগাবগা। বাড়ির নামই হইছে কাগাবগার বাড়ি। তারা নাকি রোজই খাইয়া যায়।

—কাগাবগারে কই! তাগারো নাম লইতেছি লক্ষবার. পাতের ভাত এক মুঠি!

—কাগাবগারে কই, পুজার যোগাড়ে যাউক।

বড় সুন্দর পুজো হয়। সস্তা ধুপকাঠির গন্ধে, প্রদীপের আলোয়. পুরনো লক্ষ্মীর মুখ বড় প্রসন্ন দেখায়।

গাঙ্গুলী বউ বলে, এবার ইলেকট্রিক নিন মাসিমা।

—অনেকটি টাকার কাম মা!

—কিসের টাকা? সামনে পোল। শুধু তার টানবেন।

গাঙ্গুলী গিন্নি বলেন, পুজোর বাসনও কিনুন দিদি। জমি বেচলেন, ঘর সারালেন, টাকা রেখেছেন, অমন ফঙ্গবেনে বাসনে লক্ষ্মী পুজো হয়? আমি তো স্টীলের বাসন কিনেছি।

মনোরঞ্জনের বাল্যবন্ধুর মা বলেন, এই তো বেশ। মন চাঙ্গা তো কাঠ মে গঙ্গা, কথায় বলেছে।

মোহিনী নম্র হেসে বলেন, যে যেমন পারে দিদি!

সদানন্দও পিছনে বসে পুজো দেখেন, প্রসাদ খান। রাতে শুয়ে শুয়ে বলেন, কাগাবগারে কই, খিচুড়ি যেমুন দ্যাশের মতো খাইলাম। বড় ভালো পাক করছে বউটা?

মোহিনী বলেন, কাগাবগা জানি আরেকজনরে ঘুমাইতে বলে। আমারও ঘুম ধরছে মা! দেহ যেমুন সাপের বিষে অবল!

—তয় ঘুমাক।

মোহিনী ঘুমে ঢলে পড়েন। কি ঘুম, কি ঘুম! যেন লোহার বাসরে বেহুলার চোখের কালঘুম। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে বেহুলার কথা মনে হল কেন?

বেহুলার ঘুম কখন ভেঙেছিল?

মোহিনীর ঘুম ভেঙেছিল, গোঙানির শব্দে। লাফিয়ে মশারি তুলে নেমে হ্যারিকেন উসকে দেখেছিলেন সদানন্দ বুকে হাত রেখে গোঙাচ্ছেন। কাকের ডাকে বুঝেছিলেন কাকভোর।

উতলা, বিহ্বল মোহিনী বলেছিলেন, কাগাবগারে কই, কোথায় ব্যাদনা? অমন করে ক্যান্?

তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে "লালী" দোকানের পাহারাদারকে ডেকেছিলেন। তারপর ছুটেছিলেন ডাক্তারের বাড়ি। শীঘ্র চলেন গো ডাক্তারবাবু! সে মানুষ জানি কেমুন করত্যাছে।

ডাক্তার আসতে আসতে পাশের বাড়ির লোকজনও এসে পড়ে। মোহিনী বলেন, দ্যাখেন দ্যাখেন ভাল কইরা।

তারপর ঝুঁকে পড়ে ডেকেছিলেন, কাগাবগারে কই না, তোমারে কই, শুনত্যাছ? কথা কও না কেন? কারে খুঁজ?

ডাক্তার বলেছিলেন, সরে যান, দেখতে দিন।

মোহিনী মুখ আঁচল চেপে দাঁড়িয়ে কাঁপছিলেন।

—এ রকম ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক...

কার কথা বলছে ডাক্তার?

—প্রেসার দেখাতেন না?

—একবার দেখাইছিল।

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। ঘরের চারদিকে তাকাল। তার পর বলেন, সঙ্গে কেউ আসুন।

—কেন?

– সার্টিফিকেট দেব। কাল কি খেয়েছিলেন?

—ঠাকুরের ভোগ...

ডাক্তার মাথা নাড়েন।

—প্রেসার হঠাৎ বেড়ে, না কি বাড়ছিল...

—সে নাই?

সবাই খুব বিব্রত, অপ্রস্তুত।

গাঙ্গুলী গিন্নী বলেন, পুণ্যবান গো! পড়ে থাকলেন না, সেবা নিলেন না। কেমন নিমেষে ..

মোহিনী এখন হা হা করে কেঁদে বসে পড়েন।

—আমি কেন বা নিয়ম ভাঙলাম? কাগাবগারে মধ্যস্থ রাইখা কথা কই কত কাল, কেন সে কথা ভোললাম? কেন বা মধ্যস্থ রাখছিলাম? কাগাবগা রে! তরাত উড়াল দিবি, ডাইকা ফিরবি, তদের মাঝখানে রাইখা আমি কার লগে কথা কমু? কার লগে?

সকলে মনে করে এটা শোকের প্রলাপ। কেউ ছেলেদের ডাকতে যায়। ঘর ভরে যায় মানুষে।

—কাগাবগার পাঁচালী শ্যাষ কইরা দিলে, আমি কি লইয়া ভোলব?

এ কথার উত্তর হয় না। সকাল হয়।

গাছপাখালিক ডাকে।

মোহিনী কানে হাত চাপা দেন।

—আর ডাকিস না রে কাউয়া! কাগাবগা থইরা বলার মানুষ চইলা গিছে, অহন তর ডাক আমারে বিন্ধে।

কাক ডেকে চলে, ডাকাই তার কাজ।

কাগাবগার গীতিকা এমনি করেই ফুরায়।

অথচ সকালটি বড় সুন্দর ছিল।

৪ পরবাসী

একমাত্র সন্তান যদি ছেলে হয়, সে ছেলে যদি বিদেশনিবাসী হয়ে যায়, তার যদি দেশে আসা খুব অনিয়মিত হয়ে যায়, তার বাবা-মার অবস্থা কেমন হয় তা অজিত ও কুঙ্কুম জানতেন না, এখন জানেন।

জানেন বলেই অনমিত্রের চিঠিটা ওঁদের চমকিত করে দেয়। আসছে, অনমিত্র আসছে। শুধু অনমিত্র নয়, সঙ্গে লিজাও আসছে, আসছে ওদের ছেলেমেয়ে। ডেরিক ও শার্লি। লিজার যমজ ছেলেমেয়ে হয়েছিল। কুঙ্কুম হিসেব করে দেখেন ওদের বয়সও ষোল হয়ে গেল।

অনমিত্রের কত হল?

চল্লিশ।

লিজার বয়স তাহলে চুয়াল্লিশ হবে, অনমিত্রের চেয়ে তো বড়।

পড়তে গিয়ে ছেলে ওদেশে থেকে যাবে, ওদেশেই বিয়ে করবে, এসব ভাবেন নি কুঙ্কুম।

এখন অবশ্য মনে হয়।

চিঠিটা হাতে নিয়ে কুঙ্কুম বার বার পড়েন। না, চিঠিপত্র লেখার অভ্যাসও অনমিত্রের তেমন নেই। বছরে কয়েকটা ছবি দেওয়া কার্ড পান অবশ্য। অজিত বলেন, এতেই তুষ্ট থাকো। সময়ের সঙ্গে চলতে না জানলে কষ্ট পাবে।

—দীপার ছেলে তো খুব চিঠি লেখে।

—অনু চিরকালই কম লেখে। কলেজে পড়ার সময়ে, তার আগে উচ্চ মাধ্যমিক দিয়ে, ওই যে পুরী গেছে কাশ্মীর গেছে, একটা চিঠি লিখত?

—সে কথাও সত্যি।

—সবাই কি আমার মতো পত্রনবীশ হতে পারে? তোমাকে কত চিঠি লিখেছি বল তো?

—তোমার ছিল বাড়াবাড়ি। বহরমপুর গেলেও চিঠি লিখতে। আমার তো লজ্জাই করত।

—এটাও বলো, তেতাল্লিশ বছর বিয়ে হয়েছে, কি অনুগত আছি এখনো!

—এসব কথা থাক না।

—ছেলে আমার পত্রনবিশী পায়নি। কিন্তু কি পেয়েছে বল তো? বলতে পারলে একটা প্রাইজ পাবে।

—প্রাইজ! কি জানি কি বলছ?

অজিত বলেন, এদেশে ওদেশে এখন বিয়ে ভাঙে হরদম। অনু আর লিজার বিয়েটা টিকে আছে, ওরা সুখী, এটা কত ভালো কথা। পত্নীপ্রেমটা অনু আমার কাছে পেয়েছে।

—নিজেকে নিয়ে কত গর্বই না করতে পার !

—তোমাকে নিয়েও। প্রাইজটা দিয়েই ফেলি।

অজিত হাতের মুঠো খোলেন।

একটি আংটি।

—হারিয়ে ফেলে মনখারাপ করছিলে…

—কোথায় পেলে ?

—বাথরুমে।

—আমি তো পাইনি তখন।

হারানো জিনিস ফিরে পেয়ে কুঙ্কুম ঝলমল করে ওঠেন। আংটিটা অজিতের উপহার, হারালে মনে লাগত।

আংটিটা পেয়ে মন বলেছিল, ছেলের চিঠি আসবে।

শুধু কি চিঠি ? খুব, খুব আনন্দের খবর।

ফ্ল্যাটটা কেনা সার্থক হবে এবার।

এখন চোখে পড়ে অন্য চিঠিটা। ভাসুর লিখেছেন।

"কল্যাণীয় অজিত, তুমি ও বউমা প্রথমেই আমার আশীর্বাদ জানিবে। অনুকেও পত্র দিলাম। আমার শ্যালকের জামাই সিতাংশু পশ্চিম বার্লিন হইতে ফিরিল। সে অনুর সঙ্গে দেখা করিয়াছে। শুনিলাম শ্রীমান দেশে আসিবে। আসিলে তাহাকে লইয়া অবশ্য একবার আসিও। অসুবিধা হইবে না। পা ভাঙিবার পর হইতে আমার জন্যই কমোড ব্যবস্থা আছে। আমার বয়স হইয়াছে। তোমার বউদি তো তোমারই বয়সী। ছেলেরা, বউমারা, নাতিনরা তোমাদের দেখিতে চায়। নীলিমার জন্যই চিন্তা। আমাদের অবর্তমানে তাহাকে কে দেখিবে তাহাই ভাবি। যাহা হউক, তোমরা যাওয়া-আসা একেবারে ছাড়িয়া দিলে। ইহাই দুঃখ। একবার আসিলে মনে শান্তি পাইব। সকলের কুশল মঙ্গল প্রার্থনা করি। নিত্যাশীর্বাদক সুজিতমোহন ভট্টাচার্য।"

এ চিঠিটাও কুঙ্কুমকে উতলা করে। বহরমপুর গোরাবাজারে বাজারের পিছনের ওঁর শ্বশুরবাড়ি। কুঙ্কুমের বয়স সতের, অজিতের একুশ। সুজিতমোহন অজিতমোহন অনিলমোহন, তপনমোহন, নীলিমা, সুরমা, সরমা। শ্বশুর, খুড়শ্বশুর, শাশুড়ি, খুড়শাশুড়ি পিসশাশুড়ি—যাকে বলে জমজমাট সংসার।

তেতাল্লিশ বছরে সবই পালটে গেছে। অনিল ও তপন মালদা ও কুচবিহারে কাজকর্ম বাড়িঘর সংসার অবসর রাজনীতি ইত্যাদিতে ব্যস্ত মানুষ। শ্বশুর-শাশুড়িরা ছবি হয়ে গেছেন। সুরমা নাগপুরে, সরমা হরিয়ানায়। নীলিমা কুঙ্কুমের বয়সীই হবে। বিধবা হয়ে দাদার সংসারে সেই যে ফিরল বাইশ বছর বয়সে, থেকেই গেল।

সংসারের নিয়মেই সংসার ভাঙবে এ যেন সুজিতমোহন বুঝেছিলেন।

তাই সম্পত্তি চুলচেরা ভাগ করে ভাইদের দিয়ে দেন। এটাও সত্যি যে ভাইরা যে-যার অংশ বেচে দেয়। শুধু অজিতমোহন লিখে পড়ে নিজের অংশ দাদার ছেলেদের দিয়ে দেন।

বলেছিলেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কাজ করছি, একটা মাত্র ছেলে। আপনি এ বাড়ি ধরে বসে থাকলেন, আমরা কেরিয়ার করে নিলাম। আপনার হাতেই থাক। আমি তো থাকব না, আপনি থাকবেন। আপনি থাকলে আমিও যেতে আসতে পারব।

অজিত যতদিন অবসর নেননি ততদিন যাওয়াআসা হয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন ফ্ল্যাটে এসে উঠলেন। কেনা হয়েছিল অনেক আগে। তা বছর পনেরো তো হবে। কোয়ার্টার ছেড়ে নিজের ফ্ল্যাটে আসার সময়ে ভাসুর এসেছিলেন।

অনেকদিন যাওয়া হয় না।

যাবেন কি, অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে অজিত আরেকটি প্রাইভেট আপিসে ঢুকেছেন। মাইনে মাত্রই হাজার, কিন্তু সারাদিন ব্যস্ত থাকা যায়।

অজিত বাড়ি ফিরে দুটো চিঠিই দেখেন।

—চমৎকার! অনু আসছে তার জায়গায়, তারপর আমরাও যাব বহরমপুর। অনুর কাছে কলকাতাটাই দেশ। এখানে স্কুলে কলেজে পড়েছে, কিছুকাল রাজনীতিও করল। আমার কাছে "ফরিদপুর" নামের তাৎপর্যই নেই। ঠাকুরদাই দেশ ছেড়ে আসেন। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে, কে. এন. কলেজে পড়েছি। বহরমপুরটাই দেশ।

—দেশান্তরের ইতিহাস!

—এক পরিবারে কয়েক পুরুষে কত কি হল। ঠাকুরদা, বাবা, আমরা, বহরমপুরটা দেশ। অনুর দেশ কলকাতা। ওর ছেলে-মেয়ের কাছে পশ্চিম বার্লিন।

—যাক গে ওঁদের চিঠি লিখে দিই যে যাব। ওঁরা চাইবেন অনুও চলুক, সে দেখা যাবে। অনুরা চলে গেলে নিশ্চয় যাব। যাওয়াই হয় না।

—তাই!

—এখন বাড়িটা ওদের জন্যে গোছগাছ করা...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আরে ষোলশো স্কোয়ার ফুট, তিনটে শোবার ঘর, তিনটে বাথরুম। তিনটেই ওদের দিয়ে দাও। আমরা লিভিং রুমে শুয়ে যাব।

অজিত গভীর সন্তোষে বলেন, সব সময়ে বলে না এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে—এবার দেখো, আঁটবে না।

কুঙ্কুম নিশ্বাস ফেলেন, সবাই তো কেমন যেন হয়ে গেল, না? অনিল, তপন, কলকাতা এলেও শ্বশুরবাড়ি ওঠে। সেবার যা সুরমা তিনদিন থেকে গেল: দাদার ছেলেরাও থাকে না। বলে, লেকগার্ডেনে এত ভেতরে বাড়ি করেছে, কাজে আসি. চলাফেরার অসুবিধা হয়।

—নীলিমা তো আসবেই না।

—ভীষণ শুচিবাই ধরে গেছে।

—যাক গে! ভাগ্যে সেদিনই রং করিয়েছি।

—দেখ, চাদর-পর্দা-ওয়াড়-বাসনকোসন সব আছে তো? ওটা তোমার দপ্তর।

—সব আছে। দীপাকে একটু ডেকে নেব। ওর বেশ ঘর সাজানোতে হাত আছে। ওর ছেলে বউ তো ঘুরেও গেছে।

কুঙ্কুমের বোন দীপা আসে। স্বামী-স্ত্রী কোচিং সেণ্টার চালায়। খুব ব্যস্ত মহিলা। ও বলে, দক্ষিণাপণ থেকে যে গুজরাটি বেডকভার পর্দা কিনলি, তাই দিয়ে সাজিয়ে দে। ওরা ভারতীয় জিনিস খুব পছন্দ করে।

দীপা বলতে পারে। ওর ছেলে তো রোমে ভারতীয় শিল্পগয়না-পোশাকের ব্যবসাই করছে।

—ওরা সব খাবে তো?

—আমার বউ সব খায়। তোর বউ অবশ্য জার্মান। আমার বউ ইতালীর মেয়ে। ভারি মিষ্টি স্বভাব। ফলটল এনে রাখিস। যা চায় করে দিবি। সুপারমার্কেটও হয়ে গেছে।

তারপর সেই প্রত্যাশার দিন এসে পড়ে।

দমদমে একটা স্যুটকেস নিয়ে অনমিত্রকে আসতে দেখে কুঙ্কুম বলেন, এ কি? ওরা কোথায়?

—চলো চলো, বলছি। এ কি, বাবা সেই পুরোনো মরিস ধরে বসে আছে?

—কি সার্ভিসটা এখনো দেয়!

—হ্যাঁ, কলকাতা তো মরে যাচ্ছে। গাড়ি চালাবার রাস্তাই বা কোথায়।

—লিজাকে, ছেলেমেয়েদের আনলি না?

—সিতাংশু গিয়ে যা বলল, আর আসে?

—কি বলল?

—ভেজাল তেল খেয়ে মানুষ মরছে, ইনফেকশনে বাচ্চা মরছে, রাস্তায় জঞ্জালের পাহাড়···লিজা তো আসতেই চায় না। এ সব শুনে আর আসে?

কুঙ্কুম ক্ষীণ কণ্ঠে বলেন, আমরা তো আছি।

—তোমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে, না?

বাড়িতে পৌঁছে অনমিত্র বলে, ওদের কষ্টও হোত।

—কেন?

—জায়গা খুব কম তো! আমি যে বাড়ি কিনেছি...

তারপর একটু সমঝে যায়, থমকে দাঁড়ায়। এক হাতে বাবা আর এক হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে।

—আমার কিন্তু ভীষণ ভালো লাগছে মা!

—সত্যি?

—লাগবে না?

—সিতাংশু ওসব বলল কেন ?

—ও অবশ্য মন্দ ভেবে বলেনি। বলছিল এইসব নেগেটিভ খবর দিয়ে দিয়ে কলকাতাকে খাটো করা হচ্ছে। কলকাতা চলো, দেখবে এই ডেড সিটি ভারতে সবচেয়ে ভালোবাসতে জানে। লিজাকে কে বোঝাবে ?

খুব আরাম করে স্নান করে অনমিত্র। খুব তৃপ্তি করে খায়। অজিত বলেন, তাহলে ওদের দেখতে হলে আমাদের যেতে হবে।

—যাবে। একটা লম্বা ট্যুর করে এসো না।

—লিজা কি কোনো কাজ করে ?

—উইমেন্স লিব্-এর কাগজ চালায়।

—খুব ব্যস্ত ?

—ভীষণ!

—ছেলে মেয়ে ?

—তারাও ব্যস্ত। পড়া, খেলা, সোশ্যাল, এর বন্ধু ওর বান্ধবী, ওদের একটা গানবাজনার দল আছে।

অজিত বলেন, খুব ভাল।

কুঙ্কুম বলেন, দইটা খা।

—তোমরা কি রোজই ভাত খাও ?

—হ্যাঁ...তোকে রাতে লুচি ভেজে দেব।

অনমিত্র ছিটকে ওঠে।

—না না, রাতে ভাজা জিনিস নয়। রাতের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন ঘুমোতে হবে, বুঝেছ ? লম্বা প্লেন জার্নির পর...

—চল্, দেখ্ ঘর পছন্দ হয় কি না।

—লাভলি।

অনমিত্র ঘুমিয়ে পড়ে।

অজিত কুঙ্কুমকে বলেন, দুঃখ পেও না।

—তোমার চৌষট্টি, আমার ষাট, আমাদের তো যাওয়া হবে না। ওদের দেখাই হবে না।

তারপর বলেন, একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছে, ওই বা ক'দিন থাকবে ? মনে হয় না—

—দেখা যাক।

—বিকেলে দীপাদের, বড়দিকে আসতে না বললেই পারতাম। ওরা তো ভাবছে লিজারা—

—ওরা বুঝবে।

বিকেলে চা দেখে অনমিত্র আঁতকে ওঠে। —দুধ চিনি নয় মা, শুধু একটু হাল্কা লিকার। আসলে হেভি লাঞ্চ তো খাই না—যে জায়গায় বাড়ি করেছ

—হ্যাঁ, লেকেই তো হেঁটে আসতে পারি। সামারে আমরা সাতদিন ফরেস্টে হাঁটি, জানো? শরীরটা ফিট রাখা···দাঁড়াও ভুলেই যাচ্ছিলাম।

বাবার জন্য পাইপ, তামাক, মোজা। কুঙ্কুমের জনো ব্যাগ, কোনো মতেই ভাঙবে না এমন ফ্লাস্ক। সব বের করে দিয়ে অনমিত্র ওর জন্যে তৈরি করানো নতুন ঝকঝকে পাজামা পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে যায়। পাইপ অজিত বহুকাল ছেড়েছেন, তবু উপহারটি তুলে রাখেন।

সন্ধ্যায় সবাই আসে। অনমিত্রও ফেরে। রীতিমত চিন্তিত, বিরক্তও।

—আশ্চর্য! লেকের জল যা দেখলাম! হাঁটার আরামটাও নেই। বাড়ি থেকে বেরোতে লেভেল ক্রসিংয়ের জ্যাম! আর বাতাস যা নোংরা!

দীপা বলে, কলকাতায় তো আসিস না।

—কি দেখতে আসব বলো?

—আমাদের দেখতে। আমার বাড়ি যাবি তো?

—না ছোট মাসি, যাওয়া মানেই খাওয়া। আমি ভাবছি একবার কফি হাউসটা...নন্দন, না কি যেন হয়েছে...আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল কেমন হল..

দীপার মেয়ে রুমা কলকাতাপ্রেমিক।

—কলকাতা বেঁচেই আছে অনুদা!

—কেমন করে! এই ধোঁয়া, ধুলো, লোকের ভিড়, এতে শহর বাঁচে? ভালো কথা মা! খাওয়ার জল ফোটাচ্ছ তো? জল থেকেই কিন্তু···

—তোরা আসবি বলে জল ফুটিয়েছি।

—নিজেরা ব্যাকটেরিয়াগুলো খাও?

—টিউবওয়েলের জল খাই।

—কলকাতার টিউবওয়েল। কফুট বা পাইপ! আর মাটির নিচে যেখান থেকে জল উঠেছে, সে তো একেবারে পচা। না, কলকাতা যে কি আন্‌সেফ হয়ে গেছে···যাক গে, রুমা কি করছিস এখানে?

—একটা কলেজে ঢুকেছি, বাংলা পড়াচ্ছি।

—এখানে কাজ করতে তোর ভাল লাগে?

—আমি কি অন্য কোথাও কাজ করেছি?

—সেই তো কথা! কলকাতার লোকজন কলকাতার বাইরে আর কিছু জানেই না।

অজিত বলেন, কত ছেলেমেয়ে বিদেশ চলে যাচ্ছে···

—না গিয়ে কি করবে? এই আমি! কলকাতা কলকাতা করে কি হাঁপাচ্ছিলাম। কিন্তু দমদমের চেহারাই এমন বুক দমিয়ো দিল! কলকাতার কি ইম্পর্ট্যান্‌স আছে? বিদেশের কোন্ প্লেন এখান থেকে ছাড়ে? নো রুমা, দিল্লীকে দোষ চাপিও না। কলকাতাই কলকাতা বিষয়ে উদাসীন। নইলে সিভিক.এমিনিটিজ এ ভাবে চলে যায়?

বড় মাসি বলেন, ওসব কথা যাক অনু। তোর কথা বল্। খুব নাকি

বড় কাজ করিস, বউও করে। শুনেছি সব সত্যেনের কাছে। বাড়িতে চমৎকার বাগান, দুটো গাড়ি—

—এখন তো দুটো। কবে চারটে হয় দেখ। ছেলে মেয়ে নিজেরাই গাড়ি করবে।

—বাপ রে, জার্মানিতেও এত বোলবোলা?

কুঙ্কুম তাড়াতাড়ি বলেন, এখন চা খাবারটা আনি। তোমরা যা দেরি করে এলে!

—সত্যি মা! জীবনটা কি খাওয়ার পর খাওয়া? এসে থেকে যা দেখছি, মনে হচ্ছে দেশে খাদ্যাভাব নেই।

অজিত ঈষৎ হেসে বলেন, আজ একটা বিশেষ দিন তো। তোমাকে আমরা সব সময়ে পাই না। আমের সময়ে তোমার জ্যেঠা এখনো মন খারাপ করেন।

—ওঁরা ওখানেই আছেন?

—আর কোথায় যাবেন?

—আশ্চর্য! সেই বাড়িটা ··সেই পুকুরটা · মনে হত গল্পের রাজবাড়ি।

—এখন আর তেমন নেই।

—হ্যাঁ—সিতাংশু বলছিল বটে!

অজিত ও কুঙ্কুম বুঝতে পারছিলেন, অনু কিছুতে সহজ হতে পারছে না। ওর অসুবিধে হচ্ছে।

রাতে লোডশেডিংয়ে অত কষ্ট হয়নি, ইনভার্টার ছিল। কিন্তু মশারি দেখে অনমিত্র যেন কুঁকড়ে যায়।

—মশাও আছে এখনো?

—আছে, বেশি না হলেও আছে।

—ভাগ্যে ওরা আসেনি! মশা মানেই তো...

—মশারিটা কি পাতলা তাই দেখ্!

—মা! বাবা! দু'দিনের কাগজ উল্টে দেখলাম এনকেফালাইটিস, নয় জণ্ডিস, নয় কালাজ্বর, কলকাতা ভীষণ আনসেফ হয়ে গেছে, ভাবলে ভয় করে।

—এখানে তো এত বছর ছিলি!

—ছিলাম। কিন্তু জানো, সে কলকাতাটা হারিয়ে গেছে।

—ভাবিস না, ঘুমো।

—তোমরা এয়ারকণ্ডিশনার লাগাওনি কেন? আমি তো ··

—হ্যাঁ, তুই টাকা পাঠিয়েছিলি। সে টাকাটা বাড়িটার পেছনেই··· ...বাথরুম...ব্যালকনি...

—যাক গে। ঘুমোনো যাক।

অজিত আর কুঙ্কুম নিজেদের ঘরেই শুতে যান।

—অনু খুব বদলে গেছে।

—শিকড় কেটে গেছে।

—ওখানেই কি তেমন…

অজিত বলেন, এটাও সমস্যা।

—খুশি হতে পারছে না।

খুশি হতে পারে না অনমিত্র। কিছুতে নিজেকে মেলাতে পারে না। রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান ভালো, কিন্তু পথে এত ভিড়! কফি-হাউস দেখে মনে হল, এরা কাপগুলো কত ভালো করে ধোয়? মেট্রোরেল মন্দ নয়। কিন্তু কলকাতা থেকে সবুজ মুছে যাচ্ছে, নিশ্বাস কেমন করে নেয় মানুষ? সবচেয়ে অসহ্য পথঘাটের দুর্গতি, যানজটের স্থিতাবস্থা।

সাতদিনের পরই অনমিত্রের ফিরে যাবার সময় হয়। অজিত বলেন, আমার তো বয়স হোল অনু।

—ইয়ং সিক্সটিফোর। চৌষট্টিটা কোনো বয়স না বাবা। লিজার মা এখনো যা সচল! ওঁর তো সত্তর!

—বাড়িটা…আমার অবর্তমানে…

—মা থাকবে।

—তুই কি ফিরবি না?

—জানি না বাবা। যদি ফিরিও, খোলাখুলিই বলছি, দিল্লীতে থাকতে পারব। কলকাতায় নয়।

—কিন্তু বাড়িটা?

অনমিত্র বাবার কাঁধে হাত রাখে। নরম গলায় বলে, যা হয় কোর। মার থাকবে। মা বাড়ি বেচে আমার কাছে যেতে পারে। কোন ভালো কাজে দান করতে পারে।

—আমাদের পর এ বাড়ি তোমার।

—নট ব্যাড। বিক্রি করে দিল্লীতে…

—ওরা কি আসবেই না?

—হয়তো আসবে একবার। কাশ্মীর, দক্ষিণভারত, রাজস্থান, একটা লম্বা ভারতদর্শন ওদেরও ইচ্ছে। তখন কলকাতাতেও ঘুরে যাবে হয়তো।

খানিকটা অপরাধ স্বীকারোক্তির মত গলায় অনমিত্র বলে, লিজাকে তোমরা অ্যান্টি-ইন্ডিয়া ভেবো না। ও অ্যান্টি-কলকাতা। কলকাতা বিষয়ে যা জানে তা তো বইকাগজ পড়ে। বুঝতেই পারছ!

বাবা মার মন খারাপ করে দিয়ে, নিজেও মন খারাপ করে অনমিত্র চলে যায়।

আন্তরিক দুঃখে বলে যায়, হয় আমার কলকাতা হারিয়ে গেছে, নয় আমি হারিয়ে গেছি। ওদেশকে আপন ভাবতে এখনো বাধে, অথচ এখানে এসেও…

কুঙ্কুম কান্নাকাটি গোপনে সেরে নিয়েছিলেন। এখন বলেন, ভাল থাকো

যেখানে থাকো ভাল থাকো। আংটিটা লিজার, কানের দুল মেয়ের। সিল্কের শার্ট পিসটা ছেলের।

—ওরা খুব খুশি হবে।

অনমিত্র চলে যেতে কি অসহ শূন্যতা, কি যেন বেদনা। কুঙ্কুম বলেন, চল বহরমপুরে যাই। যাই যাচ্ছি করে করে⋯দাদা চলে গেলে আর তো কেউ ডাকবে না।

—তাই চলো।

নীলিমার জন্যে গরদের থান, বড় জায়ের জন্যে দামী টাঙাইল, ভাসুরের জন্যে ভালো ধুতি, ভাসুরপো-বউদের জন্যে ভালো শাড়ি, হাত খুলে কেনেন কুঙ্কুম! টাকা জমিয়ে জমিয়ে রাখাটাও কত নিরর্থক, তাই বুঝিয়ে দিয়ে গেল অনমিত্র। ওদের কিছুই দরকার নেই। সব ওদের আছে। এত "সব" কেমন করে থাকে?

বহরমপুরে যাবার অনেক ট্রেন, অনেক বাস। তবু ওঁরা বারোটার ট্রেনই ধরেন। ট্রেনের ফার্স্টক্লাসও যে সর্বসাধারণের হয়ে গেছে তা অজিত জানতেন না। এটাও মনে ছিল না পথে কতগুলো স্টেশন পড়ে। করমণ্ডল. ধৌলি, রাজধানী বা গীতাঞ্জলী এক্সপ্রেস নয় যে গতি থাকবে।

বহরমপুর নেমেই নিষ্প্রদীপ পাবেন, আর সাইকেল রিকশা ভাঙা রাস্তা দিয়ে নাচাতে নাচাতে নিয়ে যাবে তাও জানতেন না। বাড়ির গলিটা যেন বড়ই সরু আর বাজারের এত কাছে পাড়াটা যেন বড়ই ঘিঞ্জি।

সুজিতমোহন আর ওঁর স্ত্রীর অভ্যর্থনায় কোনো ভেজাল থাকে না অবশ্য। নবেন্দু, শোভনেন্দু, ওদের বউরা, ওদের ছেলেরা প্রণাম করে। সুজিত বলেন, দক্ষিণের ঘরে নিয়ে যাও ওদের। ওই ঘরেই অজিত থাকত।

বলেন, আপাতত যতক্ষণ না আলো আসে, ওপরেই বোস তোমরা। ইনভার্টার আছে।

ওপরে ওঠার সিঁড়ি বড় উঁচু উঁচু, আর দক্ষিণের ঘর আসবাবে বড়ই ঠাসা।

জা বলেন, এসব তো তোদেরই। নিয়ে গেলি না⋯

—আলমারিটা মার নয়?

—আলমারি ⋯আলনাটা⋯ছেলেদের সব অন্যরকম পছন্দ। বাড়তি সবই এ ঘরে ঢুকেছে।

—বোস দিদি, হাঁপাচ্ছ।

—আমরা যতদিন, ততদিন, তারপরেই ওরা⋯

—চলে যাবে?

—এবাড়ি রাখবে না, স্টেশনের দিকে বুঝি জমি কিনেছে⋯ওপরে বাথরুম নেই, বউদের অসুবিধে হয়।

সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে উঠোন পেরিয়ে কলঘরে যেতে কুঙ্কুমেরও খুব অসুবিধে হয়। পরিবর্তন এ বাড়িতেও হয়েছে। রান্নাঘরে গ্যাস, খাবার ঘরে ফ্রিজ। বসার ঘরে টেলিভিশন।

চা খেতে খেতে অজিত বলেন, এত মশা ছিল না।

সুজিত বলেন, কবে ছিল না? চিরকাল ছিল।

—গঙ্গার এত কাছে!

—শহর যে ঘিঞ্জি হয়ে গেছে।

নবেন্দুর বউ বিপাশা বলে, রাতে রুটি খাবেন, না ভাত মেজকাকা? আমাদের দুটোই হয়।

—রুটিই দিও। দাদা, কি খাও?

সুজিত নিঃশ্বাস ফেলেন।

—দিনেদুটো রুটি, রাতেও তাই। রিটায়ার করে ঘরে বসলাম, ধরে গেল ডায়াবেটিস।

কুঙ্কুম বলেন, আপনি আর দিদি চলুন না কলকাতা। ভালো ডাক্তার দেখাবেন, ক'দিন থাকবেন।

জা হেসে বলেন, বিপাশা টেলিফোন আপিসে কাজ করে, মালিনী স্কুলে। দুজনের ছেলেই স্কুলে যায়। নবু আর শোভন সারাদিন কাজে থাকে। আজকাল বহরমপুরে চুরি ডাকাতি খুব হয়। বাড়ি ধরে বসে থাকি।

—এখনও রাঁধো, দিদি?

—তুই রাঁধিস?

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—আমি আর পারি না। ভুবন ছিল যে, তার মেয়েটাই দিন রাত থাকে। মেয়ে নিয়ে থাকে। ওরা দুজন, ঠিকে লোক চলে যায়। তা, অনু একবার এল না?

—সময়ই পেল না।

—বউ-নাতি-নাতনি কেমন দেখলি?

—ওরা আসতে পারেনি দিদি।

—দেখা হল না।

—নীলিমা কোথায়?

—ঠাকুর ঘরে।

—ছাদে?

বিপাশা হেসে বলে, ঠাকুরঘরের সঙ্গে ঘর হয়েছে। কাকভোর গঙ্গাস্নান করে সেই যে উঠে যান, আবার পরদিন নামেন। ওঁর রান্না খাওয়া সব ও পরে।

জা বলেন, পাঁজি দেখে বছরে ষাট-সত্তর দিন উপোস করবে, দোতলা-একতলায় দাঁড়াবে না, সব গড়লেস্ হয়ে গেছে। ছাতের কোণে কল-বাথরুম। কি বলব! একেক দিন দশবার স্নান করে।

সুজিত বলেন, সমস্যা!

নবেন্দু বলে, কিছু না। আশ্রমে চলে যাবেন, টাকা দিলেই থাকার ব্যবস্থা হবে।

কুঙ্কুম বলেন, কাল যাব ওপরে।

—না কাকীমা। ও ভুলও কোর না! পিসি...যাকে বলে ...বাবা মা, আমাদের কারো সঙ্গে কথা বলে না।

—সবাই গড্‌লেস?

—সবাই।

রাতে শুতে এসে কুঙ্কুম বিপাশাকে বলেন, রাতে বাথরুমের ব্যবস্থা কোথায়?

—বারান্দায়, কাকীমা।

—কিন্তু...

—ওপরে বাথরুম করার জায়গাও নেই। আসলে বাড়িটা সেকেলে তো! এই জায়গায় কত ভালো বাড়ি হয়!* চারটে ফ্ল্যাট হতে পারে।

কুঙ্কুমেরও মনে হয় এত মোটা মোটা থাম, এত চওড়া বারান্দা, জায়গার খুব অপচয়।

—মশারি গুঁজে নেবেন কিন্তু।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

মোটা নাইলনের খরখরে মশারি, পাখা ঘোরে আস্তে, অজিত বলেন, আগে সুতোর মশারিতেই শুতাম।

—তখন তাই ছিল।

—সকালে বেড-টি তো পাব না।

—না...নিচে গিয়ে খাবে।

—ঘরটা কবরখানা করে ফেলেছে।

—জানলা দিয়েও বাতাস আসে না।

—যাক গে, ঘুমোও। সকালে শহরটা টহল মারতে বেরোব। একবার প্রণবের বাড়ি যাব।

—যেও। কাল বাজারে যেও।

অজিত বাজারে যাবার কথা বললে সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠেন।

সুজিত বলেন, নাতিরা খায় মাংস, বউমারা ছোট মাছ ছোঁন না, নবু আর শোভন? বারো মাস দিনে রাতে কাটা মাছ খায়। আমি আর তোর বউদি কয়েক বছর নিরামিষ খাই।

—এত রকম রান্না হয়?

—করতেই হয়।

কুঙ্কুম বলেন, আনুন না বাজার। যাক আমিই রান্না করব। দেখবেন খেয়ে।

অজিত যান বাজারে। কুঙ্কুম সুটকেস খুলে বসেন। দুই নাতিকে একশো একশো দু'শো টাকা দেন। জা কাপড়খানি হাতে নিয়ে বলেন, যাক্! ছেলের বিয়ের নমস্কারী পেলাম এতদিনে।

—যা বলো!

—সেই এলি, কালীপুজোতে যদি আসতিস্।

—এখনো পুজো কর?

—বংশের নিয়মটা···আর কেউ তো রাখল না। আমরা যতদিন আছি —

—তোমরা নিরামিশ ধরলে কেন? দাদা তো মাছ ছাড়া খেতে পারতেন না।

—মন্ত্র নিলাম যে।

—ও'র তো ডায়াবেটিসে প্রোটিন ..

—ওই ছানা, দুধ, সয়াবিন ···তোরা মন্তর নিসনি?

—না দিদি।

—তবে নিরিমিষটা রাঁধিস না। মেনিই করবে। স্বজাতি বলেই ওকে রাখা, মন্তরও নিয়েছে—কলকাতায় তো এখন এসব মানামানি নেই। যে জন্যে উনি যেতে চান না।

কুঙ্কুমের নিজেকে মনে হয় অন্য গ্রহের জীব।

—বাসি কাপড় ছেড়েছিস তো?

—এই ছেড়ে আসি।

অজিত রাজ্যের বাজার করে আনেন। কুঙ্কুম মেনির তত্ত্বাবধানে রান্না করতে গলদঘর্ম হন। এত জাত মানামানি, রান্নার বিষয়ে কড়াকড়ি আগে এ বাড়িতে ছিল কি? কুঙ্কুমের মনে পড়ে না।

মেনি বলে, মেজ বউদির আমাকে মনে নেই।

—অনেকদিন আসি না তো।

—কলকাতায় না কি খুব বড় বাড়ি করেছ?

—একবার যেও।

—এদিকের তাকের বাসনকোসন নিও না।

—ওগুলো দিদিদের রান্নার?

—হ্যাঁ গো। ব্যবস্থা দেখছ না?

বড় রান্নাঘরের এধারে আমিষ, ওধারে নিরিমিষ হেঁসেল। মেনি বলে, বউরা মানামানি করে না। তাতেই তো ওদের ঢুকতে দেয় না বড় বউদি।

নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমার ঘাড়ে সব। এদিকে সারব, আবার কাপড় ছাড়ব, হাত পা ধোব, ওদিকে যাব।

রাতে অজিত কুঙ্কুমকে বলেন, বাবার আমলের যত নিষেধকরণ সব রেখে দিয়েছে দাদা।

—হ্যাঁ, বাড়িতে কোনো খোলামেলা ভাব নেই।

—নীলিমাকে অত্যধিক ব্রহ্মচর্য পালন করিয়ে এই তো ফল হয়েছে, রোগ জন্মে গেছে।

—কোথায় কি দেখাসাক্ষাৎ করবে করে এসো।

—ভাল লাগছে না।

—বাড়ি ছেড়ে থাকা নিরাপদ নয়।

দেখাসাক্ষাৎ করতেই বেরিয়েছিলেন অজিত। আর ঘুরতে ঘুরতে ছোট-বেলার সহপাঠি, বর্তমানে টিউটোরিয়াল হোমের অধ্যক্ষ মতিউর রহমানের বাড়িসে বসে চা জলখাবার খেয়ে এসেছিলেন, এতেই সুজিতমোহনের বুকে বড় ধাক্কা লাগে।

—ছাত্রজীবনে সব করা যায় অজিত। এখন…আমরা যেতাম। ওদের কোনদিন বাড়িতে এনেছি ?

—কিন্তু দাদা! এসব আজকাল কে মানে ?

এ সময়েই নীলিমাকে প্রথম দেখেন ওঁরা। শুকনো পাকানো চেহারা, ছাঁটা চুল এই বুদ্ধা যে নীলিমা, তা অজিত বুঝতেই পারেননি।

—গেল! সব গেল! বাড়ি অশুদ্ধ হয়ে গেল, বলছ কি বড়দা ? বাড়ি ধোও, গঙ্গাজল ছেটাও…

কাঁপতে কাঁপতে নীলিমা আবার গঙ্গার দিকে দৌড়য়।

নবু বলে, ছি ছি ছি! মেজকাকা এতদিন বাদে এলেন, তোমরা তিলকে তাল করে….

সুজিতমোহন বলেন, জানি, জানি! তোমরা কি বলবে তাও জানি। কিন্তু আমি যে সংস্কার ছাড়তে পারছি না। সবই তো ভাসমান চারদিকে। বাপ-ঠাকুর্দার ট্রাডিশনটা একজনকে তো রাখতে হবে।

অজিত আস্তে বলেন, দাদা! একা কি সে কাজ পারা যায় ? যা তখন হোত, তা এখন হয় না।

নবু বল্লে, এতটা ছিল না। ওই মন্ত্র নিয়েই…

জা শুধুই কাঁদেন।

পরদিনই দেখা যায় ওঁদের ভাগীরথী এক্সপ্রেসে। কলকাতার বাড়ি অরক্ষিত, অজিতের আপিস আছে, এ সব শুনতে শুনতে সুজিত বলেছিলেন, আর কি আসবে ?

—কেন আসব না দাদা ?

কুঙ্কুম জাকে দূরত্ব রেখেই প্রণাম করেন। ওঁদের তুলে দিতে এসে শোভনেন্দু বলে, আপনি রহমান সাহেবের নাম না বললে কোন গোল হত না। দাদা কোথায় যাচ্ছে না, আমি কোথায় যাই না ? ওঁদেরকে কিছু বলি না।

—হ্যাঁ · জানা ছিল না। এখন বুঝছি দাদা বউদির কড়াকড়িতেই

নীলিমা...

ট্রেন চলতে থাকে।

কুঙ্কুম ভুরু কুঁচকে বসে আছেন।

—কি ভাবছ ?

কুঙ্কুম ঈষৎ হাসেন।

—দেখ অনু কলকাতাতে কোন বন্ধন খুঁজে পেল না। তুমি বললে ওটা প্রবাসী বাঙালীর সাইকোলজি। বহরমপুরে গিয়েও আমরা হাঁপিয়ে গেলাম দু'দিনেই।

—হ্যাঁ...বন্ধন খুঁজে পেলাম না। বার্লিন আর কলকাতা। অনেক দূর। কলকাতা আর বহরমপুরও অনেক দূর। আমরা যেন প্রবাস থেকেই ওখানে গিয়েছিলাম।

বাইরে ছুটন্ত ধানক্ষেত দেখতে দেখতে কুঙ্কুম বলেন, এ কথাটা অনুকে জানাতে হবে। ছেলেটা মনে মনে নিজেকে দোষী ভেবে গেল।

৫ পথিকৃৎ

অনবরত বাগচী বললেন, 'আন্তর্জাতিক ফিল্মের ডেফিনিশন কি বলুন তো ? আপনাদের কি মনে হয় তা বলবেন না। আন্তর্জাতিক ছবি বলতে সত্যি কি বোঝায় জানেন তো তাই বলুন।'

'যে ছবি কেউ বুঝতে পারে না।' রাজেনবাবু বললেন।

'নট্ ওনলি দ্যাট। ছবি দেখে পাবলিক সিনেমার চেয়ার টেবিল ভাঙে আর সর্বসাকুল্যে ছবি মাত্রই ছ'দিন আটদিন চলে।' আমি বললুম।

রাজেনবাবুর শ্যালক ভোঁদা ওরফে ব্রতীন অনেকক্ষণ ধরে হাতের নখের দিকে চেয়ে বসেছিল। ভোঁদার ডানহাতের একটি নখ কিউটেক্সে লাল। একটি রক্তাভ নখ নিয়ে পথেঘাটে বেরুতে ও লজ্জা পায় না। ভোঁদাকে দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। ও হচ্ছে একেবারে আজকের ছেলে। এই বর্তমান সময়ের মধ্যেই আমাদের বাস অথচ আমরা সময়কে চিনি না। মাঝে মাঝে ভোঁদাকে দেখলে পরে তবু যেন একটু টের পাই চারপাশে কি ঘটে যাচ্ছে।

'ভোঁদা, আন্তর্জাতিক ছবি কি ?'

'রিয়ালি !' ভোঁদা আবার ওর একটি লাল নখের দিকে তাকাল।

'জান ?'

ভোঁদা ওর জামাইবাবুর দিকে চেয়ে বললে, 'এ রোজ ইজ এ রোজ ইজ এ রোজ !'

'তার মানে ?'

'আন্তর্জাতিক ছবি মানে আন্তর্জাতিক ছবি মানে আন্তর্জাতিক ছবি।'

'হুঃ।'

'মানে ব্যেআরিমান, মানে আন্তোনিওনি মানে ফেলিনি।'

রাজেনবাবু অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'যতো রাজ্যের গেঁজালির বস্তা খুলিস্‌নে তো ভোঁদা। সিনেমা দেখতে যায় কেন মানুষ বল্‌ তো! দু-দণ্ড সব ভুলে থাকবে বলে। একটু হাসবে, একটু কাঁদবে, একটু আনন্দে থাকবে। তোমার ঐ ফিলিম্‌সোসাইটির পাল্লায় পড়ে যতোবার যতো ছবি দেখতে গেছি ততবারই আমার ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গেছে বাপু। ছবি দেখা মানে কি বেঁধে মার খাওয়া? স্পষ্ট দেখলুম একটা দাঁড়কাক ডালে বসে চেঁচাচ্ছে, তুই বললি ওটা বেদের হোমাপাখী। তোর জ্যাঠার মত দেখতে লোকটা এন্তার মদ খেতে লাগল তুই বলে দিলি ও নাকি পরমব্রহ্ম নাকি বেহ্মা।'

ভোঁদা হাসতে লাগল।

কিন্তু অনবরত বাগচী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ডেফিনিশন কোথায়?'

ভোঁদা বললে, 'আন্তর্জাতিক ছবি হচ্ছে সেই ছবি যার পরিচালক বর্তমান সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ভাবে।'

আমি বললাম, 'ওদেশে গিয়ে যা সোনার হাতী পায় আর এদেশের দর্শক যা দেখে চেয়ার ভাঙে।'

ভোঁদা বললে, 'জামাইবাবুর সংসার ভুলে থাকবার থিওরীটাও ভুল। যদি ভুলেই থাকতে চান তাহলে আমার বন্ধু সমীরের কাছে গেলেই হয়। সমীর এ্যসা জাপানী প্যাঁচ শিখেছে না, জুডোর প্যাঁচে আপনার মেড়ুলা অব্‌লা গাটায় একখানা টিপুনী দিলে তিন ঘণ্টা গোলকধামে বিচরণ করবেন।'

'গুন্ডোটার সঙ্গে মিশবি না ভোঁদা।' রাজেনবাবু বললেন।'

'গুন্ডো কাকে বলছেন। জানেন সমীর ড্রামা অফ নন-কম্যুনিকেশন শেখে? তিনটে চরিত্র স্টেজে এল কিন্তু কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না।'

'সেজন্যে থেটার করবার দরকার কি?' রাজেনবাবু খেঁকিয়ে বললেন। 'ট্রেনের লাইনে দু'হাজার লোক বসে গেল, দিল্লীর ট্রেন পাঁশকুড়ায় রইল, ধব্‌ধবার্‌ গাড়ী পাটনা গেল অমনি ননকম্যুনিকেশন হয়ে গেল।'

অনবরত বাগচী বললেন, 'অবান্তর কথা ছেড়ে যদি আমাদের দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ছবির কথা শুনতে চান তাহলে বলি, আমার গদাকাকা ভারতবর্ষের প্রথম আন্তর্জাতিক ছবি করেছিলেন। একটু বিফোর টাইম হয়ে গেছল এই যা।'

'গদাকাকা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের বগুড়ার গদাধারী সান্ডেল। নানাদিকে মডার্ণ ম্যান ছিলেন মশায়। এই দেখুন না, আধুনিক উপন্যাসে পড়েন না ছোকরারা বুড়ীদের প্রেমে পড়ছে? আহা, পড়েন তো বাংলা নভেল যাতে শেষ পর্যন্ত সতী স্ত্রী নয়তো সতী বেশ্যা নয়তো মমতাময়ী জননীরা জিতে যায়।

'গদাকাকা জন্মের পর বছর পাঁচেক কোন কথা বলেন নি। সবাই ধরে নিয়েছিল উনি বোবা। কিন্তু কথা বলতে শিখেই উনি বলেছিলেন বাতাসী পিসীকে বিয়ে করব।

'বাতাসী পিসীর বয়স তখন একাত্তর, গদাকাকার বয়স পাঁচ। গদাকাকা আরো বলেছিলেন, "বিয়ে করে বাতাসী পিসীকে ঠ্যাঙাব।" এ কথা শুনে বাতাসী পিসী, "এ যে তানার মত কথা গো!" বলে আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, "তানার স্বর্গলাভের পর কেউ তো আমায় কয় না লাথি মারব, জুতা মারুব, গারের চোটে কৈলাস দ্যাখায়ে দেব। আরে গোলক! এমন পুত্র তুই পালি কন্ থে'?

'এ হেন বিলাপ থেকে মনে হতে পারে বাতাসী পিসী তাঁর স্বামীর শোকে মুহ্যমান ছিলেন কিন্তু আমরা জানতাম পিসেমশায়ের মরার আগে সহজে যখন প্রাণ বেরুচ্ছিল না তখন বাতাসী পিসী বিলাপ করেছিলেন, "কত সাধ ছিল হবিষ্যি করব। একখান উনুন পাত্যা থুলাম, পিতলের বোগনো কিনল্যাম, ঘিটুক্ অব্দি আন্যা থুলাম কিন্তু মিন্সে কি অবিবেচক তোমরা তাই কও!" এ কথা শুনে পিসেমশায় পুরনো অভ্যেসবশত "এ্যাইও!" বলে হুঙ্কার করতে গিয়েই প্রাণটুকু হারিয়েছিলেন।

'জন্মান্তরিত পিসেমশায় ছিলেন না গদাকা'। উনি ছিলেন ম্যান বিফোর টাইম। ওঁর বাবাকে উনি প্রায়ই বুড়্যা পাঁঠা বলতেন আর বাপকে প্রবল ঘৃণা অথবা বাঘের মত ভালবাসা যে চিন্তাবিদের লক্ষণ তা কে না জানে বলুন?'

'কেন?' রাজেনবাবু এখনো অনবরত বাগচীর কথা সব সময়ে বুঝতে পারেন না।

'কেন মানে? দস্তয়েভ্স্কী? কাফকা? আমাদের ঔরংজেব? আরে মশায়, এমন সব বাঘা বাঘা লোক আছে না, তাদের ঝোঁক চাপলে প্রমাণ করে দেবে বাঁমকদফিস থেকে বিবেকানন্দ সবাই ফাদার অব্সেশনে ভুগত। যাই হোক, আমার পষ্ট মনে আছে থেকে থেকেই গদাকা' ট্রেনের হুইসিলের মত একটা কানফাটানো শব্দ করতেন। আমাদের বলতেন, "বুড়্যা পাঁঠা খাট্যা খুট্যা আস্যা যেমন একটু ঘুম আসে, আমি এমন এক কু চিক্কার দেই না? বুড়্যা এক্কেরে কাঁপ্যা ঝাঁপ্যা অস্থির।"

'গদাকা ম্যান অফ ফিউচার হবার ফলে পাঁচ বছরেই ওঁর প্রেমের ইচ্ছে ফুরিয়ে গিয়েছিল। সাবালক ছেলেপুলে যেসব বজ্জাতি করে সেসব উনি ষোল বছরের মধ্যেই শেষ করে দিয়েছিলেন। যাত্রায় মেয়ে সাজা, মা-র বাক্সের ক্যাশ ভাঙা, সবই ওঁর হয়ে গিয়েছিল। ইস্কুলের পাট ক্লাস ফাইভেই শেষ করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন "রবি ঠাকুর কি ইস্কুল করেছিল?" তা ছাড়া আরো আরো ভাল কাজ করেছিলেন। ওঁর মাতামহ মরে যাবার পর মামাকে বলেছিলেন "দ্যাখেন বড়মামা, দিদ্মার বয়েস বাষট্টি হলে কি হয় আপনারা

ওনারে বিধব্যা বিয়ে দ্যান। উনি মাছ এত ভালবাসেন! বিধব্যা বিয়ে দিলে দেশে গাঁয়ে আপনার নাম থাকবে।”

‘বড়মামা এর জবাবে গদাকাকাকে কানে মধুমোড়া দিয়েছিলেন। কানের লতি দু'দিকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘোরাতে ওঁর মত কেউই পারত না। যা হোক, ইতিমধ্যে গোলকদাদু গোলোকে গেলেন। গদাকাকা বললেন, “মা! এখন অ্যামাগারে কষ্টের সময়। তুমি বিধব্যা, তোমার এক মুষ্টি চাল একটা কাঁচকলাই যথেষ্ট। তুমিই এই বাড়ীটুকু, এই একবিঘা জমি, আর কলাগাছ ক'টা নিয়্যা থাক।”

“তুই যাস কনে?”

‘গদাকাকা মুচকি হেসে বললেন, “আমি কি ঘরে থাকার ছাওয়াল মা?”

‘বলে ডোমজুড়ে গিয়ে বাকি জমিজমা বেচে টাকা নিয়ে গদাকাকা সর্ষের তেলের কল কিনে ফেললেন। তার কিছুদিন বাদেই চালের কল। যুদ্ধ যখন মাঝপথে ততদিনে গদাকা' দেদার টাকা কামিয়ে ফেলেছেন। আমি সে সময়ে মানসসরোবরে বরাবরকার মতো ছাটতে চলেছি। চিঠি পেলাম, পটলা, চলে আয়।’

‘আপনার ডাকনাম কি পটলা?’

‘গদাকাকা আমায় পটলা বলতেন।’

‘আপনি মানসসরোবর যাচ্ছিলেন কেন?’

‘মশায় জীবনে সতেরোবার সতেরোজন মেয়ে বুকে দাগ দিলে কি আপনি বর্ধমান যান? তখন আমি মানসসরোবর যাব বলে সব বাঁধছি-ছাঁদছি এমন সময়ে কাকার চিঠি—পটলা চলে আয়, ফিল্ম করবি।’

‘আপনাকে?’

‘ওটা তো টোপ মশায়। আসলে গদাকাকার তখনি সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। একে তো একটা জিনিয়াস, তায় হাতে পেয়ে গিছলেন এক বেটা আমেরিকান সায়েবের একখানা মুভি ক্যামেরা। কি করে পেয়েছিলেন সে কথা জিজ্ঞেস করবেন না। তা ক্যামেরা হাতে পেয়েই গদাকা' ঠিক করলেন ফিল্ম করবেন। কিন্তু একা একা ভরসা পেলেন না তাই লিখলেন পটলা চলে আয়।’

‘আপনি গেলেন?’

‘নিশ্চয়। একে উনি বারেন্দ্র। তার ওপর ছোটবেলা বাতাসী পিসীকে বিয়ে করতে চাওয়া, দিদিমাকে বিয়ে দেবার ইচ্ছে, ফাদার অবসেশন, এ-সব যতই ভেবেছি ততই মনে হয়েছে উনি হচ্ছেন মানুষের মধ্যে কাঁঠাল।’

‘কাঁঠাল!’

‘আহা, কাঁঠালের মতই ওঁর বাইরেটা কুটকুটে কিন্তু ভেতর শাঁসালো। তা ছাড়া আমায় কিছু ক্যাশকড়িরও দরকার ছিল। যদিও বাংলায় হিমালয়ান লিটারেচার পড়ে পড়ে একথা আমার জানতে বাকি ছিল না হিমালয়ে যেতে কোন খরচাপাতি লাগে না। পথেঘাটে সুন্দরী মেয়েছেলেরা খেতে-টেতে দেয়,

ভাল ভাল লোকেরা বাবা বাছা বলে বলে গায়ে পড়ে সাহায্য করে। তবু বুঝলেন না ? হ্যাভিং এ কোয়েশ্চনিং মাইণ্ড আমার মনে হচ্ছিল নিজের বলে কিছু রেস্ত রাখা ভাল।

'আমি যখন গেলাম তখন দেখলাম গদাকা' রীতিমত ক্ষেপে গেছেন। কিন্তু হ্যামলেটের মত ওঁর ক্ষ্যাপামিতেও রীতিমত মেথড আছে। দাড়ি নিয়ে হাঁড়িমুখো কে না কে এক ছোকরা বসেছিল। গদাকাকা বললেন, "হাতের গুলীখানা দেখেছিস ? রোজ কতগুলো ডনবোঠকী দেয় ?" আমি বললাম, "উনি কি ফিল্‌মে ডন মারবেন !" গদাকা' বললেন, "না রে না। ও স্ক্রিপ্‌ট লিখবে।"

আমি বললাম, "আপনার কথাবার্তা তো খুব পরিষ্কার হয়েছে ?"

কাকা বললেন, "ফিলিম করা কি একটা সোজা কথা ? কথাবার্তা পরিষ্কার নাহলে লোকে কি বলবে ?"

'দেড়ে ছোকরার পাশে লুঙ্গি পরে চিত হয়ে একটা সায়েব ঘুমোচ্ছিল। গদাকা' বললেন, "ঐ সায়েবটা কে জানিস ? ও হচ্ছে চার্লির ভাস্তে। চার্লি কে বুঝলি তো ?"

আমি বললাম, "ও এখানে কি করছে ?' .গদাকা' বললেন, "ওই তো আমায় বললে, সাণ্ডেল, তোমার সিনেমা হাউসে কি এক একটা ছবি দেখাও আর যাদের ছবি তারা লাখ লাখ টাকা পেটে। লাগাও দেখি একখানা, আমি তোমায় ঠিক ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাব।"

আমি বললাম. "ছবি করতে গল্প লাগে তা জানেন।"

"জানি বই কি।"

"সে গল্প সিনেমার জন্যে লিখতে হয়, লেখার আবার নিয়ম আছে। তা ছাড়া অভিনেতা-অভিনেত্রী, কোন্ জায়গায় তোলা হবে, সব ভাবতে হবে না ? খরচায় খরচায় আপনি জেরবার হয়ে যাবেন।"

গদাকা' বললেন, "আমি লিখব।"

"আপনি ?"

"আরে, আমার জীবন কাহিনীই তো ছবি হবে রে ! বাবা জগাই, তুমি পটলাকে একটু বুঝিয়ে বল তো ? নিজে না পার তো সায়েবটাকে ডেকে দাও।"

আমি ব্যাপার সুবিধের বুঝলাম না। সায়েবটা আমায় বললে কোন হতভাগা সায়েব না কি 'নানুক' না কি ছবি তুলেছে। গদাকাকা নাকি প্রথম মডার্ন ইণ্ডিয়ান, যার জীবন ছবি করবার যোগ্য। গদাকা'র তেলের কল, চালের কল. পুকুর পাড়ে দাঁতনকরা, ডোমজুড়ের চারদিকের দৃশ্য না কি ট্রু হিউম্যান ডকুমেণ্ট হবার যোগ্য।

আমার পেটের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। বন্দুকটা অব্দি কাছে নেই যে ফাঁকা আওয়াজ করে বেটাকে ভয় দেখাই। অবিশ্যি ওকে আর আমি কি ভয় দেখাব। ও কি আর বন্দুক দেখেনি ? তবু, গদাকাকার স্বিতার্থে

আমি বললাম, 'অ্যাকটিং করবে কে ?'

'ও বললে, অল রিয়াল মেন অ্যান্ড উইমেন।'

"উইমেন ?"

'দে আর মাস্ট্ বী সাম্। গদাবাবুর মনে দেখলাম সাম ওয়ান কল্ড বাতাসী, ও'র বাবা, আরো কাকে কাকে যেন দেখাবার ইচ্ছে।'

আমি বললাম, 'সায়েব, হি ইজ ম্যাড। তুমি আর ধুনোর গন্ধ দিও না।

সায়েব বললে, 'ম্যাড ? তুমি কি ভাব সিনেমা মানে কতকগুলো বস্তাপচা, সেণ্টিমেণ্টের ছড়াছড়ি ?'

আমি বললাম, 'না।'

'সিনেমা মানে কি কতকগুলো মোমের পুতুলের মত দেখতে স্যুডো ফ্রয়েডীয় মেয়ে-পুরুষের বাঁদর নাচ ?'

'না!' সত্যি বলতে কি আমার মাথা ধরেছিল।

'সিনেমা মানে মানুষ, জীবন, সত্য। তোমাদের হিরো ডেবী মুকার্জি, লেডী স্টার নাইস লুকিং ম্যান ওম্যান, কিন্তু বেংগলের ছেলেরা মেয়েরা তো ও-রকম দেখতে হয় না।

'য়ু মাস্ট লেট পীপ্ল সি দ্য ট্রুথ।'

আমি বললাম, 'সায়েব সব কথা হয়তো সত্যি। কিন্তু আমাদের মফঃস্বলে চাষারা ধান বেচে সিনেমা দেখতে আসে। শহরের লোকেরা একটু আমোদ-ফূর্তি চায়।'

সায়েব বললে, 'আমাদের দেশেও চায়। কিন্তু লেট্ দেম সি সামথিং ভাইটাল। তাহলেই তারা এ-সব ছাইপাঁশ দেখবে না।'

গদাকাকার স্ত্রী দাওয়ায় বসে গরম ফুলুরি ভাজছিলেন, আমি বললাম, 'কাকীমা, ক্যাশকড়ি যা আছে সব সরিয়ে ফেলুন।'

কাকীমা বললেন, 'কেন রে, জাপানী আসছে ?'

আমি বললাম, 'না কাকীমা, এরা জাপানের ওপর তিনকাঠি।' গদা-কাকাকে আমরা ম্যান বিফোর টাইম বলে জানতাম। সায়েব যে এত ফিউচারের মানুষ, হয়তো ওর এই উনিশশো' বিয়াল্লিশে জন্মাবার, সামনের সাতান্ন সালে গোঁপ গজাবার কথা ছিল। ভুলে আগে জন্মে ফেলেছে, এ-কথা তো কাকীমাকে বলা যায় না। আমি শুধু জিজ্ঞেস করলাম 'গোলোক টকীটা তো আপনার নামে। ওটা ইন্সিওর করা আছে তো ?'

বলে আমি সেই যে ডোমজুড় ছাড়লাম আর ও-মুখো হইনি।'

রাজেনবাবু বললেন, 'এতে ফিলমের কি হল ?'

অনবরত বাগচী বললেন, 'মশায়, সায়ের আর গদাকা' মিলে সে ফিল্ম করেছিল। গদাকা', কাকীমা, ন্যাপলা, খাঁদুমণি, তেলের কল, সজনেগাছ, ঢেঁকিশাল আবার গদাকা', কাকীমা, আবার পুকুর পাড় সজনেগাছ, আবার ঢেঁকিশাল, কাকীমার পুঁটিপিসী, পাড়ার দজ্জাল সখীঠাকরুন, গদাকা' দাঁতন

করছেন, গদাকা' গদা হাতে গোলকদাদুর ছবির সামনে ডনবোঠকী দিচ্ছেন, এমনি করে না কি চোদ্দ হাজার ফিট তোলা হয়েছিল।'

'গান দেওয়া হয়নি ?

'পাইওনীয়ার কি কিছু ভোলে মশায়। খুব তো শুনতে পাই আজকাল সব খোলামেলা উন্মুক্ত হাহা করা গানের হিড়িক। গদাকা' ছোটবেলা থেকে একটা গানই গেয়েছিলেন আর সেই গানটিই ছবিতে লাগিয়েছিলেন। গানটা মেয়েদের সামনে গাইবার মত নয় তবে এখানে আর বলতে দোষ কি ? শব্দগুলো লক্ষ্য করবেন, কি বন্য বর্বর প্রাণশক্তি তার মধ্যে বিজবিজ করছে।'

অনবরত বাগচী চোখবুজে বললেন ঃ

'ওরে হালার পোলার পান
রাত পোহাইলে খাইবা কলা
তোমাগার‍্যা দ্যায় যে পাক কইরা
তার যে হচ্ছে ম্যালেরিয়া।'

বললেন 'ঐ পাক কইরা কথাটার পর একটা দারুণ দুঃখের টান ছিল জানলেন ? শুনলে পরেই বুকের ভেতর বেড়াল আঁচড়াত।'

ভোঁদা এতক্ষণ চোখ গোলগোল করে শুনছিল। এখন বলল 'এ ছবি রিলিজ হয়েছিল ?

'নিশ্চয়। গোলোক টকীতে।'

'তারপর ?'

'প্রথম দু'হাজার ফিটের পর নাকি বড় বড় সব কায়দার শট্ ছিল. আরো কি সব। কিন্তু দু'বার গদাকা'কে দেখবার পরই অডিয়েন্স একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ল কিনা, তাই শেষ পর্যন্ত আর দেখাদেখা হয়নি কারো।'

'ইমোশনাল !'

'তা, গদাবাবুর মুণ্ডু চাই বলে চেয়ার বেঞ্চ ভাঙলে, সিনেমায় তাণ্ডব জুড়লে তাকে ইমোশ্যনাল হওয়া বলব না ? অথচ, এমন নয় যে তোরা টিকেট কেটে দেখতে এয়েছিলি। গদাকা' প্রথম দিন তোদের সবাইকে তো ফ্রি পাসই দিয়েছিলেন, তবু কেউ সে কথা মনে রাখলে ? তা একে যদি আন্তর্জাতিক ছবি বলি তাতে আপনারা আপত্তি করবেন ? এ তো প্রমাণ হয়ে গেছে মশায় যে-ফিলিম দেখে পাবলিক ক্ষেপে যায় সেটাই গিয়ে হয় সোনার হাতী না হয় রুপোর জিরাফ কি না কি নিয়ে আসে। শুধু চেয়ার বেঞ্চ ভাঙা নয়, রামধারীর মতো ঠাণ্ডা মাথা মানুষও ক্ষেপে গিয়ে গদাবাবুকো মার ডালো পাগলা গারদমে বলে কি কম চেঁচিয়েছিল ?

'আপনার কাকার কি হল ?

'কি হল ! কেন, গদাধর মোটর সার্ভিসের নাম শোনেন নি ? ট্রাক, বাস, টেম্পো, কি নেই কাকার !'

'সত্যি ? কি করে হল ?'

'আহা, ছবি হবার পর কাকা প্রাণের ভয়ে সেই যে মিলের ট্রাক চড়ে পিট্টান দিলেন, সে তো পালাতেই থাকলেন। আর উনি পালাতে পালাতে একসময়ে ফুস করে জাপানী বোমার হিড়িক এল। মানুষ যেন তেন প্রকারেণ যে কোন টাকা দিয়ে ট্রাকে না হোক ট্রাকের টায়ার চেপে যেতেও রাজী। পথেই কোন পার্টি ওঁকে কলকাতা থেকে ধানবাদ যাবার জন্যে মাথাপিছু একশো টাকা দিতে চেয়েছিল। ওঁর মাথায় খেলে গেল দিস্ কান বি এ গুড বিজনেস। ব্যস, কালীঘাটে ডালা চড়িয়ে লেগে গেলেন।'

'সেই সায়েব?'

'সে তো এখন বিরাট লোক হে! আমেরিকায় তার নামডাক কি! তবে আমি বলে রাখছি ভোঁদা। এই যে গদাকা'কে তোমরা মোটে পাত্তা দিলে না, এর কারণ হচ্ছে বাঙালী মহা হিংসুটে পেটপটকা জাত। তার ওপর আবার আত্মবিস্মৃত। রবীন্দ্রনাথকে অব্দি ওরা নোবেল পুরস্কার দিলে তবে আমরা তেমনি করে চিনলাম। আমাদের জিনিয়াসদের চেনবার জন্যে আমরা ওরা কবে কি বলবে সেদিকে যে হাঁ করে থাকি এটা কি ভাল?'

'কে বলছে ভাল?'

'তা'লে একটা কিছু কর। গদাকা'কে নিদেনপক্ষে একটা রুপোর টিকটিকি দাও। সায়েবটা কবে পৃথিবীর চলচ্চিত্রে গদাবাবুর দান নিয়ে কেতাব লিখে বসবে তখন তোমারই বলবে আপনার খুড়োর কথাটা আমাকে বলা উচিত ছিল না?'

আমরা চুপ করেই রইলাম। এ হেন পরিস্থিতিতে আমরা আর কিই বা বলতে পারতাম।

৬ ভালবাসা

তিরিশ বছর বাদে কুসুমকে সকলের মনে পড়ল।

মনে পড়বার কথা নয়। এখন যারা থিয়েটার দেখে, অলিগলিতে ক্লাব বানায়, তারা তাঁকে চেনে না। রোজ রোজ নামটা কোন না কোন কারণে চোখের ওপর না থাকলে মহারথীদেরই চিনতে পারে না কুসুম তো কোন্ ছার।

তবু মনে করতে হল।

বিশেষ একটি কারণে। অপেরার অভিনয় প্রসঙ্গে। নাট্যকারের সুবুদ্ধি ছিল না, অথবা ভবিষ্যৎ দৃষ্টিরই অভাব, সর্বসাকুল্যে চার-পাঁচখানা নাটক লিখেই কলম তুলে নিয়েছিলেন। কেন লেখেন নি, কেন এখানে ওখানে উঞ্ছবৃত্তি করে জীবিকা অর্জন করতেন, কেন বছর চারেক হল তাঁর পরিচিত চেহারাটি

রাত দশটার পর বালিগঞ্জের রাস্তায় কেউ দেখে নি তা নিয়ে তাঁর জীবিতকালে কেউ একটি প্রশ্নও শুধোয় নি। অথচ তাঁর প্রধান বন্ধু বললেন, 'ওঃ, ওটা যে ওর কতদিনের অভ্যেস, রাত করে পথ চলতে ভালবাসত।' হাত নেড়ে বললেন, 'নেশা-ই বলতে পার, হ্যাঁ রাত জেগে পথ চলবার নেশা ছিল, পথ চলবার নেশা' বলেই চশমা মুছে তাকালেন। নেশা কথাটা ব্যবহার না করলেও পারতেন। বিশেষ করে সদ্যমৃত বন্ধু সম্পর্কে, যিনি সবাই জানে সব কিছুতেই নেশা খুঁজে পেতেন, আসক্ত হয়ে পড়তেন, নেশাই যাঁকে মারল। গম্ভীর হয়ে বললেন, জীবন-প্রেমিক লোক ছিল. সামান্য সামান্য জিনিসেই আনন্দ খুঁজে নিত।'

তারপর আরো অনেক কথা বললেন। কতদিনের পরিচয়, যৌবনের বন্ধু, একসঙ্গে কল্পনার রোমাঞ্চে বুঁদ হয়ে তারা নাকি পটলডাঙা থেকে দেশবন্ধু পার্ক অবধি হেঁটে যেতেন, ফিরে আসতেন, একজনের মনেই থাকত না কতবার মেসটি পেরিয়ে এলেন, আর একজনের মনে পড়ত না থাকেন মেসোর বাড়ি, রাত নটা বাজলে যে-বাড়ির সদরদরজায় তালাচাবি পড়ে।

এত কথা বললেন, একবারও বললেন না নিজের অবস্থা ফিরবার পর কেন দশ বছরেও বন্ধুকে মনে পড়ে নি। ইদানীং কবে যেন বন্ধু এসেছিলেন। 'ভাই আমার নাটকগুলো কোথাও ধরিয়ে দাও।' ঠিক ইচ্ছের অভাব ছিল না তবু সম্ভব হল না, সম্ভব হয় না, ভুলে যাওয়াটাই নিয়ম। তবে হ্যাঁ, এই সেদিনও বলেছেন, 'দেখ দেখি' কোনদিনই কি বৈষয়িক বুদ্ধি হল? আচ্ছা আর কিছু না করিস, এখন তো তোর সুবিধে কত। একটু ধরাধরি করলেই...তোমার রেকর্ড কিছু খারাপ ছিল না!'

বলছিলেন নাট্যকারের জামাইকে। বলতে বলতে মনে হচ্ছিল, সত্যি বয়েস হবার সুবিধেই আলাদা। এ বয়েসের যে লোক যৌবনে কিছু না কিছু করতে চেষ্টা করেছে, সেই কোন না কোন ভাবে দিকপালদের সংস্পর্শে এসেছে। তার ফলে আজ তারা অপরিহার্য। সব জানত সে, তবু কিছু করেন না। যখন কোন আশু পুরস্কারের আশা ছিল না, তখন সে একা হাতে কত কষ্টই না করেছে। একা কাগজ চালাত, নাটক লিখল, বই ছাপাল, দেশে সে-দিন কি হই-হই। অথচ যেদিন সত্যিই মর্যাদা পাবার দিন এল সে আস্তে আস্তে সরে গেল পেছনে।

'কেন বলতে পার?' তিনি নাট্যকারের জামাইকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

ভ্রূকুটি করে লোকটি বলেছিল, 'আমায় কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। দশ জনের উপরোধে বিয়ে করেছিলাম, বউ ছেলে নিয়ে সংসার করি, বাস! শ্বশুরের পরিচয় অবধি দিই নে কোথাও। বাড়িতেও বারণ করা আছে, কেউ নামটাম করে না।'

তার পরই অবশ্যি নিজের প্রয়োজনের কথাটি ফেঁদে বসে। বলে, লীলা বলে দিল, তুমি ওঁর কাছে যাও, বাবার পরিচয় দিলে নির্ঘাত চিনবেন।'

কাজটি করে দিয়েছিলেন। তার মানবচরিত্রের এই আপাত-বিরোধিতা

দেখে কৌতুক বোধ হয়েছিল। শ্বশুরের বন্ধুর কাছে কাজ আদায় করতে আসতে লজ্জা নেই, অথচ শ্বশুরের নাম উচ্চারণ করতে যত সঙ্কোচ।

তিনি নিজেও কি কোথায় একটা সঙ্কোচ অনুভব করেন নি? বন্ধু যতদিন বেঁচে ছিল ততদিনই কি ইতস্তত করে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যান নি?

ঐ কুসুমের জন্যে।

শেষ সাক্ষাৎকারটি অবশ্য মনোরম হয় নি। রাতের অন্ধকারে চাদর মুড়ি দিয়ে বন্ধু এসেছিলেন প্রয়োজনে। বিনা বাক্যব্যয়ে তিনি টাকা বের করে দেন। হাত জোড় করে আর কিছু করতে পারছেন। না বলে ক্ষমা চান।

নোট কটি তুলে নেন নি বন্ধু। কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় বলেন, 'শুনেছি লীলার স্বামী তোমার কাছে এসেছিল।'

'তুমি তো জান লীলার কত ইচ্ছে তুমি ওর কাছে গিয়ে থাক।'

'কেন তা জানি।' আরো মৃদু হয়ে গিয়েছিল ও'র গলা। ছোট একটি নিঃশ্বাসের মত। সন্ধ্যার দেবদারু পাতার মত নম্র ও নরম, নুয়েপড়া দৃষ্টি উনি জানালার দিকে তুলে ধরেছিলেন।

তারপর সেই ধূসর ঝিমন্ত দৃষ্টির পর্দা তুলে অনেকদিন আগেকার চেনা মানুষটি মুখ বাড়াল। বললেন, 'কেন? যা ছিল সবই তো ওরাই নিয়েছিল। এ বাড়িটা আমি ওদের দেব না।

'আহা, মেয়ের ওপর রাগ করছ কেন, সে তখন ছোট ছিল।'

'রাগ।' নাট্যকার হেসেছিলেন। হাসিটি দেখে অস্বস্তি হয়। ও হাসির মানে বুঝতে পারেন নি তিনি। নাট্যকার বলেন, 'রাগ আমি করি নি। তবু তো জান, কোনদিন খোঁজ নেয় নি, বিয়ে দিল মেয়ের, তবু লীলার মা খবর দেয় নি একটা, এখন মেয়ে-জামাইও আমার নাম করতে লজ্জা পায়।'

নিরুত্তর বন্ধুর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, 'বলে দিও কুসুম যতদিন আছে ও বাড়ি ওর।' শুধু নিয়েই গেলাম ওর কাছ থেকে দিতে কিছুই পারি নি।'

উঠে পড়ছেন দেখে গভীর স্বস্তিতে ইনি বলে ফেলেন, 'কুসুম ভাল আছে?'

'আছে। তোমার কথা বলে। তোমার কাছে আসব শুনে ওর কি আনন্দ। দেখো, উনি তোমায় ফেরাবেন না, বারবার বলে দিল। আসলে দিনকাল পালটে গেছে বোঝে না, ও ভাবে এখনো তুমি সেই তুমিই আছ, একসঙ্গে আমি আর তুমি কতই তো গিয়েছি ওর কাছে?'

আর কিছ না বলে নাট্যকার বেরিয়ে যান। সে কথাটি মনে পড়লে এখনো এ'র অস্বস্তি হয়। শুধু কি গেছেন কুসুমের কাছে? টাকা নিয়েছেন, ওখানে খেয়েছেন, বৈঠকখানায় ঘুমিয়েছেন কত রাত। মাঝখানে নাট্যকার ছিলেন বলেই না? নইলে তখন কুসুমের কাছে সরাসরি যান সাধ্য কি তাঁর? ওর তখন কত নামডাক, এ'র তখন কোন পরিচয়ই নেই।

সব উপকার ভুলে বন্ধুকে সেদিন ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। কুসুমের জন্য

একটা সরকারী বৃত্তির চেষ্টা অবধি করতে পারেননি। আজ মনে হচ্ছে কিছু একটা করতে পারবেন তার জন্যে।

'নাট্যকারের নাটক একটা নামিয়ে দাও না, এক সময় তো খুব চলেছিল।'

এখানেই তো মুশকিল। যাঁরা এসেছেন তাঁরা ফেলনা লোক নন। নাট্যকারের স্মৃতিতে নাটক অভিনয় করাতে চান, অনেক টাকা খরচ করে করাবেন, যত টাকা খরচ করে করাবেন,যত টাকা উঠবে সবই তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে ব্যায় হবে, কিন্তু নাটক কোথায়। মাত্র চার-পাঁচটি নাটক লিখেছিলেন, তা সর্বত্র হচ্ছে।

গোলমুখ, ছাঁটা চুল, রঙীন শার্ট ও সরু ঠ্যাঙের প্যান্ট পরিহিত যুবকটি এতক্ষণ ঊর্ধ্ব পানে চেয়ে ধোঁওয়া ছাড়ছিল, চেহারা দেখে এবং কথা শুনে তাকে দুর্ধর্ষ গুন্ডা, চোর অথবা পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা মনে হওয়া স্বাভাবিক, যদিও, আশ্চর্যের বিষয় তার মোটা মোটা গাঁটের চামড়া ফাটা আঙুলগুলো অতীত সুকুমার একটি কলা-চর্চায় নিয়োজিত থাকে। সে ভারী খসখসে গলায় বলল আমরা ওঁর অপেরাটা করব।'

'গান গাইবে কে?'

একজন এ প্রশ্ন করতেই নাট্যকারের বন্ধু হারানো কি যেন খুঁজে পেলেন 'শেফালীর কাছে যাও।'

'শেফালী?'

'কুসুম—কুসুম বললে চিনবে তো?'

সবাই এ-ওর দিকে চাইল। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক, কাঁধে চাদর, মুখের চেহারা অপ্রসন্ন, ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তিনি আসবেন কেন? তা ছাড়া তাঁর কাছে এখন যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'আহা আমি না হয় যাব তোমাদের সঙ্গে। আচ্ছা, নিজে না-ই গেলাম, চিঠি লিখে দিচ্ছি। রাজী হবে, নিশ্চয় রাজী হবে, ও অপেরায় তো সে-ই গাইত, আস্তে আস্তে নামই হয়ে গেল কুসুম। শেষ অবধি কুসুম নামেই রেকর্ড করল কতগুলো।'

যুবকটি বলল, 'তা একরকম মন্দ হবে না। অন্তত পাবলিসিটি হবে খুব। ওঁর স্মৃতিসভার নাটক, ইনি গাইবেন...এখনো গাইতে পারেন তো?'

'খুব খুব। প্রোগ্রাম পায় না, নিজেরও অভিমান আছে, নিজে থেকে যেচে কারুকে বলতে যাবে না। কিন্তু আমি বলছি তোমাদের, অমন গলা আজকাল শোনা যায় না।'

চিঠি লিখে দিলেন। ওরা চলে যাবার সময়ে উৎসাহভরে দরজা ছেড়ে গেট অবধি এগিয়ে গেলেন। বললেন, 'আমিও যাব।'

'হ্যাঁ, আপনিই তো প্রেসিডেণ্ট।

এক মুখ হাসি নিয়ে হাত দুটি নমস্কারের ভঙ্গীতে তুলে গৃহকর্তা দাঁড়িয়ে থাকলেন, ওরা চলে গেল।

কুসুমের প্রথমটা ভারী অবাক লেগেছিল।

চোখে জল ভরে এসেছিল, নাট্যকারের ছবির দিকে চেয়ে মনে মনে বলেছিলেন, 'এই তো ওরা এসেছে। তোমাকেও ভোলে নি, আমাকেও মনে রেখেছে।'

দাসীকে বললেন, 'যত্ন করে বসা, চা খাবেন না কি জিজ্ঞেস কর্।'

রুক্ষ চুল হাত ফিরিয়ে জড়িয়ে নিতে নিতে বিব্রত হয়ে ভাবছিলেন কি কাপড় পরবেন, পায়ে চটি দেবেন কিনা। আজ এগারো দিন ধরে তাঁর শোকে যত কাঁদতে চেয়েছেন, সব চোখের জল আঘাত পেয়ে বুকের নীচে পাথর হয়ে উঠেছে। শোকে বিমূঢ় হয়েছিলেন, ফুল দিয়ে সাজিয়ে এসেন্স ঢেলে দিতে দিতে বলেছিলেন, 'আর একটু রাখুন, আর একটু দেখে নিই।' হঠাৎ শুনলেন একজন বলছে, 'তাড়াতাড়ি করতে হবে, শ্মশানে মেয়ে অপেক্ষা করছেন।' অতর্কিতে যেন থাপ্পড় মারল কে মুখে। মেয়ে! অপেক্ষা করছে? কই এই তিরিশ বছরের মধ্যে তো একদিনও মেয়ে দেখতে আসে নি। শেষের চার বছর কি ভাবে কাটিয়েছেন তা কুসুমই জানেন। এত শুভানুধ্যায়ী কোথায় ছিল? বন্ধুবান্ধবরা ফুলের মালা নিয়ে আসছেন। ঐ মালাগুলোর অনেক দাম। এর একটা মালার দামে ওঁর একদিনের ওষুধ-পথ্য হত। চার বছর পড়েছিলেন। কেমন করে দিন চলেছে তা তিনি জানতেন, কুসুম জানেন আর ঐ দাসী জানে।

ঘরের চারপাশে চাইলেন। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়ে সাজানো ঘর, ওখানে ছিল বড় বড় আলমারি, আয়নাটেবিল, গ্রামোফোন রাখবার ক্যাবিনেট। সব একটি একটি করে বিদায় দিতে হয়েছে। বাড়ির ওপাশটা থেকে ভাড়া পাওয়া গেছে এই যা, নইলে চলত না। শেষে বেনারসী শাড়ী, গয়না, কি আর রাখতে পারলেন? কে তার খবর রাখে? ওরা তাঁর চোখের সামনে দিয়ে দেহ নিয়ে চলে গেল, বুকের আগুনে পুড়তে পুড়তে দাঁড়িয়ে দেখলেন। দাসী বলেছিল, 'মা, তুমি যাবে না?' বলেছিলেন, 'না।' ভাবতে চেষ্টা করেছিলেন ওটা তো আর কিছু নয়, দেহ মাত্র। পরিত্যক্ত আবরণ। মানুষটিকে তো তিনিই পেয়েছিলেন, তিরিশ বছর ধরে তিনি কুসুমেরই ছিলেন। তখন কোথায় ছিল বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী, মেয়ে-জামাই? আজ একমুহূর্তে কুসুমের সব অধিকার, সব দাবি অস্বীকার করে নিয়ে গেল যখন, তখন নিয়ে যাক।

ওদেরই সামনে শোক করেছেন বলে নিজেকে ধিক্কার দিলেন। শ্মশানে গিয়ে আর নতুন করে অপমান ডেকে আনলেন না। কে জানে, মেয়ে যদি অপমান করেই বসে?

অথচ, কুসুমের ভগবান জানেন, কুসুম ওকে কোনদিন পর মনে করে নি। চেনা পরিচিত লোকের কাছ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিয়েছেন, দুজনে বসে আলাপ করেছেন লীলা কত বড় হল, কেমন বিয়ে হল, সুখে আছে কিনা।

বাপকে সান্ত্বনা দিয়ে কুসুমই বলেছেন, 'কম চেষ্টা তো কর নি, ও যখন তোমাকে চিনল না তখন দুঃখ পেয়ে লাভ কি বল !' উনি হেসে বলেছেন, 'কে দুঃখ করছে কুসুম ?'

শ্মশানে গেলেন না। তা নিয়ে কত কথাই না সবাই বলল, কুসুম নির্মম, মনপ্রাণ নেই, কে বলবে এতদিনের সম্পর্ক। এদিকে লোকের কথা, ওদিকে শুনতে পান লীলাই এখানে সেখানে বাপের সম্পর্কে বড়বড় কথা বলছে। পুড়ে যায়, বুকের ভেতরটা পুড়ে যায়। এ অবিচারের প্রতিকার কার কাছে খুঁজবেন ? কুসুমের চেয়ে তাঁর কথা জোরগলায় বলবার অধিকার আজ সকলের আছে ? কে কলেজে একসঙ্গে পড়েছিল, কে ওঁর সঙ্গে একবার বেড়াতে গিয়েছিল বেনারস, এমন কি যে মেয়ের বয়স মাত্র দুই কি তিন ছিল, সে-ও সভাসমিতিতে বসে জোর গলায় কত স্মৃতি কথা-বলে এল।

অপমান, মর্মপীড়া। অথচ কুসুম জানেন, বিধবার সব আচারনিয়ম পালন করেছেন তিনি, কোন নিয়ম থেকে বিচ্যুত হন নি। শুধু চোখ দিয়ে জল বেরুল না। দাসী বলে, তাঁর চোখের জল নাকি শোকের আগুনে পুড়ে গেছে। তাই হবে।

কিন্তু ঐ তো ওরা এসেছে !

সাদা ঢাকাই পরলেন, ছেঁড়াটা ঢেকে নিলেন আঁচল টেনে, মুখটা ঘষে নিলেন গামছা দিয়ে, এ অবস্থায় পায়ে দেবেন এমন একটি কাপড়ের চটি নেই, মাথার কাপড় টেনে নীচে নেমে গেলেন।

নাট্যকারের নাম করে তাঁর কাছে এসেছে এতেই মনটা ভিজে ছলছল করছিল, বন্ধুর চিঠিখানা পড়তে পড়তে অভিভূত হয়ে পড়লেন। চোখ জ্বালা করল, চিকচিক করে উঠল। মনটা নানা ভাবের ঢেউ-এ ভাসছিল, ডুবছিল, তাই কুসুমের খেয়াল হয় নি সবাই গভীর কৌতূহলে তাঁকে দেখছে। বললেন, 'আজকাল তো এ অপেরা কেউ করে না ?'

একটি মৃদু, নম্র, ক্লান্ত কণ্ঠ মনে পড়ল। সকালে, বিকেলে, মাঝেমাঝে কুসুমকে কতবার বলতেন, 'কই কুসুম, কেউ তো আসে না। আসলে আমাকে সবাই ভুলে গেছে, তাই না ?' 'তা কখনো হয় ? আসবে, সবাই আসবে।' বলে বলে কুসুমকে সান্ত্বনা দিতে হয়েছে কত। কাগজে যখন দেখতেন এটা ওটা সেটা, এ, ও, সে-র নাম বেরুচ্ছে, তখনই কাগজটি নামিয়ে রেখে হাত দিয়ে চোখ ঢেকে বসে থাকতেন। হাতের সে ভঙ্গীটি মনে পড়লে বুকের ভেতরটা পুড়ে যায়। কুসুম শেষ অবধি কাগজ নেওয়া বন্ধ করে দেন। চোখে জল ভরে এল, জল শুকোল, ঠোঁটটা কামড়ে ধরে নিজেকে সামলালেন, চোখ তুলে চাইলেন। কি চমৎকার লোক এরা, কি সুন্দর মন-প্রাণ, কিন্তু সেদিন কেন আসে নি ? সেদিন যদি এই হই-চই-এর এতটুকু ধাক্কাও এ-বাড়ির দোতলার ঘরে উঠে আসত, মানুষটিকে জানতে দিত কেউ তাঁকে ভোলে নি, তা হলে শেষজীবনে একটু শান্তি, একটু আনন্দ পেয়ে যেতেন।

যুবকটি বলল, 'আপনি গাইতে পারবেন তো?'

ঘাড় কাত করলেন কুসুম।

চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কেমন করে এদের বলবেন একটি গানও তিনি ভোলেন নি, কত সন্ধ্যে, কত সকালে গেয়ে গেয়ে শুনিয়েছেন তাকে। এই অপেরা দিয়েই তাঁদের দুজনের পরিচয়। কুসুমের তখন খুব নামডাক। যে গান একবার গান, তা পথেঘাটে ফিরতে থাকে, তাঁর নামে শাড়ী বেরোয়, সেই সময়ে থিয়েটারের মালিকের সঙ্গে জেদাজেদি করে কুসুম অপেরায় নামলেন।

তাও তো প্রথম নায়িকা নন, দ্বিতীয় নায়িকা। গান গেয়ে ঢুকতেন, গান গেয়ে নায়ক-নায়িকাকে বিদায় জানিয়ে চলে যেতেন শেষ দৃশ্যে। তিনি বেরিয়ে যাবার পর আর কেউ চোখ তুলে দেখতে চাইত না। কি বড়বড় নামজাদা লোকরা ফুল পাঠাতেন, ধন্য ধন্য করতেন। তারপর একদিন নাট্যকার এলেন গ্রীণরুমে। কুসুমের আলাদা সাজঘর ছিল। সে-ঘরে ঢুকলেন মালিকের সঙ্গে। চোখের চাহনিতে যেন কি ছিল।

ঐ গান গেয়ে নিজের নাম ভুলে কুসুম হলেন, আজ গাইতে পারবেন না?

'পারব।'

যুবকটি বলেল, 'তা ছাড়াও দু-চারটি কথা বলতে হবে আপনাকে।'

'বলব বলেই তো বসে আছি।' খুব সাজানো, আগবাড়িয়ে আদিখ্যেতা করতে যাওয়ার মত শোনাল কথাগুলো, কুসুম তা বুঝলেন না। ওরা বিদায় নিল। পর্দা তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন কুসুম। আছেন, ভগবান আছেন। টেবিলে দাঁড়িয়ে কাগজগুলো দেখলেন। এ কদিন ধরে যে কাগজে যে খবরটি বেরোয় সেটি-ই যোগাড় করে রাখেন। সবাই কত কথা বলে, শুধু কুসুমের নাম কেউ বলে না। যেন কুসুমকে বাদ দিয়ে ওঁর কোন অস্তিত্ব ছিল! কিন্তু এখন আর ক্ষোভ কি? এই তো আবার তাঁর ছবি সবাই দেখবে, তাঁর বাঁধা গান সবাই শুনবে, সকলের চোখের সামনে তাঁর কুসুম গান গাইবেন, এ-ও কম শান্তির কথা নয়।

দোর বন্ধ করে ওপরে উঠে এলেন। মনেই পড়ল না টাকার কত দরকার, বেচবার মত আর একটি জিনিসও ঘরে নেই। চার বছর রোগে ভুগেছিলেন, ওপাশের ঘরে ওষুধের খালি শিশি, তুলো, রুগীর বিছানা-কাপড়, হাবিজাবি সাতসতেরোতে আবর্জনার স্তূপ হয়ে আছে, আশ্চর্য, মানুষটা চোখ বুজতেই যেন ও-গুলো পরিষ্কার করবার উদ্যমও গেল হারিয়ে। তা ছাড়াও কত কাজ বাকি, সব ঘর থেকে জিনিসপত্তর গুটিয়ে এনে একটি ঘরে জড়ো করতে হবে, ভাড়া বসাতে হবে ঘরগুলোয়, নইলে সংসার চলবে না, এখন তা ও মনে পড়ল না।

তাড়াতাড়ি দেরাজ খুলে হাতড়াতে থাকলেন। আছে, সব আছে। থিয়েটারের পোষাক কোনদিন অঙ্গে তোলেন নি। নিজেই শাড়ীজামা নিয়ে

যেতেন। পিজবোর্ডের বাক্স থেকে শাড়ী নিয়ে গায়ে ফেললেন। আয়নার দিকে চাইলেন। রঙ আছে, গড়ন আছে, মাথায় চুল আছে, কিন্তু মুখে

মেচেতা, চোখের নীচে কালি, নাকের পাশে বয়সের রেখা?

নিশ্বাস ফেললেন। যিনি কুসুমের সুখ দেখতে এত ভালবাসতেন তাঁর সেবা করে করেই শরীরপাত হয়েছে। তা হোক। পুরু করে রং মেখে নিলে স্টেজে আর কিছু চোখে পড়বে না। ন্যাপথলিন ও কর্পূরের গন্ধ ফিকে হয়ে যাওয়া কাপড়ের ভাঁজ তুলে সিল্কের খাপে মোড়া গানের খাতা বের করে নিলেন।

দাসী দোরের কাছে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়েছিল। বলল, 'এই যেন গড়িয়ে কি নিয়ে বসছ মা? শুধু এবেলা তো দুটি ভাত খাও, ও-বেলার পাট তুলে দিয়েছ, তা সময়ে না খেলে শরীর টেঁকে?'

এতটুকু মমতার কথা শুনেই কুসুমের কণ্ঠ হল। কাপড় ছাড়বার জন্যে আলনা থেকে কাচা কাপড় নিলেন।

'আর ভেবে কি করবে মা? মনের দুঃখ এখন সঙ্গের সাথী হয়ে রইল, কপাল পুড়লে ঐ তো সম্বল।'

শুনতে শুনতে কুসুমের মনের পাত্র যেন ভবে ভরে উঠল। কাপড় বদলে হাতে করে নিয়ে দেখলেন ঢাকাইখানা। ছেঁড়াটুকু রিপু করিয়ে আনতে হবে, নইলে সেদিন পরে যাবেন কি? মনে মনে গর্ব হল, শেষ সময় অবধি ওঁকে জানতে দেন নি ঘর-সংসারের অবস্থা কোথায় এসে পৌঁছিয়েছে। ধবধবে শাড়ী পরে ওঁর সামনে যেতেন, যেমন করে হোক ফুল কিনে ওঁর ঘরে রাখতেন, ভাত না খেয়ে পানের রসে ঠোঁট লাল করে ওঁর পাশে বসে মিছে কথাও কইতে হয়েছে। ভালই হয়েছে এই সময়ে গেলেন। আর দেরি হলে বড় বিশ্রী হত। ভরাডুবি থেকে বাঁচানো যেত না কিছুই।

'এস মা!' দাসীর ক্লান্ত গলা।

'যাই!' সাড়া দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে কুসুম ওঁর ছবিটা দেখলেন। অভ্যাস বশতঃ মাথায় কাপড় টানলেন। দরজার বাইরে পা রেখে ভাবলেন সেদিন মস্ত একটা তোড়া কিনে এনে সাজাব। হয়তো ওরাও সঙ্গে কিছু ফুল দিয়ে দিবে। ফুল, শুধু কেন, সব সুন্দর ও শৌখিন জিনিসেই বড় রুচি ছিল। জানলার ফুল, ধুপদানিতে ধুপ, টেবিলে নতুন নতুন বই, কুসুমের পরনের কাপড় ধবধবে—সব একেবারে ঠিক থাকা চাই, অনুষ্ঠানে ত্রুটি থাকলে চলবে না। নিভাঁজ মটমটে জামাকাপড় পরতে নিজেও কত ভালবাসতেন।

ছবির কাচটা আঁচলে মুছে দিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

রাত নটা।

সাজঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে ভিজে তোয়ালে দিয়ে ঘনঘন ঘাড়, মুখ মুছছিলেন কুসুম। হাত দুটি মালার ভারে কতক্ষণ টনটন করেছে, মনে হচ্ছে

খসে পড়ে-যাবে। ছোটবেলা রাসের মেলা থেকে মাটির ইলিশ মাছ, রূপোলি ভেড়া কিনে ঘরের দেওয়ালে সুতো বেঁধে টাঙাতেন। কিছুদিন বাদেই মাটিতে নোনা লেগে আপনা থেকেই মাছ খসে পড়ে গিয়েছিল।

গা জ্বলে যাচ্ছে এদের বিশ্বাস করে এসেছিলেন বলে। লোকজন তো কম আসে নি, তাঁর বন্ধুবান্ধব। কেউ বাকি ছিল না। সবাই বড় গলা করে শুধু নিজের কথাই বলল, এই তো কুসুমও একপাশেই বসেছিলেন, তাঁর নাম কারো মুখে একবারটি এল না। কেউ বলল না যেদিন পরিচয় হয় নি সেদিনও কুসুম অভিনয় করবেন সেই আশাতেই উনি প্রতিটি নাটক লিখেছেন। আর অপেরা! সেও তো কুসুমের জন্যে, কুসুমেরই জন্যে। আজও দেরাজে সযত্নে রাখা আছে চিঠিগুলো। ঐ লোকটি! তার প্রধান বন্ধু! চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে কুসুমের ঠোঁট বেঁকে গেল। একসময়ে তাঁর বৈঠকখানায় পড়ে থাকত, স্টেজে অভিনয় দেখে বড় বড় কবিতা লিখত তাঁর নামে।

কি চিপটেন কেটেই না বন্ধুর সঙ্গে নিজের সম্পর্কের কথা বলছিল, সম্পর্ক! কারো সঙ্গে সম্পর্ক ছিল না তাঁর, বেঁচে থাকতে খোঁজ নেয় নি কেউ, সম্পর্ক ছিল একজনের সঙ্গে, তা সভায় বসে বলবার সাহস নেই তোমাদের।

তাঁকে কেউ একটা কথাও বলতে বলে নি, অমন করে যে গান গাইলেন, ঘনঘন হাততালি পড়ল ঐ পর্যন্ত। গান গেয়ে হাততালি নিতেই শুধু এসে-ছিলেন নাকি কুসুম?

বেরিয়ে এলেন সাজঘর থেকে, কি ফুল, রাশিরাশি পদ্ম, গোলাপ, রজনী-গন্ধা। শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন। না, তাঁর সঙ্গে দেখা করবে বলে কেউ দাঁড়িয়ে নেই, সবাই চলে গেছে। নিশ্বাস পড়ল অজান্তে। কি ক্লান্তি, বয়সের ভার, সমাজ সংসার মিছে করে সব ভুলে থাকলে কি হবে, পাওনা শাস্তিটি এতদিন বাদে পেলেন। বুঝিয়ে দিল সবাই তাঁর নাম নিয়ে সকলের সব বলবার অধিকার আছে, শুধু কুসুম বাদে।

সেই যুবকটি এবং আরো দু-এক জন উদ্যোক্তা নীচে দাঁড়িয়ে। যুবকটি হাসছে কি যেন বলছে।

'না না, অত মন-প্রাণের বালাই কিছু নেই, যখনই দেখেছি একবার বলতেই রাজী হয়ে গেলেন, তখনই খারাপ লেগেছিল, অথচ ওঁর মেয়ে কিছুতে আসতে রাজী পর্যন্ত হলেন না, আসলে সম্পর্কগুলো কিছুদিন ঠিক থাকে, তার পর সব বেঁকেচুরে যায়, বুঝলেন না? এঁরা হচ্ছেন—।'

প্রত্যেকটি কথা শোনা গেল, এমন কি কুসুমকে দেখে শেষ কথাটি কেটে দেওয়া পর্যন্ত।

অস্বস্তিটুকু মুছে নিতে একজন বললেন, 'তা তোমাদের অনুষ্ঠান ভালই হয়েছে. শুনলাম হাজার তিনেক টাকা উঠেছে।'

যুবকটি টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের ঝকঝকে হাসি মেলে ধরে বলল, 'হ্যাঁ, পাবলিসিটিটা ভাল হয়েছিল।' কুসুমের দিকে চাইল, তার চোখে সুস্পষ্ট

ঘৃণা। যুবকটি তার আগেকার যুগের যা-কিছু সব কিছুকেই গভীর অবিশ্বাস ও অপছন্দ করে। সে এবং তার মত বহুজন আজ বিশ্বাস করে, সেটা ছিল আবেগ ও উল্লাসের যুগ। নাট্যকার ও কুসুমের মত দু-কূল ভাসানো প্রেমের কথাও সে বিশ্বাস করত না, এখন তার দৃষ্টিতে দেখা গেল গভীর ব্যঙ্গ। যেন সে বলে দিচ্ছে, দেখ একা আমিই তোমায় চিনেছিলাম। তা ছাড়া তার চোখের দৃষ্টিতে কি যেন ছিল যা দেখলে সঙ্কোচ বোধ হয়, মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়, কুসুমের বুঝতে বাকি রইল না, আজকের সমস্ত অনুষ্ঠানটিই একটা বিজ্ঞাপন. তিনিও তারই একটা অঙ্গ মাত্র।

বড় গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

স্টেশন ওয়াগন। ওরা তিনজন, তিনি। ওরা তাঁকে বাদ দিয়ে কথা কইতে শুরু করল 'না, হলের ভাড়াটাড়া আজকাল দারুণ বেড়েছে, ফাংশান আর করা যাবে না, তা ছাড়া কল্যাণের ব্যবহারটা দেখলে? যেমন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন তেমন ছোট মন। আশ্চর্য!'

কুসুম একটু সরে নড়ে বসলেন। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে যাচ্ছে। একবেলা হবিষ্যি. এবেলা প্রায়ই হরিমটর। এখন মনে হচ্ছে কি করে ফিরবেন ও বাড়িতে, একঘর শিশিবোতলের জঞ্জাল, ছেঁড়া কাগজের স্তূপ, চোখের সামনে রাস্তায় আলো সরে সরে যাচ্ছে, আজকের রাতটা বাড়ছে মানেই কালকের সকালটা এগিয়ে আসছে, সকাল মানেই ডাক্তারখানার বিল, ফলওয়ালার দেনা, ভাড়াকরা অক্সিজেন দেবার যন্ত্রটা ফেরত দেওয়া হয় নি। তা ছাড়া ধারদেনার কি অন্ত আছে? চারিদিকে অভাব হা-হা করছে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন মাথার শিরগুলো দপদপ দপদপ করছে। ওরা কথা বলেই চলেছে. কান দিয়ে শব্দগুলো ঠকাস ঠকাস করে কে যেন মাথার ভেতরে ছুঁড়ছে। গাড়ির হর্ন শুনে কান চেপে ধরলেন।

আসলে কোন কিছুরই মানে নেই। সব মিথ্যে। এখন ভেতরের সব নাড়ীভুঁড়ি ঘুলিয়ে পাকিয়ে উঠল নাট্যকারের ওপর রাগে, ঘেন্নায়। বেঁচে থেকে কুসুমকে নিঃস্ব করে গেলেন, মরে গিয়ে ফুলের মালা হাততালি কুড়োচ্ছেন। কুসুমের জন্যে কি রইল? বঞ্চনা, শুধু বঞ্চনা।

এরাও ঠকিয়েছে। এদিকে বাড়ি এসে গেল। হঠাৎ, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান ভুলে কুসুম বললেল, 'শুনুন!'

হয়তো বেফাঁস কিছু বলে বসতেন কিন্তু ঘ্যাঁচ করে গাড়ি থামল, দরজা খুলে নেমে যুবকটি ধরেই থাকল, কোনদিকে না তাকিয়ে নামলেন কুসুম।

'আপনার পরিশ্রম হয়েছে অনেক...' বিড়বিড় করে আরো কি যেন বলে তার হাতে একটা খসখসে কাগজ গুঁজে দিল। চেক। ওরা কি বুঝতে পেরে-ছিল ওরা যখন ওঁকে প্রাপ্য সম্মানের ছিটেফোঁটা দিচ্ছে না, উনিও তখন চক্ষুলজ্জা ভুলে পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবেন বলেই মুখ খুলেছিলেন? যদি বুঝতে পেরে থাকে কি লজ্জা কি লজ্জা। অথচ সেটাই তো ওঁর মনের কথা

নয় ? টাকাই কি চেয়েছিলেন কুসুম ? একটু সমবেদনা, একটু শ্রদ্ধা পেলে কি টাকার কথা তাঁর মনে হত একবারও ?

কিন্তু টাকা ছাড়াই বা চলবে কি করে ? চেক খুললেন। চোখের কাছে তুলে ধরলেন। দুটো, মাত্র দুটো সংখ্যার অঙ্ক। অথচ ওদের না কি এত এত টাকা উঠেছে, কি অপমান, কি অপমান !

দরজার সামনে সিঁড়িতে ধপ করে বসে পড়লেন। অন্ধকার গলি, ময়লা কাঁচের ডুম থেকে ঘোলাটে আলো ছাড়ছে ল্যাম্পপোস্ট। মুখে আঁচল চেপে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন, একটা বুড়ো কুকুর ছাড়া কেউ শুনতে পেল না। কেঁদে উঠলেন নিজের জন্যেই, কেননা এইমাত্র কুসুম বুঝতে পেরেছেন এখন তিনি একা, একেবারে একা। বুঝতে পেরেছেন তিরিশ বছরের ভালবাসা সবটা হয়তো সত্যি নয়, আসলে মানুষ নিজেকেই সবচেয়ে ভালবাসে। তাঁকে একা থাকতে হবে, একা থাকবার যন্ত্রণা কি নির্মম, নিজের জন্যে শোক করতে লাগলেন কুসুম। নাট্যকারের মৃত্যুর পর এই প্রথম তাঁর চোখে জল নামল। একবারও তাঁর নাম করলেন না কুসুম, একবিন্দু জল এখন বাজে খরচ করবার নয়।

৭ কবিপত্নী

অন্ধ ও স্থবির কবি সুপ্রভাত দত্তচৌধুরীকে সংবর্ধনা জানাবার কথা ওদের মনেই পড়ত না, নিখিল যদি না বলত। নিখিল বললেও কিছু হত না, যদি না তরুণ সংঘ মানু পালকে গাঁথতে পারত।

জায়গাটি কলোনি।

কলোনি বলতে পঁচিশ বছর আগে অনেক বেড়ার দেয়ালের বাড়ি, খোলার চাল দেখা যেত।

এখন তেমন বাড়ি কমই আছে। যা আছে তাও পাকা বাড়ির দৌরাত্ম্যে চাপা পড়েছে।

সামনে তিনমাথার মোড়। রমরমা জায়গা। দূরদর্শী মানু পালের বাবা সে সময়ে ধানক্ষেত কিনেছিলেন। পরে কাঠা হিসেবে বেচে বেচে লাল হয়ে গেলেন।

ছেলের ওপর ওঁর ভরসা ছিল না। মানু তখনই বলত, টাকা ছাড়ো, ব্যবসা করব।

উনি বলতেন, আমি মরলে যা মন লয় করিস। সকলটি জলে ঢালিস। চারতলা ইমারত তুইলা দিয়া গেলাম। মায়ে ভাড়া হইতেও ভাত পাইব। রাস্তায় সমুখের জমি কই, স্বর্ণমূল্য হইব।

—তাই হয় ?

--দেইখ্যা লইস। আর জামুন্দির পাল বংশের নাম তুমিই ডুবাইবা। তুমিই ইমারতে যা ফলক দিলাম, উয়াতেই থাকব। তুমি কুলাঙ্গার। বেবসা করবা!

পিতা পুত্রের ক্ষমতা বোঝেননি।

উক্ত সমুখের জমিতে মানু দশতলা বাড়ি তুলেছে। ফ্ল্যাট বেচেছে। নিচ-তলায় তার জমজমাট টেলিভিশন ভি. ডি. ও, রেডিও এবং আনুষঙ্গিকের দোকান। নাম 'ডিসকো'।

এলাকায় ও ডিসকো মানু নামেই পরিচিত। এখন ও পিতার চেয়েও লাল, রাজনীতিতে।

এই মানুকেই তরুণ সংঘ গেঁথে ফেলল।

—টাকা তো করেছেন, সংস্কৃতি করুন।

—কেন? যাত্রাউৎসব করাইনি?

—ওতে ইজ্জত হয় না।

—তরুণ সংঘকে পাকা বাড়ি বানিয়ে দিয়েছি। ছিলে তো টালির ঘরে।

—তাও নয়।

—তবে কি ?

—আজকাল বড় বড় কোম্পানি সংস্কৃতি কাজে টাকা ঢালছে।

—আমি কি বড় কোম্পানি?

—কি যে বলেন! আমাদের কাছে আপনিই শিল্পপতি। আপনার উচিত...

—কি?

—গুণীজন সংবর্ধনা, নাট্যোৎসব এসব কাজে মদত দেয়া।

—তাতে ইজ্জত বাড়বে?

—বাড়বে।

—কাগজে নাম বেরোবে?

—নাম, ছবি বিজ্ঞাপন হয়ে যাবে।

—বেশ! তবে করো। গুণীদের মানপত্র দেবে?

—কিছু উপহারও দিতে হয়।

—কত লাগবে?

—কত আর...হাজার পাঁচেক।

সেই থেকে তরুণ সংঘ গুণীজনদের সংবর্ধনা জানাচ্ছে। একজন লেখক, একজন শিল্পী, একজন সংগীতশিল্পী, একজন খেলোয়াড়।

এ বছর নিখিল বলল, বেপাড়ার গুণীজনদের তো অনেকবার ডাকলাম। সবাই আসেনও না।

—পাড়ায় গুণীজন কোথায়?

—আছে। আছে।

—কে?

—আরতি দত্ত ছবি আঁকে, এক্জিবিশান করেছে। দীপক নজরুলগীতি

গায় রেডিওতে, মণ্টা তো বি-টীমে খেলছে।

—লেখক ?

—কেন, অন্ধকবি সুপ্রভাত দত্তচৌধুরী ?

—ধুস ! কেউ নামই জানে না।

—জানে, বুড়োরা জানে। আর দেখ, পাড়ায় আছেন যখন আমাদের কর্তব্য...

—চলো হিমাংশুবাবুর কাছে যাই।

হিমাংশুবাবু অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিক জনৈক বাংলা দৈনিকের। সাহিত্যপাতা দেখতেন ও সমালোচনার জন্যে যে সব বই সংগ্রহ করেন, সে সব বই দিয়ে লাইব্রেরি করেছেন স্বগৃহে।

হিমাংশুবাবু বলেন, সুপ্রভাত দত্তচৌধুরী ! দাঁড়াও, আমার ক্যাটালগটা বের করি। সব নিয়মমতো রাখতে হয় হে। "দন্ত্য স" দেখি।

—দেখুন।

—এই তো ! "উষা ও গোধূলি" (১৯৫১), "চিরবিদায়" (১৯৫৪), "এসো ফিরে এসো" (১৯৫৮), "কবির কবিতা" (১৯৬১)—চারটি বই।

—নাম ছিল ?

—বড় কাগজে তো লেখেনি। রেলে সামান্য কাজ করত, ঘুরত। তা অনেক কাগজে লিখত। মেদিনীপুরে সভা করে ওকে কারা "কবিভারতী" উপাধি দিয়েছিল...আমার কাছে আসত।

—বয়স কত হবে ?

—অনেক।

—আর লেখেননি ?

—অন্ধ হয়ে গেল, রিটায়ার করতে হল। ছেলে ছিল বোধ হয়...

নিখিল বলে, হ্যাঁ হ্যাঁ। বাপের জায়গায় কাজ পায়। থাকে কাঁচরাপাড়া। কোন যোগাযোগ রাখে না। অবস্থা খুবই খারাপ।

—অনেক বড় বড় লেখকের সার্টিফিকেট আছে, আমাকে দেখাত। বলতে নেই, ওর স্ত্রী আসতে থাকলেন যখন, দুঃস্থ লেখকের পেনশানের জন্যে আমি খুব চেষ্টা করি।

—হয়নি ?

—না না, তাই হয় ?

—আমরা তো ভাবছি...

—হ্যাঁ, ওকে সংবর্ধনা দাও। মরেই তো যায় মানুষ। পাড়া থেকে কিছু পাক। ও তোমাদের সংবর্ধনা সভাগুলিতে যেত। স্ত্রী নিয়ে যেত। এখন বোধ হয় আর পারে না।

ছেলেদেরও মনে পড়ে। এক অন্ধ ভদ্রলোক, চোখে কালো চশমা, এক মহিলার হাত ধরে...

নিখিল বলে, বেশী নামকরা লোকরা তো আসতেই চায় না এখানে। আমরা দৌড়ে মরি।∵এবারে চারজনকে একশো করে টাকা দেয়া যায় না?

তপন ভারি গলায় বলে, সেটা বাজেটের ওপর নির্ভর করছে নিখিল।

—বাজেট কত?

—মানু পালের পাঁচ হাজার, প্রেসিডেন্টের পাঁচশো, চাঁদা ধরো হাজার...

—হবে না?

—দেখি।

—সুভেনির তো ছাপবে। বিজ্ঞাপন

—দেখি।

হিমাংশু বলেন, কেন আমরা কলকাতায় দৌড়াব বার বার? কলকাতা-বাসীর কাছে আমরা কলোনিবাসী। আমরা আঞ্চলিক লোকজনকেই...

বেরিয়ে এসে তপন বলে, হিমাংশুবাবুকে সভাপতি করতে হবে। তিনি ছাড়া বুড়োর বিষয়ে বলবে কে? তবে আসতে পারবেন তো?

—তিনি না পারেনে, তাঁর হয়ে তাঁর পরিবার আসবেন, নেবেন। ও আমি দেখব।

এ ভাবেই সব ঠিক হয়। এবং এক রবিবার সকালে প্রস্তুতি কমিটি সুপ্রভাতের বাড়ি যায়।

জীর্ণ, জীর্ণ ঘর। উঠোনে বেড়া দিয়ে ঘেরা। বাঁশের খুঁটোর গায়ে চিঠির বাক্স। তাতে লেখা সুপ্রভাত দত্তচৌধুরী কাব্যভারতী। বাক্সটি দেখে বোঝা যায় যে দীর্ঘকাল ওতে কোনো চিঠি পড়েনি।

কবিপত্নী উঠোনে কাঠের ঘুঁসের গুল দিচ্ছেন। একটি সজনে গাছ। দাওয়ায় রান্নার ব্যবস্থা।

নিখিল বলে, দাদু কোথায়?

—ঘরে।

—দাওয়ায় বসেন না?

—কাজ-কাম সাইরা বাইরে আনি। স্নান করাই। তারপর আবার ঘরে।

—বেরোন না আর?

—না। দেহ তো তায়...

—কানে শোনেন?

—তা শুনে।

—এঁরা এসেছেন।

—পেনশানে গোলমাল হইছে?

—না না। ভালো খবর।

ভালো খবর লইয়া তো কেউ আসে না। কেউ আসেই না। তোমারে যা ধরলে ওষুধ আইনা দাও, কাগজটা পড়তে দাও।

—ছেলে আসে না?

—না বাবা। পূজার সময়ে তিরিশটা টাকা পাঠায়, আর বিজয়াতে একখান চিঠি। আস, ঘরে আস। এট্টু দারান আপনেরা, আমি তারে বসাই চিয়ারে।

এ কাজে কিছু সময় যায়। তপনরা যখন ঢোকে, তখন সুপ্রভাত লুঙ্গি পরে চেয়ারে বসেছেন। চোখে কালো চশমা। চুল সাদা, ছাঁটা। দেহের আড়া এক সময়ে চওড়া ছিল। এখন হ্যাঙারে জামার মতো, হাড়ের কাঠামোতে চামড়া ঝুলছে।

ঘরে কেমন একটা গন্ধ। দীর্ঘকাল রোগী পড়ে থাকলে যেমন গন্ধ বেরোয়। কবিপত্নী ওঁর প্রস্রাবের হাঁড়ি, থুথু‌ফেলা কৌটো বের করে নিয়ে যান।

—নমস্কার। আপনেরা?

—আমরা তরুণ সঙ্ঘ থেকে আসছি।

—অ! তা আপনেরা খুব ভাল ফাংশান করেন। আমি গেছি কয়বার ল্যাখকদের ভাষণ শুনতে। অহন আর ক্ষমতা নাই।

—এবারে আপনাকে আমরা সংবর্ধনা দেব।

—আমারে! সংবর্ধনা ···

সুপ্রভাত যেন কেমন হয়ে যান। দেয়ালে টাঙানো একটি বিবর্ণ মানপত্র। চারটি ফ্রেমে বাঁধানো চারটি কাব্যগ্রন্থের মলাট।

—পাঁচ বছর আগে হইলেও যাইতে পারতাম। অহন বাতের প্রকোপে চলা-ফিরাই দুষ্কর। উনি টাইনা বাইরে লয়, গরমজলে স্নান করায়...

নিখিল বলে, দাদু! আমি নিখিল। চিনছেন?

—চিনেছি।

—আপনি না পারলেও হইব। আপনের প্রতিনিধি হইয়া দিদিমা যাইব।

—সে খুব ভালো, খুব ভালো!

—আমি নিয়া যাইব।

—আইচ্ছা!

ওরা চলে যায়। কবিপত্নী বলেন, এট্টু চা-অ দিতে পারলাম না। মার্জনা করবেন আপনেরা।

—না না, এ কি কথা! বেলাও বেড়েছে।

সুপ্রভাত স্ত্রীকে ডাকেন।

—শুনলা তো কথা!

—শুনলাম।

—আমি ভাবি আমারে অরা ভুইলা গেছে।

—না, আসল তো!

—দেখ! আমার হইয়া সম্বর্ধনা নিতে যাইবা। তা কি ভাষণ দিবা?

—আমার আর ক্ষমতা কি!

—দিও, ভাষণ দিও। সংবর্ধনা দিলে ভাষণ দিতে হয়। পাশকুড়ায়

আমি ভাষণ দিলাম ..তারা মানপত্র দিল...আমার ভাষণ তারা ছাপাছিল।

—আরো কত! মিষ্টান্ন, ধুতিচাদর!

—তুমি তো যাইতেই পারলা না।

...স্বপন তহন দুই মাসের আছিল।

—কমল!

চমকে ওঠেন কবিপত্নী। তাঁর নাম ছিল প্রফুল্লকমল। সুপ্রভাত তাকে "কমল" করে নেন। এখন তো বহুকাল নাম ধরে ডাকেন না। ওগো শুনলা, এ সব বলেই কাজ চলে যায়। এতকাল পরে "কমল"!

—কও।

—আজ আর স্নান করতাম না।

—গাও মোছাইয়া দেই?

—সেই ভালো। আমারে...

—কি?

—সেই বাক্সটা দিবা?

—দিমু। অহন গাও মোছ, খাও, ওষুধ দেই, তারপর নিয্যস দিমু।

—কি রানলা?

—মান বাটছিলাম, ডাইল, আর কি?

—আর কিছু না?

—সজনা ফুল ভাজছি।

—তাই কও।

গা মুছিয়ে, স্বামীকে খেতে দিতে দিতে কবিপত্নীর বুক ফেটে যায়। মাছের নাম ভুলে গেছেন। তিনশো এগারো টাকা পেনশান। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ওষুধ, বছরে দুটো লুঙ্গি, দুটো গামছা, দুটো ফতুয়া, একজোড়া কাপড় নিজের,—কোনটা বাদ দিলে চলে?

নিজের কাপড়-সায়া-জামা কবিপত্নী কিনতে যান স্টেশনে।

যাদবপুর স্টেশান হেঁটেই চলে যান। ওখানে স্টেশনের মুখে পুরনো কাপড়-জামা বেচে মহসীন। পুরনো, হাঁতেফেরতা, জীর্ণ অথচ ফরসা। কবিপত্নীর ওই ভালো।

ডাক্তার তো বলে, ওনাকে পুষ্টিকর খাবার দেবেন।

কি দেবেন? উঠোনে মানগাছ, সময়ে সজনে ডাঁটা ও ফুল। রেশনের ডাল, তেল,—এতেই নাভিশ্বাস।

স্বপন এখন অনেক মাইনে পায়। টি. ভি. কিনেছে। নিখিল দেখে এসেছে। তার বউও চাকরি করে।

ছেলের মুখ আর মনে করতে পারেন না কবিপত্নী। তাঁর ওপর নির্ভরশীল স্বামীর মুখই সব আড়াল করে রেখেছে।

স্বামীর পাতেই খেয়ে নেন উনি। তারপর বাসন মাজো, এঁটো কাড়ো,

থালাবাসন ঘরে তোলো। সব সেরে গালে একটি পান দিয়ে তবে আজ ট্রাঙ্ক খোলেন।

ট্রাঙ্কে আছে বা কি! একটি জীর্ণ গরদ, দুজনের দুটি সুতির চাদর, জয়বাংলা সোয়েটার স্বামীর, একটি রুপোর সিঁদুরকৌটো।

একটি ছোট কাঠের বাক্স।

বাক্সটি স্বামীকে দেন।

—কমল!

—কও।

—একবার পইড়া শোনাও তো!

পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশক অবধি যে সব কবির নাম ছিল, তাঁদের দু'চার লাইনের চিঠি কয়েকটি। বঙ্গভারতী, সাহিত্যসুধা, কুমুদ, পল্লী-তোষিণী, এ সব কাগজে প্রকাশিত সমালোচনার কাটিং।

—শোনাও, শোনাও। এইগুলি শুনলে আমি তোমারে ভাষণ তৈয়ার কইরা দিমু, তুমি বলবা।

—চশমাটা আনি।

খুব মন দিয়ে শোনেন সুপ্রভাত। তারপর বলেন, কাল আমি বলব, তুমি লিখ্যা নিবা। ভাবখানা এমন, য্যান আমিই বলতাছি।

—যা কও!

—দেখ! এই সংবর্ধনার সংবাদ তো কাগজেও বারাইব। দেখাইয়া হিমাংশুবাবু যদি চেষ্টা করে তাহলে দুঃস্থ ল্যাখক বৃত্তি আমি পাইতে পারি। কি বল?

—তুমি যেমন বলবা, তেমন করব।

—তোমার হাতখান দেহি?

ও'র হাতে হাত বোলান সুপ্রভাত।

—হাড় বারাইয়া গেছে। কেমন চাঁপাকলার বর্ণ আছিল, কি নধর গড়ন, স্নান কইরা হাস্য দিয়া যখন চাই তা, কেমন দেখাইত! য্যান্ প্রস্ফুটিত কমল!

—বুড়া হইতাছি না?

—ষাইট কি একটা বয়স? পন্‌রো বছরে বিয়া, ষোল হইতে পোলার মা! আমাদের কপালে পোলাও পরজন। ভালই হইছে, ভগবান চক্ষু নিছে আমার। তোমার এমন চেহারা তো দেখতে হয় না।

—ষাইট কোথা? বাষট্টি।

—বড় কষ্ট পাইলা।

—কুনো কষ্ট নাই গো।

—নাই?

—না। তুমি যে আছ।

দুজনে বসে থাকেন। জীর্ণ ঘরে পড়ন্ত বেলা ঢোকে পশ্চিমের জানলা দিয়ে। ঘরে হলুদ-সোনা আভা।

অনুষ্ঠানের দিন এসে পড়ে।

দিন যে আসছে, তা জানা যায় কয়েকদিন আগে থেকে মাইক ঘোষণায়। উৎসাহী নিখিল রিকশায় বসে ঘোষণা করে করে গলা চিরে ফেলে।

—তরুণ সংঘের গুণীজন সংবর্ধনা ও বার্ষিক অনুষ্ঠান! বন্ধুগণ! আমরা জানাতে পেরে গর্বিত যে এবারে আমরা অঞ্চলের গুণীজনদের সংবর্ধনা জানাব। চিত্রশিল্পী আরতি দত্ত, থুড়ি, অঙ্কন-শিল্পী আরতি দত্ত! নজরুলগীতি-শিল্পী দীপক পুষিলাল। ম'টা···থুড়ি, সুমন্ত চৌধুরী ফুটবল-শিল্পী! প্রখ্যাত কবি সুপ্রভাত দত্তচৌধুরী!

—বাড়তি আকর্ষণঃ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান! লতা মুঙ্গেশকার-কণ্ঠী পামেলা রায় গান শোনাবেন। ধুনুচি নৃত্যে আপনারা দেখবেন রঞ্জু নায়ককে! আবৃত্তি করবেন বেতারশিস্পী শিশির পোদ্দার।

সুপ্রভাত বলেন, অহন কামের ধরনই আলাদা! আমার নাম কি ভাবে প্রচার দিতেছে!

—হ! শুইনাও কান জুরায়।

—দ্যাহ! ভালভাবে সাইজা যাইও। সংবর্ধনা বইলা কথা!

—হ।

একমাত্র নিখিলদের সঙ্গেই একটু যোগাযোগ আছে কবিপত্নীর। সেখানেই যান উনি।

অতীতের কলোনি-জীবন অন্যরকম ছিল, এখন অন্য রকম।

নিখিলদেরও এখন পাকা বাড়ি। নিখিলের মা এখন সুখী সংসারের গৃহিণী। তাঁর কাছেই যান কবিপত্নী। মিথ্যে কথাই বলেন।

—ভাল কাপড় দু'খান লণ্ডিতে দিছি বোন। একখান যদি দিতা!

—লয়েন। ভোটের সময়েও তো দেই।

—হাতে গলায় কি পরুম?

যে কাপড় নেই, তা "লণ্ডিতে দিছি" বলা যায়। যে গহনা বহুকাল নেই, তা'র বেলায় কি বলবেন?

—আমি তো পিতল দিয়া চালাই; বারাইতে সোনা পরে কেডা? আছে, তয়ও পরি না। গলারটা দিতে পারি। হাতেরটা তো হইব না।

—কিনা নিব।

নকল পিতলের বালা একজোড়া কিনতেই হয়। চুল বাঁধতে হয়। গলায় ধার করা হার! পরনে ধার করা কাপড়। পায়ে রবারের চটি।

—ভাষণটা ঠিকভাবে পইড়ো।

—পড়ুম।

—আর...দিনের মতো দিন একটা...খুব গর্বভরে থাকবা।

—নিশ্চয়।

—কোলোনিতে অনেকেই এহন রাজাগজা। কিন্তু টাকায় কি হয়? তাগোরে তো কবি বইলা মান দিব না কেউ।

—না, তাই দেয়?

নিখিল চলে আসে রিকশা নিয়ে। কবিপত্নী স্বামীকে প্রণাম করে ভাষণ লেখা কাগজটি হাতে নিয়ে রিকশায় ওঠেন।

তরুণ সংঘের ভেতরে ও বাইরে প্রচুর ভিড়। লতাকণ্ঠী পামেলার জন্যে সবাই উৎসুক। খেলোয়াড় সুমন্তের সমর্থকরাও সংখ্যায় অনেক।

এত আলো, এত ভিড় দেখে জবুথবু হয়ে যান কবিপত্নী। কতকাল লোক-সমক্ষে আসেন না।

—নিখিল, আমার হাতটা ধরবা?

—এই তো!

মঞ্চে তুলে ওঁকে বসিয়ে দেয় নিখিল। হিমাংশুবাবু আসুন, বসুন, বলার পর উনি একটু সহজ হন। তাকান অন্যদের দিকে।

—আমিই পরিচয় করাই। ইনি কবি সুপ্রভাত দত্তচৌধুরীর স্ত্রী। ইনি স্বামীর হয়ে সংবর্ধনা নেবেন। ইনি আরতি দত্ত, ছবি আঁকেন। ইনি দীপক পুষিলাল, নজরুলগীতি গান। আর ইনি সুমন্ত, খেলোয়াড়।

প্রত্যেকে বয়সে তরুণ। নমস্কার করে। কবিপত্নী অস্ফুটে বলেন, নমস্কার!

বাইরে বেশি লোক, ভেতরে কম।

তপন এসে হিমাংশুবাবুকে বলে, অনুষ্ঠান শুরু করে দিই। এখনকার লোকজন তো! পামেলা আসবে বলে সব ভিড় করে আছে।

—রঞ্জু কোথায়?

—মেকাপ নিচ্ছে।

—শিশির পোদ্দার?

—সামনে বসালাম। সংবর্ধনাটা মিটে গেলে মঞ্চে তুলব, কি বলেন?

—এঁদের পরিচয় কে করাবে?

—অন্যদেরটা আমি বলব। কবির কথা আপনি বলবেন। আমরা তো কিছু জানিই না।

কবিপত্নী ঘামতে থাকেন। স্বামীর বলা ভাষণটি কি ওরা পড়তে দেবে? হিমাংশুবাবু কি পড়ে দেবেন? জিজ্ঞেস করবেন?

—বন্ধুগণ! আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি। উদ্বোধনী সংগীত গাইবেন সংগীত বিতানের সদস্যবৃন্দ।

মঞ্চে কিঞ্চিৎ ঠেলাঠেলি। খুব কঠোর কঠোর মুখ করে একদল ছেলেমেয়ে ঢোকে। গান শুরু হয়।

গান শেষ হলে ওরা চলে যায়।

—হিমাংশুবাবু!

—কি ?

—তিনি একটা ভাষণ বলছিল, আমি লিখ্যা নিছিলাম। আপনে পইড়া দিবেন ?

হিমাংশুবাবু বলেন, দেখি! দিন!

—আমার হাতের ল্যাখা...

হিমাংশু কাগজটি দেখেন, নিঃশ্বাস ফেলেন। তারপর বলেন, এখন রাখুন।

—এবারে আমরা গুণীজনদের সংবর্ধনা দেব। প্রথমেই...এই মিলি! এদিকে এস। প্রথমেই আমরা সংবর্ধনা জানাচ্ছি আরতি দত্তকে...মিলি!

মিলি নামে মেয়েটি আরতি দত্তের হাতে একটি ট্রে দেয়।

—মানপত্রটি পড়ার জন্যে আমরা সভাপতিকে...

হিমাংশু মানপত্র পড়েন। আরতি দত্ত অতঃপর আবেগপূর্ণ গলায় কি যেন বলে। ঘরে হাততালি।

—এবারে আমরা...

কবিপত্নীর মাথা ঝিমঝিম করে। না, এখানে উনি স্বামীর ভাষণ পড়তে পারবেন না।

হঠাৎ শোনেন হিমাংশুবাবুর গলা।

—কবি সুপ্রভাত দত্তচৌধুরীর বিষয়ে সামান্য পরিচিতি আজকের ছেলে-মেয়েদের কাছে দেবার দরকার আছে। ঊষা ও গোধূলি, চিরবিদায়, এসো ফিরে এসো, কবির কবিতা - আজ অনেকে এসব বইয়ের কথা জানেন না। কিন্তু এমন একদিন ছিল যখন...

বাইরে হঠাৎ গর্জন উত্তাল হয়ঃ এসে গেছে! এসে গেছে! ঘর থেকেও কেউ কেউ বেরিয়ে যায়।

—তাঁর কবিতায় ছিল সারল্য, প্রকৃতিপ্রেম, জীবনতৃষ্ণা...

তপন বলে, কাট্ করুন, কাট্ করুন—পামেলা এসে গেছে।

হিমাংশু আরো কিছু বলেন। তারপর একটি মেয়ে প্রায় নাচতে নাচতে এসে একটি ট্রে দেয়। কবিপত্নী দাঁড়িয়ে সেটি নেন। চোখ করকর করে।

হিমাংশু মানপত্রটি পড়েন। বাইরের কোলাহল ঘরে ঢুকছে। বেনারসী পরা একটি মেয়ের পেছনে পেছনে অনেক লোক। কে যেন মাইক সামনে দেয়।

হিমাংশু বলেন, ধন্যবাদই দিন। সৎ কথা শুনবার মেজাজ দর্শক শ্রোতার নেই।

কবিপত্নী কোনমতে বললেন, আমার স্বামীর হইয়া আপনাগো আমি... ধন্যবাদ দিলাম। নমস্কার।

হাততালি পড়ে না কোনো।

তপন বলে, চলুন, চলুন...এঃ, আপনি যে ফেলে দেবেন সব। ভাল করে ধরুন। নিখিল, এনাকে রিকশায় তুলে দে।

নিখিল ট্রে, ফুলের তোড়া, মানপত্র, মিষ্টির বাক্স ধরে। বলে, থাকবেন না ?

—না নিখিল। মাথা ঘুরতাছে।

—থামটা ধরেন। একশো এক টাকা আছে। রিকশায় তুলে দেই।

রিকশায় ওঁকে তুলে দিতে না দিতে সহসা ঘন ঘন করতালি শোনা যায়। বাজনার শব্দ।

—পামেলা মঞ্চে !

নিখিল বোঁ করে ঢুকে যায় ঘরে। কবিপত্নী বলেন, চলো ! চলো বাবা !

স্বামীর ভাষণটি জামায় গোঁজেন, খামটি।

—অরা তো ভাড়া দিল না। একশত এক টাকা বলল ! ওই এক টাকাই দিমু, – অস্ফুটে বলেন।

এতক্ষণে, ঠাণ্ডা বাতাসে যেন মাথার ঝিমঝিমে ভাবটা কাটে। ট্রে-তে কি কি দিয়েছে ? আঁচলে ঢাকা দেন উনি।

ভাষণটি পড়া হল না।

এখন মনে হয়, কেউ হিমাংশুবাবুর কথাই শোনেনি। ওই ভাষণ পড়লে হয়তো হাসত। হয়তো থামতে বলত। সুপ্রভাতকে তো কেউ চেনে না। ওই মেয়েটা গান করবে বলেই ..

লতাকণ্ঠী পামেলার গান আছড়ে পড়ে চারদিকে।

রিকশাওলা বলে, লতারে আনছে ?

—তারাতারি চলো বাবা।

বাড়ির সামনে এসে সব নিয়ে নামা, ভাড়া দেওয়া...অত আলোর পর ঘরের দাওয়ায় লণ্ঠন ও পাশে চেয়ারে স্বামী···কবিপত্নীর চোখে জল আসে।

—আইয়া পরলা ?

—আইলাম।

—ভাষণটা পড়ছিলা ?

—হিমাংশুবাবু তোমার পরিচয় কত যে দিল···ভাষণ...পরলাম···

—মাইনষে কি বলল ?

—হাততালি কি ! হাততালির শব্দে কান য্যান ··

—সইত্য কও ?

—নিচ্চয়।

—তুমি কানতাছ ?

—গৌরবের দিন একটা...আনন্দের দিন ·· চক্ষে জল আসে গো ! এই দেখ হাতে ধর। টেনলেসের থাল দিছে, মানপত্র দিছে, এত বরো সন্দেশের বাক্স—একশত এক টাকা—ফুলের তোরা. সকলডি দামী জিনিস গো...

—মানপত্রে কি লেখছে ?

—পড়ি।

কবিপত্নী পড়তে থাকেন। পড়তে পড়তে, ভাল ভাল কথা পড়তে পড়তে,

ওঁর ভেতরটা উথালপাতাল করে। ফলে মুখ ডুবিয়ে সুপ্রভাত শোনেন। মুখে বিজয়দীপ্ত হাসি।

—দেখ! ল্যাখতে তো হইল, আপনেরে সম্মান দিয়া আমরাই সম্মানিত হইলাম! ইস্ কত বিশেষণে সাজাইছে তাই কও!

কবিপত্নীর চোখ দিয়ে জল পড়ে। উনি মানপত্র পড়ে যান।

থেমে থেমে, আস্তে আস্তে। নইলে সুপ্রভাত ঠিকমতো বুঝতে পারবেন না।

সুপ্রভাত স্ত্রীকে দেখতে পান না। আনন্দে, পূর্ণতার বোধে দুলতে থাকেন। বলেন, এমুন দিন একটা! আমি গেলে হয়তো অটোগ্রাফই চাইয়া বসত। তহন আমি কি করতাম?

এই প্রথম, স্বামীর অন্ধত্বের জন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করেন কবিপত্নী। চোখ থাকলে তো উনিই যেতেন। দেখতেন সব।

বড্ড অপমানিত হতেন।

কবিপত্নী বলেন, এইবার হকলডি তুইলা থুই, কেমুন! তোমারে ঘরে লই।

—হ। মশা খাইয়া ফালাইছে একেরে।

লতার গলায় পামেলার গান এখানেও আসছে। সযত্নে স্বামীর হাত ধরে ওঠান কবিপত্নী। বর্তমান সময়কে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করেন।

—হকল উঠাও আগে।

— উঠাই।

—ভাষণডা।

—চাইয়া নিল অরা।...বুঝি ছাপব অদের কাগজে...খুব ভাল ভাষণ তো!...কত কি লিখছিলা ..

কবিপত্নী ডুকরে কেঁদে ওঠেন। সুপ্রভাত ওঁর মাথায় হাত বোলান। স্বামী সগর্ব স্বীকৃতি পাবার আবেগে স্ত্রী কাঁদছেন নিশ্চয়।

—কাইন্দ না, কাইন্দ না।

কবিপত্নী মাথা নাড়েন, থামতে পারেন না।

৮ ময়না রায়

দেশে থাকবার সময়ে মনোমোহন রায়কে আড়ালে সবাই একটা জঘন্য নামে ডাকত। বলত—ময়না রায়।

ময়না কথাটা নাম হিসেবে ধরলে তেমন মন্দ কিছু নয়, কিন্তু দেশে নামটির একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল। একটি বিশেষ শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের রক্ষিত পুরুষদের ময়না বলা হত। সব সময়ে যে তরুণ ও যুবকরাই ময়না হয়ে থাকত তা নয়, প্রৌঢ় ও বয়স্ক পুরুষরাও ক্কচিৎ-কদাচিৎ ময়নাবৃত্তি অবলম্বন করতেন।

অসময়ে ওদের কাছ থেকে টাকা নিতেন। যেসব গয়না-টয়না দিয়েছেন তার দু'একখানা ফেরত চাইতেন। ওরাও কিছু মনে করত না। ওরা জানত খাঁচার ময়না-টিয়াকে যেমন দানা-ছাতু জল দিয়ে বাঁচাতে হয়, এদেরও সময়ে তেমনি করেই বাঁচাতে হয়। সে দেশ ছিল পদ্মা-যমুনা দুটি নদীর মাঝামাঝি। ঐ সব নদীর মতই রাক্ষুসে ভালবাসা ছিল ঘাটের মেয়েদের। ওরা স্টীমারঘাটের কাছাকাছি থাকত। যাকে ভালবাসত তার জন্যে ওরা মরতে পর্যন্ত পারত। মানুষের শরীর একবারই মরে, ওরা টাকাপয়সা-আশ্রয় সব খুইয়ে তিলে তিলে অনেকবার মরতে পারত।

যখন ভালবাসত তখন। অন্যসময়ে, ইলিশের মরসুমে কর্তারা কয়েকটি মাছ হাতে নিয়ে যখন হাঁক দিতেন—ও চারু, ঘরে আছ নাকি ?

জবাব পেতেন—মাছ নিয়্যা ঘরে যান ঠাইরকর্তা। ঠাইরেনদিদি বস্যা আছে।

কর্তার হয়তো কিছু টাকার আশু প্রয়োজন। তাই অপমান হজম করে বলতেন—অ চারু, একবার আস্যা দ্যাখ্‌!

শুনতে হত—আমার আর মাছ খায়্যা কাম নাই ঠাইরকর্তা, ঠ্যাহা-পয়সা হাতে মোটে নাই, কয়্যা দিলাম।

—আউ আউ, ছি ছি! ট্যাহার কথা কোস ক্যা ?

বলতে বলতে কর্তা চলে যেতেন। মনে মনে রাগ পুষে রাখতেন কি না জানা যায় না। গ্রামের নামে যে স্টীমারঘাট ছিল, সেখান থেকে গ্রাম অনেক দূরে। কর্তাদের সব কীর্তিকলাপ গিন্নীদের কানে সব সময়ে পৌঁছত না। পৌঁছলেও তাঁরা খানিকটা কান খুজে থাকতে জানতেন, অশান্তি করতেন না। চারুমতি-শশী-যশিদের সঙ্গে কর্তাদের সম্পর্কটা সুখদুঃখে বেশ গভীর হত সেটাও গিন্নীরা মেনে নিতেন বলেই মনে হয়, কেননা এই বিষয় নিয়ে মনকষাকষি বা কলহবিবাদ খুব একটা শোনা যেত না।

অবশ্য একথা সর্বজনে প্রযোজ্য মনে করবার কোন কারণ নেই। গ্রামে হয়তো সবসুদ্ধ চার-পাঁচটি পরিবার ছিল, যাদের পুরুষদের এই গোপন অভ্যাস ও প্রকাশ্য অপবাদ ছিল।

তাঁরা ময়নাবৃত্তি সময়ে-অসময়ে নিলেও দুর্নাম পাননি। কিন্তু মনোমোহন রায়ের বদনাম হয়েছিল। এই অপবাদ যে শুনেছে সেই অবাক হয়েছে। কেননা মনোমোহন রায়ের বয়স কম নয়, বছর চল্লিশেক হবে। গ্রামে উনি ছিলেন অবস্থাপন্ন, সরিকদের মধ্যে একাই দশ-আনির মালিক। ঝড়-বান-পদ্মায় ভাঙন, তিনটি সর্বনাশের দেশে পাকাবাড়ি অতিবড় ধনীও করত না।

মনোমোহন রায়ের বাড়ি ছিল লালটালির চাল দেওয়া বাংলোবাড়ি। তিনটি বন্দুকের লাইসেন্স ছিল ওঁর, কলকাতায় ঘন ঘন যাওয়া-আসা করতেন। গ্রামের প্রতি সম্পন্ন বাড়িতেই লাইব্রেরি ঘর থাকত। মনোমোহন রায়ের বিরাট লাইব্রেরি ঘর ছিল, সেখানে চার-পাঁচখানা কাগজ আসত। রীতিমত কাগজ

পড়া ও রাজনীতিক তর্কবিতর্ক হত ওখানে।

মনোমোহন রায়ের স্বভাবে কয়েকটি খাপছাড়া অভ্যাস ছিল। অভ্যাসগুলি তিনি সগৌরবে জাহির করতেন!

একটি হল ওঁর পত্নীপ্রেম। স্ত্রীকে অসম্ভব ভালোবাসতেন মনোমোহন। শিকারে অব্দি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। বিলের ওপর জ্যোৎস্নায় নৌকো চড়ে বেড়াতেন স্ত্রীকে নিয়ে। বৌ নিয়ে এত হাঁকডাক করে ভালবাসা তখন সবাই দেখাত না। বিশেষত স্ব-গ্রামে, যেখানে চারদিকে সরিকী আত্মীয়-স্বজন, গুরুজনের ছড়াছড়ি।

আরেকটি হল সরকারী মহলে ওঁর দহরম-মহরম। ঐ গ্রামের ওটা কেউ ভালোচোখে দেখত না। কেননা ঐ একটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে একজন স্বদেশী-বিপ্লবী কাগজ বের করতেন কলকাতা থেকে, তখনকার দিনে সর্ব-ভারতীয় পরিচিতি ছিল তাঁর। আরেকজন ফাঁসির মঞ্চেও শহীদ হয়েছিলেন, আরেকজন যুবক আন্দামানের জেলে অনশনে মারা গিয়েছিলেন। তখনকার বাংলা দেশের ম্যাপে ছোট গ্রামটির একটা বিশেষ সম্মানিত জায়গা ছিল।

গ্রামের কম ছেলেই সরকারী চাকরিতে ঢুকত। ঐ গ্রামেরই বাসিন্দা হয়ে মনোমোহন রায় সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে থানায় ভেট পাঠাতেন। সরকারী লোকজন ও তল্লাটে এলে বাড়িতে অতিথিশালায় তুলতেন। সরকারী লোকজন হরদম ইনস্পেকশনে আসতেন। স্টীমারঘাট থেকে মনোমোহন রায় ওঁদের ধরে আনতেন। স্টীমারঘাট থেকে খাল বেয়ে নৌকোয় আসতে হত, অনেক ভেতরে গ্রাম। একবার পৌঁছলে, অতিথিদের ছাড়া পাওয়া একেবারেই গৃহ-কর্তার মর্জির ওপর নির্ভর।

এখন, অমন পাড়াগাঁয়ে, কখনো-সখনো স্কুল ইনস্পেক্টার, ক্বচিৎ কদাচ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপিসের লোক ছাড়া কে আর কাজে আসবে।

তবে হ্যাঁ, পুলিস আসত, ঘনঘনই আসত। সদর পাবনা থেকেও আসত, কলকাতার স্পেশাল পুলিসও আসত। ধরা যাক, তারা চার মাইল দূরের কোন গ্রামে রথের মেলার দিন উপস্থিত থাকতে চায়। তাদের ধারণা সেদিন ওখানে কোন কোন পলাতক রাজবন্দীর মুখ দেখা যাবে। শহর নয়, গাড়ি-ঘোড়ার দেশ নয় যে যাব বললেই চলে গেলাম। নদী, নালা, খাল, বিলের দেশ। স্টীমার স্টেশন হয়ে, খাল বেয়ে যেতে হবে, অন্য পথ নেই।

স্টীমার স্টেশন মানেই মনোমোহন রায়। মনোমোহন রায় মানেই বলতে গেলে বেঁধেছেঁদে নিজের নৌকোয় তোলা। তারপর কয়েকদিনের ঢালাও আতিথ্য। ওদিকে রথের মেলার সময় কাছাকাছি, যেতেই হবে। যেতে হলে নৌকো চাই। নৌকো না পেলে যে তেজ করে হেঁটে চলে যাবেন তারও উপায় নেই। ধানক্ষেতের মাঝামাঝি আলপথ ছাড়া আলপথ নেই। সে পথও জল জমে, পেছল হয়ে ভয়াবহ। চটচটে কাদায় পুলিসের বুট ঢুকে গেলে টেনে তোলা কঠিন।

এই সর্বনেশে কাদার স্থানীয় নাম "কাঁদোর"। "কাঁদোর" তাক বুঝে পা জড়িয়ে ধরলে পরে সে বাঁধন ভালবাসার বাঁধনের চেয়েও মারাত্মক হতে পারে। এক মাইল হেঁটে যেতে একবেলা লেগে যেতে পারে।

সেইজন্যে নৌকোর অপেক্ষাতেই বসে থাকতে হত।

বসে থাকাটা যে খুব অপ্রীতিকর, তাও নয়। মনোমোহন রায়ের বাড়ির ভিত অনেক উঁচু, পাকা ভিত। বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ালে অনেকদূর অব্দি দেখা যায়, বাড়ির ভেতর নেওয়ারের খাটে বিছানা, মেঝেতে দড়ির মোটা শতরঞ্চি, ও-দেশে যাত্রার আসরে যেমন পাতে। তা ছাড়া টেবিলল্যাম্প কেরাসিনের আলো। বাথরুমে জল, অতিথিদের খাওয়ার জন্যে টেবিল চেয়ার। শুধু মুর্গীটাই রান্না হত না, নইলে মনোমোহন রায়ের নিজের শখে তৈরী করানো নতুন রান্নাঘরে হেন পাখি নেই, যা রান্না হয়নি। গ্রাম থেকে মাইল সাতেক দূরে যমুনার বিল ছিল। কোন একসময়ে সেখান দিয়ে হয়তো যমুনার বহতা ছিল। ক্রমে নদীপথ বদলে পূবে চলে যাবার সময়ে ঐ বিস্তীর্ণ জলরাশি রেখে চলে যায়।

সেটাই ক্রমে বিল হয়ে দাঁড়ায়। গ্রীষ্ম ও শীতে কোথাও কোথাও তার চড়া পড়ত বটে, কচ্ছপের মত ছোট ছোট চর পিঠ তুলত, কিন্তু অন্য সময়ে জল থইথই করত।

কোথাও গভীর, কোথাও অগভীর। কোথাও রাশি রাশি পদ্মফুল ফুটত, কোথাও ঘন শরবন। শীতকালে ওখানে অজস্র পাখি ডিম পাড়তে আসত। মনোমোহন রায় হবদম ঐ বিলে যেতেন, শিকার করতেন।

সঙ্গে অবশ্য ইনটার্নি ছেলে দু'একটি থাকত। গৃহান্তরীণ রাজবন্দীদের রাখবার জন্যে দারোগা মনোমোহন রায়ের বাড়িকেই সব চেয়ে নিরাপদ মনে করতেন। এসব যুবকরা ওঁর বাড়িতে থাকত, খেত, কাগজ পড়ত, থানায় রিপোর্ট করতে যেত। ওঁর স্ত্রীকে বৌঠান বলত।

সুধন্য বেশ বছর তিনেক ছিল। ওরও রান্নার শখ ছিল খুব। সরকারী অতিথিরা যখন কিছুতে নৌকো পেতেন না তখন ওঁদের মন ভালো রাখবার জন্যে সুধন্য নানারকম রান্না করত, সন্ধ্যেবেলা কলের গান বাজিয়ে শোনাত।

মনোমোহন রায় তো নৌকোর জন্যে অতিথিদের চেয়েও বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। ওঁর নিজের বড় বোটবজরা সরু খালে চলবে না, ডিঙিনৌকা চাই।

—যেখান থেকে পারিস, নিয়ে আয়। নইলে জুতো মুখে উঠোনে ঘোড়-দৌড় করাব!

মনোমোহন রায় ওঁর লোকজনকে ধমকে অস্থির করতেন। কারোকে হয়তো নাগরা জুতো দিয়েই মেরে বসতেন। শেষ অব্দি নৌকো যতক্ষণে পাওয়া যেত ততক্ষণে পাখি পলাতক। মনোমোহন রায় হায়-হায় করতেন, বুক চাপড়াতেন। খুব চওড়া বুক ছিল ওঁর, চাপড় মারলে দিব্যি শব্দ হত। ফিরতি পথে আবার নামতে হত অতিথিদের। অন্তত একবেলা বিশ্রাম, খাওয়াদাওয়া। যাওয়ার

সময়ে নৌকোতে মাছ, সন্দেশ, কলা, তত্ত্ব সাজিয়ে তুলে দিয়ে মনোমোহন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

গ্রামে সবাই আড়ালে ছি-ছি করত। সামনে বলত—রায়সাহেব হবে কবে বল তো ?

মনোমোহন হেসে বলতেন—রায়সাহেব তো কর‍্যা দিতেই চাচ্ছিল চাচা, আমি কল্যাম রায়বাহাদুর খেতাব দিলে নেব, রায়সাহেব কি আর দুজন হতে পারে ?

ওঁর বাবা রায়সাহেব হয়েছিলেন। বহু অনারারী বোর্ডের মেম্বার, প্রেসিডেণ্ট, ইত্যাদি পদগৌরব ছিল তাঁর।

এই সরকার প্রীতি আর পত্নীপ্রেমের বাইরে আরেকটি বাতিক ছিল ওঁর, এক খাপছাড়া বাতিক। ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ মানুষ ছিলেন। গ্রামদেশের জলহাওয়া এমনই, যে অত খেয়ে অত গড়িয়ে অত নিষ্কর্মা থেকে, স্বভাবের উগ্রতা আপনা থেকেই ক্ষয়ে যায়। কট্টর নীতিবাগীশপনাও খুব একটা দেখা যেত না। যাঁরা ভালো, তাঁরা ভালো। যাঁদের স্বভাবে একটু ঢিলেঢালা অন্যাসক্তি আছে, তাঁরাও সমাজেরই মানুষ, তাই তা নিয়ে খুব একটা দা-মাছ সব সময়ে হত না। সকলেই জানত গ্রামে কার কোন্ বাতিক আছে। জানত, মেনে নিত, তা নিয়ে কেউ মন্তব্য প্রকাশ্যে করত না। বা সেটা বিরাট অন্যায় বলে প্রতিবাদ করে অশান্তি ডেকে আনত না।

মনোমোহন রায় ছিলেন সব কিছুর ব্যতিক্রম। গ্রামের সব চেয়ে সুপুরুষ উনি। ছোট একটা ঘোড়া চড়ে যখন টহল দিয়ে ফিরতেন, তখন সবাই মুগ্ধ হয়ে দেখত। ধুতির পায়ে চওড়া ক্লিপ এঁটে, খাকী শার্ট (সব সময়ে হোআইট-ওয়ে থেকে আসত) আর শোলার টুপী পরে ওঁকে চমৎকার দেখাত। খুব লম্বা ছিলেন না। কাঁধ বেশী চওড়া, হাত একটু বেশী লম্বা, কিন্তু শক্তসমর্থ পুরুষের চেহারা। ওঁর ছেলে কলকাতায় পড়ত, মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, ঠিক যে-সময়ে ওঁর ময়না রায় নাম রটে তার আগে আগে ওঁর স্ত্রী বগুড়া গিয়েছিলেন মেয়েকে দেখতে। মেয়ের সবে সন্তান হয়েছিল।

বেশ্যাদের ওপর ভীষণ রাগ ছিল ওঁর। ওঁর এক কাকার সম্ভবত চরিত্রদোষ ছিল। কাকীমার চোখে জল দেখে মনোমোহন রায় বলেছিলেন—আমি এর প্রতিকার করব।

ভয়ঙ্কর হইচই তুলে, যুবকদের ডেকে মিটিং করেটরে ওদের উনি স্টীমার-ঘাটে তুলে দিয়েছিলেন। একেবারে যমুনার জলে ঠেলে ফেলে দিতে পারলেই খুশী হতেন, কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। তবে হ্যাঁ, ওরা ছিল বছুরকী। ফি-বছর ব্যবসা করবার লাইসেন্স নিতে হত ওদের। কাছাকাছি গ্রামের মেয়ে হলেও ওরা কায়েমী লাইসেন্স পেত না। ওদেরও ওঁর ওপর পেল্লায় রাগ ছিল। মনে মনে ভয়ও করত খুব। লাইসেন্স দেয় দারোগা। দারোগা, থানার জমাদার, সবাই ওদের পৃষ্ঠপোষক। শুধু মনোমোহন রায়ের ভয়েই ওদের

পাকা লাইসেন্স দেওয়া যেত না।

আরেক রকম পথে ওদের ওপর শোধ নিতেন মনোমোহন রায়। গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে ওদের কারুকে দেখতে পেলে তার লাইসেন্স উনি বন্ধ করাবেনই করাবেন। ওরা কোথায় যাবে, কি করবে, ওরাও দুঃখিনী, একথা উনি কানেই তুলতেন না। বলতেন—নদী আছে ডুবে মরুক, যেখানে যেতে হয় যাক, আমাকে বল কেন?

অথচ, গ্রামে ওদের অনেকেরই বাড়ি, প্রকাশ্যে না হোক, গোপনে ওদের পাপের টাকা বহু জেলে-চুণে-মালো-বাগ্দী-নমঃশূদ্র বাড়ির বাপ-দাদা স্টীমার-ঘাট থেকে নিয়ে আসত, পাবনা গিয়ে ফুর্তি করত।

মনোমোহন রায়ের ওপর সব চেয়ে রাগ ছিল যশির। যশির বয়েস বড় জোর তেইশ। নাক চ্যাপটা, চুল কোঁকড়া, রং মাজা-মাজা, কটা চোখে স্থির-স্থির দৃষ্টি, যশির দাপটে সবাই অস্থির থাকত। যশির অবস্থা সব চেয়ে ভাল। ওদের মধ্যে একা যশি ঝি রেখে ঘরের কাজ করাত, চটি পায়ে স্টীমারঘাটে বেড়াতে যেত। যশির ঘরে টেবিল-চেয়ার থাকত। স্টীমারের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাপ্তেন বা চাটগেঁয়ে সিনিয়ার সারেং ওর ঘরে আসত, বসত। যশির ওপর অনেকেরই রাগ ছিল, কিন্তু স্বয়ং বড় দারোগা ওর অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক হওয়াতে কেউ কিছু বলতে পারত না।

যশি গ্রামেরই মেয়ে। ষোল বছর বয়সে স্বামীর মারধোরে অস্থির হয়ে বারকয়েক পালিয়ে যায়। প্রতিবারই ওকে পেছনে হাত বেঁধে, ভেজা গামছা দিয়ে মারতে মারতে ফিরিয়ে আনা হয়। শেষ অব্দি যশি ওর এক দেওরের সাহায্যে পালিয়ে যায়। স্টীমারঘাটে দেওরকে ফেলে, সোজা গোয়ালন্দ ঘাটে গিয়ে বছরখানেক অজ্ঞাতবাস করে যশি সগৌরবে লাইসেন্স নিয়ে ফিরে আসে।

ওর স্বামী আবার বিয়ে করেছিল। বুড়ো মা, দাদা গ্রামে থাকত। যশির কাছ থেকে রাতবিরেতে ওর স্বামী টাকা নিতে আসত, ওর দাদাও আসত। না, যশিকে ওরা মারধোর করে শিক্ষা দেবার কথা কখনো ভাবেনি। বড় দারোগার নামে সবাই কাঁপত। বরঞ্চ ওর দাদা গ্রামে বেশ জাঁক করেই বলত—আমার গায়ে হাত দ্যায় ক্যাডা? বড় দারোগারে কয়্যা তার চাম খুলে ফালামু না?

যশির প্রাণটা ওর মা-র জন্যে পুড়ত। ওর সন্দেহ হত দাদা ওকে যা বলুক, যশির টাকা যশির মা-র ভোগে হয়তো লাগে না। মনোমোহন রায়ের ভয়ে ও গ্রামে পা দিতে পারত না। বড় দারোগাকে যশি সর্বদাই বলত—আমারে পাকা লাইছেন্ কর্যা দ্যান্ দেখি! মনা আর আমারে কি করে তাই দেহি একবার।

বড় দারোগা মাথা নাড়তেন। এই জল-বিলের দেশে, বিশেষ ঐ গ্রামে, মনোমোহন রায়কে চটিয়ে টিঁকে থাকা সম্ভব নয়।

—ঐ এক্যেই কথা কোন্ ক্যাম্ তাই ক চেন্ দেহি? মনা রায় থাকতে

আর লাইচেন্ পাতে হতেছে না, জানলি ?

যশি ফোঁসফোঁস করত। ওঃ, ভারী সচ্চরিত্র সব! চরিত্রের বড়াই কত! গ্রামের কে কেমন লোক ও সব জানে। ওর খুব ইচ্ছে হত মনোমোহন রায়কে একটা মস্ত শাস্তি দেয়, নয়তো বিপাকে ফেলে। মনে হত এমন একটা আশ্চর্য কোন পরিস্থিতি তৈরী হয়, যাতে মনোমোহন রায় এসে ওর পা জড়িয়ে ধরেন। মনোমোহন রায়কে ও অনেকদিন ধরেই বিলে যেতে-আসতে দেখেছে। ননদদের সঙ্গে ঝিনুক খুঁজতে গিয়ে ওঁকে আর ওঁর স্ত্রীকে হাত ধরাধরি করে নির্জন চরে বেড়াতে দেখেছে। সে-সব কথা মনে পড়লেই যশির হিংসে হত, ভীষণ হিংসে। ও মনে মনে বলত—মানুষ শুধু কয় আয়-গিন্নীর নাগাল উপ্সী (রূপসী) নাই! অমন গোলাপী শাড়ী আর আঙাজামা গায়ে দিলে যশিরে বা দ্যাখতে ক্যামন! যশির নিজের রূপ-যৌবনের ওপর অতিরিক্ত আস্থা ছিল।

আবার মনোমোহন রায়কে নিয়ে বড় দারোগা কিছু বললে যশি ফোঁস করে উঠত—মানুষের নিজের নাগাল দ্যাখেন ক্যা ভাই কন্ চে দেহি? মনা আয় কি নেমিছেমি বামুন নাকি? উনি পাক্কিতো মানুষ, জানেন বড় মিঞা?

—মনে দেহি ধরছে খুব?

—ইয়ারে মনে ধরা কয় না।

—কি কয়?

সে কথা যশি গুছিয়ে বলতে পারত না। তবে মনোমোহন রায় যে ঠিক আর পাঁচজনের মত নন, সব রকম দুর্নীতির প্রতি ওঁর ঘেন্না যে দাউদাউ করে জ্বলত সেজন্যে ওর মনের কোথায় যেন গর্বও ছিল।

একদিন সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল একটা অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে। থানার বড় দারোগা খুন হয়েছেন। খুন হয়েছেন যমুনার বিলের ধারে। সকলের চোখের আড়ালে, ঘন বাঁশবনের মধ্যে পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে নাকি বন্দুক, কার্তুজ কিছু কাগজপত্র পাওয়া গিয়েছিল। যে পলাতক রাজবন্দীকে ধরবার জন্যে বছরখানেক ধরে এত চেষ্টা চলছে, তার আর দারোগার মৃতদেহ একই সঙ্গে পাওয়া গেছে। হাঁড়িকুড়ি, চালডাল, জলের কলসী, বিছানা, মশারী, সব দেখে মনে হয় ওখানেই যুবকটি বাস করছিল। বিজয় সোম মারা গেছে দারোগার গুলীতে। সামনে অভুক্ত ভাতের থালা, সম্ভবত ও খেতে বসেছিল। লণ্ঠনটা তখনো জ্বলছে। দারোগা মারা গেছেন বাইরে, গাছের নিচে। বিজয় সোম ভাতের থালার পাশেই পড়ে ছিল, গায়ে গামছা। মনে হওয়া স্বাভাবিক ও অতর্কিতে মারা গেছে। কিন্তু দারোগাকে মারল কে?

পুলিস, পুলিস, এস. ডি. ও, বড় ইন্স্পেকটর। গ্রাম তোলপাড় হয়ে গেল. স্টীমারঘাটে কর্ডন। সবাইকে অবাক করে মনোমোহন রায়কে ধরে নিয়ে গেল পুলিস। ওঁর সরকারী মহলে তেলমাখামাখি মিথ্যে, সব না কি ছল। উনিই বিজয় সোমকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলেন। উনি-ই দারোগাকে খুন করেছেন।

অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই। সুধন্য দারোগাকে ঐ লুকোনো আস্তার খবর দেয় ও পাবনা পালিয়ে যায়। দারোগা ওর কাছে খবর পেয়েই একা নীলকুঠি গিয়েছিলেন।

ভীষণ হইচই। মনোমোহন রায়ের শালারা এলেন। কলকাতা থেকে বড় উকিল আনা হল। কেস উঠল পাবনার আদালতে। না, মনোমোহন রায়ের কোন অ্যালিবাই নেই। তা ছাড়া পুলিসের মারের চোটে ও'র অতিথি-শালার বেয়ারা কলিমুদ্দি স্বীকার করল রায়কর্তা সেদিন অনেক রাতে এসে ওকে বলেছিলেন ঘোড়া বেঁধে রাখতে। তারপর, বাড়িতে না এসে, খালের জলে চাঁদের আলোয় উনি হাত-পা-গায়ের জামা ধুয়েছিলেন, ও দেখেছে।

সব চেয়ে সর্বনেশে সাক্ষী দিল সুধন্য। ও অনেকদিন থেকেই সন্দেহ করছিল। হ্যাঁ, ও গ্রামে অন্তরীণ বন্দীই ছিল। কিন্তু কবে যে ও বড় দারোগার কথায় ভজে যায়, কবে থেকে যে ও ও'র ওপর নজর রাখে, মনোমোহন রায় তা বুঝতে পারেন নি।

সব চেয়ে সর্বনাশের কথা হল, সে রাতে উনি আর কোথাও গিয়েছেন, থেকেছেন, তেমন কোন প্রমাণ নেই। দারোগা মারা গেছেন যে বন্দুকের গুলীতে, তেমন বন্দুকও মনোমোহন রায় ছাড়া আর কারোই নেই।

তিন মাস মামলা চলল। মনোমোহন রায় যখন বুঝলেন যে ও'র রক্ষা পাবার কোন আশাই নেই তখন শালাদের বলে দিলেন বোনকে নিয়ে কলকাতা চলে যেতে। পাড়া গাঁয়ের জমিজমা চট করে বিক্রী হওয়া সম্ভব নয়। সোনাদানা, বাসন-কোসন, গৃহবিগ্রহের গয়নাগাঁটি, যা বাঁচানো যায়, তা নিয়ে যেতে বললেন। স্ত্রীর সঙ্গে উনি দেখা করতে চাননি। স্ত্রী আর উনি দুজনেই ভেঙে পড়তে পারেন বলে ভয় পেয়েছিলেন মনোমোহন রায়।

তবে শেষ অব্দি স্বীকার করলেন না যে দারোগাকে উনিই মেরেছেন। বললেন—মারলেও মরে, না মারলেও মরে। ফাঁসি না হোক, যাবজ্জীবন তো হবেই? তবে আর কুকথা কয়া মুখ নষ্ট করি ক্যা? ওরা কি আমায় সহজে ছাড়বে? দারোগার পিছনে লীগ আছে ভুলে যায়্যা না।

যখন সবাই মনে মনে জানল আর কিছু আশা নেই, আর কিছু হবার নয়, যশি একদিন চুপিচুপি মনোমোহন রায়ের বাড়ি এল। এসে সোজা রায় গিন্নীর কাছে গেল। যশির সাহস দেখে সবাই অবাক। কে না জানে বড় দারোগার জন্যেই ওর এত বাড়বাড়ন্ত। সবাইকে তাজ্জব করে যশি রায়গিন্নীর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

ঘণ্টাখানেক বাদে যশি বেরুল। বগলে একটা পোঁটলা. মুখে বিজয়িনীর হাসি। হাতে একখানা ভাল ঢাকাই কাপড়, রাঙাজামা। বলল—বৌঠান, এহন আমার হাতযশ আপনার কপাল।

বাড়ির লোকজন সবাই হাঁ করে ছিল, কি হল তা শুনবে। কিন্তু রায়-গিন্নী কারুকে কিছু না বলে আবার ঘরে চলে গেলেন।

দু'দিন বাদে পাবনা আদালতে হইহই পড়ে গেল। মনোমোহন রায়ের উকিলের সঙ্গে যশি ঢুকল আদালতে। যশির পরনে ঢাকাই শাড়ি, গায়ে জামা, পায়ে চটি, সর্বাঙ্গে গিল্টি, রুপো সোনার গয়না, মুখে পান। বগলে একটা পোঁটলা।

ওকে দেখে তো মনোমোহন রায় হতভম্ব। যশি সকলকে তাজ্জব করে বলে গেল অমুক দিন মনোমোহন রায় সন্ধ্যে সাতটা থেকে সারারত ওরঘরে ছিলেন। বড় দারোগা অন্য পুরুষ এলে বড় রাগারাগি করতেন। সেদিন উনি থাকবেন না জেনেই মনোমোহন রায় এসেছিলেন, এই ভাবেই উনি যাওয়া-আসা করতেন।

মনোমোহন রায়ের মাথায় রক্ত উঠে, জ্ঞান যায়-যায় অবস্থা। রেগে উনি যা নয় তাই বলে যতই গালাগালি দেন, যশি আর হ্যাঁ বাক্যকে না করে না। পোঁটলা খুলে ও মনোমোহন রায়ের জামা, কাপড়, খড়ম, গামছা, সব দেখাল। তা ছাড়া ওঁর সোনার পইতে। বলল—ওঃ, চরিত্তিরের জাঁক! ওরে আমার বামুন রে! তোমার কাপড় গামছা আমি পালেও পাতে পারি! কাপড়ে নাম লেহা থাহে না। তোমার পইতে আমি পাল্যাম কন্ যে তাই কও চেন্ দেহি? তোমার সাধের গিন্নীরে আন না! শোন না উনি কি কয়! পইতে উনি চেনে কি না চেনে কয়্যা যাক।

হাকিমকে বলল—উনির অন্য দোষ নাই হুজুর, এই এক চরিত্র-দোষ! যায়্যা আমার ঘরে তালাস করান, দ্যাখেন গা উনি নাম ল্যাহা বই কত খান্ পড়্যা আছে। তাও কি আমি বানাতেছি নাকি?

মনোমোহন রায় চেঁচাতে লাগলেন—তোমারে আমি দেখে নেব, তোমারে আমি দ্যাশছাড়া করব!

—ক্যা, ডুব্যা ডুব্যা জল খাত্যাছিলে, আমি কয়্যা দিছি বলে?

যশি একেবারে কুকথার বান ছুটিয়ে দিল। যশি হল নামী বেশ্যা। ওকে চেনে না এমন কেউ ও তল্লাটে নেই। বড় দারোগা ওকে অনাথ করে রেখে গেছেন। তাঁর হত্যাকারীকে যশি বাঁচাতে যাবে কেন? তাকে ধরা হোক, ফাঁসি দেওয়া হোক। কিন্তু যে দোষে দোষী নয় মনোমোহন রায় সে দোষে যদি তার ফাঁসি হয় তা হলে সে পাপে তো যশিও ডুবে মরবে। তা ছাড়া এ প্রেম তো বছর ছয়েকের পুরনো। প্রাণের 'য' কে প্রাণের 'ম' র লেখা এ চিঠি কোথা থেকে এল?

মনোমোহন রায় দেখলেন যূথীরাণীকে লেখা ওঁর বুড়োবয়সের ক্ষ্যাপামিভরা চিঠি যশির হাতে, বর্তমানে পুলিশ এক্জিবিট! 'বড় বউ!' বলে চেঁচিয়ে উনি সত্যিই জ্ঞান হারালেন। কারো আর সন্দেহ রইল না। কলঙ্ক বেরিয়ে পড়েছে বলেই লোকটার এত উত্তেজনা। ম্যাজিস্ট্রেটের অনেকটা বিশ্বাস হল, অনেকটা সন্দেহ হল নিশ্চিত ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড জেনেও, শুধু কলঙ্কের ভয়ে একটা লোক এত চুপ করে থাকতে পারে?

ম্যাজিস্ট্রেট নতুন এসেছেন, বয়স কম, এখনো অনভিজ্ঞ, বেনিফিট অফ ডাউটে মনোমোহন রায় মুক্তি পেলেন আরো ক'দিন বাদে।

গ্রামে উনি আসবার দিন কি হইহই, রায়বাড়িতে পুজোর ঢাক বাজল। গ্রাম-বৃদ্ধরা গ্রামের সব চেয়ে সচ্চরিত্র পুরুষটির এ-রকম পদস্খলনে মাথা নেড়ে আফসোস জানিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে গেলেন।

মনোমোহন রায় ওঁর স্ত্রীকে কি বললেন তা জানা যায়নি কিন্তু ক'দিন বাদে যশি একদিন নির্ভয়ে গ্রামে মা-র সঙ্গে দেখা করতে এল সন্ধ্যেবেলা। তারপর রায়বাড়িতে এল।

জাতবজ্জাত মেয়েছেলের দুঃসাহস। সোজা ও কর্তা-গিন্নী দু'জনের সামনে গিয়ে মাটিতে উবু হয়ে বসল। পইতেটা মাটিতে রেখে বলল—এই ন্যান বউঠান!

—তুই?

মনোমোহন রায় ফুঁসে উঠলেন, যদিও গলাটা রীতিমত ক্ষীণ। গিন্নী বললেন—হ্যাঁ আমি ওকে আসতে বলেছি। একশোবার আসবি যশি, মাকে দেখবি, আমাকে দেখতে আসবি।

—আপনে কি কন্ আয়কর্তা?

যশির মুখে হাসি আর ধরে না। বলল—না বউঠান, আসলে গেলে পাঁচজনের মনে সন্দ জাগবে নে!

রায়গিন্নী তখন যশির পা ধরতে পারেন, ও চাইলে ওঁর সোনাদানা সব দিতে পারেন যশিকে, কিন্তু যশি কিছুই চাইল না। একটু বসল, হাসিগল্প করল, যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি এর মধ্যে। যেন মনোমোহন রায়ের জীবনটা এক হাতে কিনে নিয়ে আরেক হাতে সে জীবন ওঁকে ফিরিয়ে দেয়নি যশি!

মনোমোহন রায় কি বলবেন, কেমন করে কৃতজ্ঞতা জানাবেন, ভেবে বিব্রত হয়ে পড়ছিলেন, কেননা যশির কাছে উনি চিরকৃতজ্ঞ তা জেনেও, মুখে কথা আটকে যাচ্ছিল।

—তোর বোঠান তো তোরে রাজ্য দিতে চায় যশি, ক, তুই কি চাস্?

উনি অনেক চেষ্টায় বললেন। আহা, বেশ্যা হোক, যা হোক, ওঁর মেয়ের চেয়ে তো বছর ছয়েকেরই বড় যশি! মনে জোর করে স্নেহ আনতে চেষ্টা করলেন মনোমোহন রায়। কি আপদ্! আদালতে ওকে দেখবার পর থেকেই ওর চেহারার কথা মনে পড়ছে ওঁর, ওর সেই নির্লজ্জ, বানানো গল্পগুলো ওঁর বিষয়ে, মনে পড়ছে সব, আর লজ্জায় মাথাকাটা যাচ্ছে।

—কি চাস যশি?

যশি হাসল। বিজয়িনীর হাসি। বলল—আপনারে বাঁচায়্যা বউঠানের হাতে আন্যা দিছি, আর কিছু চাই না। আমার দাদা, গোরাচাঁদ, মা-রে বড় যন্ত্রণা দেয়, একটু দ্যাখ্‌বেন, আর আমার মা মাগী যখন মরবে, তখন য্যান্

একবার সংবাদ পাই, আস্যা দেখে যাতে পারি।

—আর কিছু চাস্ না ?

—না রায়কর্তা। এমনিতেই মানুষ আপনারে ময়না আয় কতেছে! আরো কি বদনাম ডাকতে হয় ?

যশি চলে গেল।

ময়না রায় ? মনোমোহন রায় তো কেঁদে ফেলেন প্রায়, কিন্তু সেই থেকে ওঁর নামই হয়ে গেল ময়না রায়। সেই নামেই উনি বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

৯ জন্মতিথি

দোলপূর্ণিমায় পথে পথে দোলের রং, তেতলা বাড়ির ছাতে শামিয়ানা বাঁধা হল। বাড়ির সামনের ফুটপাত জলে ধুয়ে দিল মেথর। দারোয়ান বলল, ভাগ তোরা।

কুড়োনরা উলটো দিকের ফুটপাথে গিয়ে বসল! দোতলা বাড়ির গিন্নি বললেন, আবার জ্বালাতে এলি ?

কুড়োনের মা বলল, না গো মা! হোথা আজ কি যগ্যি হতেছে, তাই রাতটুকু এখেনে রইব। বিয়েনে হোথা যাব।

বিদেয় হস না কেন ? ফুটপাত নরক কচ্ছিস ?

কোতা যাব মা ?

দেশে যা। সবাই তো গেল।

মাগো, যদ্দিন দেশ বলতে ছিল, তদ্দিন গেছি। এই পুজোর আগে এইছি, কাত্তিকের শেষে গেছি। এবার কুড়োনের বাপ মরে গেল। দেশে গেলে তিনটে কাঁচ নে আমারে কেউ কাজ দেবে ?

তোরা কি এখানেই থাকবি নাকি ?

কোতা যাব মা ?

কাজ করতে পারিস না ?

কেউ কাজ দেয় না গো। তোমাদের সব গ্যাসে আন্না হয়। গুল ঘসি দিয়ে দেব তারও যোগাড় নি। বিন খাটব, তাও কেউ বিশ্বাস করেনি গো, বলে চুরি করে পালাবে।

ভিক্ষে করা এত ভাল ?

কি করব মা ? যদ্দিন কুড়োনের বাপ ছিল, আসতাম, ভিক্ষে করতাম। চলে যেতাম। সে যে মোদের চেরদিনের ভিখমাঙার লেবস্তা করে দিয়ে গেল গো ?

কুড়োনের মা কাঁদতে শুরু করল। গিন্নি বিরক্ত হলেন। তিনি অ্যাডলিব, সমাজকল্যাণ, সাঁইবাবা ও আন্তর্জাতিক মহিলা বর্ষে বিশ্বাসী। কুড়োনের রোগা হেঁপো কেশো বাপ মরে যাওয়ার তিন মাস বাদেও কুড়োনের মাকে

কাঁদতে দেখলেই তাঁর মনে হয় এ দেশে নারীমুক্তি, নারীকল্যাণ সম্ভব নয়।

বললেন, ফুটপাত নোংরা করিস না। গায়ে জল ঢেলে দেব।

না গো মা!

ওরা বসে রইল। আজ দোলপূর্ণিমা। পথে পথে ভিক্ষে চেয়ে তেমন জুত হয়নি। একে তো এ পাড়ায় বাড়িঘরের হদিস পায় না কুড়োনের মা। একেকটা উঁচু বাড়িতে পঞ্চাশটা করে পরিবার-পরিকল্পনাসম্মত সুখী পরিবার থাকে। বাবুরা আপিস যায়, গিন্নিরা কাজে বেরোয়। কোন বাড়ির একতলায় মানুষ থাকে না। গাড়ি থাকে। তাই ভিক্ষে চাইলে বিরক্ত হাতে কেউ দেয় না। কুড়ানের মা যায় সেই সব পাড়ায়, যেখানে একতলায় গেরস্ত থাকে। বিরক্ত হয়ে ভিক্ষে দেয়।

কুড়োন বলল, মা, এত বড় যগ্গি কেন রে?

বাবুদের ছেলের জন্মতিথি।

আজ?

হ্যাঁ রে।

তুই তো বলিস আমিও দোলপুন্নিমেয় জন্মিছিলাম?

সত্যিই তো।

তা'লে মোরও জন্মোতিথি আজ?

হ্যাঁ।

ভিক্কেয় বেরুলি না, কি খাবি?

এ বাড়িতে যগ্গি হবে না?

হবে তো।

কত নিধি জিনিস আসতেছে। বাবুরা কি অত খেতে পারে? পাত ফেলবে যখন, তখন কুড়িয়ে খাব!

সেদিন যেমন খেইছিলাম?

তার চে' অনেক ভাল খাব। এদের পয়সা বিস্তর। তিনটে গাড়ি চড়ে। শুনলি না, তিনশত লোক আসতেছে, মাতা-পিছু বিশ ট্যাকা খরচ কত্তেছে এরা?

তোরে কে বলল?

মেতরানি। তারে বিনয়েরা বলেছে। এরা বাবু লোক, বাড়িতে এঁদে যগ্গি করে না। ট্যাকা ধরে দিতেছে, হোটেলের বাবুরা এসে খাবার দে যাবে।

বিশ ট্যাকা একোজনের পিছনে?

হ্যাঁ রে! সে নানা নিধি সামগ্গি। হোটেল থে' যারা খাবার আনে তারাই সব থালা বাটি নে' আসবে।

জন্মোতিথিতে কি হয়, মা?

শোনিনি বাবু। জল তোলার ঝি-টা অনেকদিন আছে। সে বলতে ছিল ছেলের জ্যাটা কোতা বিলেত থে' খেলনা আনতেছে। দিদিমা সোনার বাটি

দেছে, বাপ-মা এট্টা গাড়ি কিনে দেছে। সত্যি মোটরের মত চলে।

আত দিন ছেলেটা কাঁদে কেন মা?

ওই আবদার! কিছু খাবুনি, মুখে তুলবনি! ঝি বলে, শুনিসনি? ফল মিষ্টি, মাছ, মাংস, সব লাথি মেরে ফেলে দেয়?

স—ব ফেলে দেয়?

স—ব।

বেস্তর বড়লোক রে মা, ওজ ঝ্যাকা মুটে বাজার টানে।

বড়লোক নয়? বিশটা চাকর ঝি, বাড়িতে ঘর আঠারোখানা। জন্মোতিথি, তা ঝি চাকর-মেতরানী সব্বস্বজনকে নতুন কাপড় দিলে। ওই মায়ের মন্দিরে পুজো দিলে ছেলের ঠাকুমা, তা দুটো গাড়িতে ফলমিষ্টি ধরে না।

কুড়োন বসে বসে দেখতে লাগল। সমস্ত বাড়ি টুনি বাল্বের ঝালরে করছে। সাতটা না বাজতে গাড়ির পর গাড়ি আসতে লাগল। মস্ত একটা ভ্যান চলে এল আইসক্রীমের। কুড়োনের মা বলল, ওদের মস্ত ঘর আছে। সেথা আজ ছিনেমা দেখাবে।

বাড়ির ভেতর ছিনেমা?

ওরা রাজালোক, সব পারে।

কুড়োনের মা কচিটাকে বুকে টেনে নিয়ে দুধ দিতে শুরু করল। দুধ ওর নেই। বাচ্চাটা অভ্যেসে চোষে। মেজ মেয়েটা জন্মহাবা। সে বসে বসে লাল ফেলছে। কুড়োন মায়ের পিঠ ঘেঁষে বসল। এমন যজ্ঞবাড়ি দেখেও সুখ কত। দেখতে দেখতে কখন যে কুড়োন ঘুমিয়ে পড়ল, তা নিজেও জানে না। ফুটপাথে আরো আরো কাঙালীর ভিড়। ওরা ঠিক খবর পেয়ে যায়।

কুড়োনের ঘুম ভাঙল হট্টগোলে।

কি হল মা? বলেই কুড়োন দেখে মা নেই। হাবিটা বসে আছে, হাবির সামনে ওর ভাইটা শুয়ে চেঁচাচ্ছে।

কুড়োন ছুটে গেল। একটা সাদা, ঢাকা ভ্যানের সামনে কাঙালীদের ভিড়। তাদের মধ্যে মা-ও আছে।

দে যাও বাবু! মোদের দে যাও, সব ফেলনি।

নেংলি বুড়ীটা সমানে চেঁচাচ্ছে। সাদা পোষাক পরা লোকগুলো চ্যাঙারি চ্যাঙারি খাবার এনে ভ্যানে ফেলছে। মাছের ফ্রাই, মাংস, পোলাও, কাটলেট, বড় বড় মিষ্টি, আইসক্রীমের ঠোঙা।

দে যাও গো বাবুরা, মোরা সেই কখন থে' বসে আছি গো! দে যাও মোদের!

তিনটি সুবেশ, দীর্ঘকেশ যুবক নেমে এল। ভ্যানের লোকেদের বলল, এক দানা জিনিস ওদের দেবে না। ফুটপাত নোংরা করব না আমরা। নাউ, গো!

ওদের সরান বাবু, নইলে যাই কি করে?

এই! এই!

ছেলে তিনটি তাড়া দিতে লাগল। আরও কয়েকটি যুবক নেমে এল।

যাও, সরে যাও!

বাবু গো, এত নিষ্ঠুরতা হয়োনি!

সর্! চাপা পড়বে, ভ্যান ছাড়ছে!

নেংলিটা হঠাৎ নেচে উঠল। বলল, যেতে দেবুনি ভ্যান! মুখের গেরাস নে যাবে কেন?

কুড়োনের মা ওকে টেনে আনল। বলল, খেপেছিস তুই? চাপা পড়লে বাঁচবি?

ভ্যান স্টার্ট দিল। অসম্ভব গোলমাল শুরু হল। সরে গেল কাঙালীরা, ভ্যান চলে গেল।

কুড়োন হঠাৎ বুঝল ওর চোখে জল পড়ছে। অসম্ভব ও অক্ষম। নিষ্ফল রাগে, খিদের তাড়নায়, ওর শরীর নাড়া দিয়ে মুখে কটু ও বিস্বাদ জল উঠে এল। জলটা আঁজলায় 'থুঃ!' করে ফেলে ও ভ্যানটার দিকে ছুঁড়ে মারল। তারপর মাকেই মারতে লাগল ও, খেতে দে আক্কুসি, যগগি খাবি বলে ভিক্কেয় বেরুলি না, একন খেতে দে?

মা ওর নড়া ধরে টেনে নিয়ে চলল। কাঙালীদের গোলমাল এখনো থামেনি। হঠাৎ আলোকিত বাড়িতে কে যেন স্টিরিও চালিয়ে মাইকে রেকর্ড লাগিয়ে দিল। আর গোলমাল শোনা যাবে না।

মা কুড়োনকে বলল, কাল হতে অন্যত্তর যাব কুড়োন! শোঁসানে যাবি!

তাই যাব, খই পয়সা কুড়োব।

কুড়োন অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর এক সময়ে মা ওকে চাপাকল থেকে জল এনে দিল। গায়ে হাত রেখে বলল, জল খা, কোমরে কসিটা শক্ত করে বেঁধে নে। আমিও নিইছি। দেকবি পেট কাঁদবে না, ঘুম আসবে।

১০ দ্রব্যমূল্য

পরশুরাম একবার মাতৃহত্যা করেছিলেন, দিব্যেন্দু বার ছয়েক। একা মা-কে সে নানা রোগে ভুগিয়ে মেরেছে, মৃত্যুশয্যায় ফেলে রেখেছে, বাবাকে বারচারেক মারবার পরই ক্ষান্ত হ'তে হল, দিব্যেন্দুর দুর্ভাগ্য। ভাইবোনকে বারবার খুন করা অত সহজ হয় নি, তারা আপত্তি জানাত। ললিতাকে সবই খুলে বলল দিব্যেন্দু, 'তুমি আমার স্ত্রী, তোমার জানা উচিত।'

ললিতা বলল 'এবার কি আমার পালা?'

'উঁহু,' দিব্যেন্দু ঘাড় নাড়ল, 'যে কারণে আমার ভাইবোনকে দিয়ে

সুবিধে হয় নি, ঠিক সেইজন্যেই তুমিও ফেল করবে ললিতা।'

'বাইরে বেরোই বলে ত ?'

'হ্যাঁ, সবাইয়ের চোখের সামনে দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে যাওয়া আসা করা ত ছাড়বে না।'

'তুমি বললেই ছাড়তে পারি।'

'না না।' দিব্যেন্দু রীতিমত ভয় পেল। বলল, 'বিয়ের সঙ্গে রোমান্স গুলিয়ে ফেল না ললিতা। আমাদের প্রত্যেকটি বন্ধুই দেখে দেখে চাকরী করা মেয়ে বিয়ে করেছি'—

'ম্যারেজ অফ কনভিনিয়েন্স, তাই না ?'

'হ্যাঁ।'

'আগের রোমান্সটুকু ?'

'ভূমিকা। আসল উপন্যাস ত আমরা যে ভাবে লিখব, তাই দাঁড়াবে। তাই বলছিলাম তোমাকে মেয়েটেয়ে সুবিধে হবে না, তুমি বাইরে যাও . বাই দি বাই, তোমার হাঁটাটা একটু বদলাবে ? বড় বিশ্রী দেখায়, বড় পুরুষালি ?'

'হাঁটা বদলানো বড় কঠিন যে ? আমার দুঃখ হচ্ছে।'

'কেন ?'

'আমি হাঁটা বদলাতে পারব না, তা ছাড়া, আমার ওপর তোমার অনেক অধিকার, তবু তুমি আমাকে খুন করতে পারবে না। আমার কাছ থেকে তোমার পাওনা কতটা হবে, কতটা ফাঁকি, তাই ভাবছি।'

'আহা, আমার কাছেও ত তোমার পাবার আছে ললিতা ?'

'আছে বই কি ?'

'কিছু বললে না ?'

'না। যখন যা মনে হবে লিখে রাখব, কেমন ?'

'তোমার কি আমার কথাবার্তা খুব রুক্ষ মনে হচ্ছে ?'

'না। কথা ত তুমি ভালই বল, সুন্দর বল। তোমাকে বোধহয় সবসময়ে খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলতে হয়, তাই না ?'

'নিশ্চয়। আমাদের বন্ধুবান্ধরা, অর্থাৎ আমরা বলতে গেলে কথা বেচেই বেঁচে আছি।'

কথা বেচেও যে বেঁচে থাকা যায় তা ললিতা জানত না। কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছে, কষ্ট করে চাকরী যোগাড় করেছে, কষ্ট করেই চাকরীতেও উন্নতি করেছে। কথা বেচতে জানলে বোধহয় এত কষ্ট করতে হত না।

'ছোটবেলার লেখাপড়া বল, বাড়ীতে ভাল জামাকাপড় বাগানো বল, এই চাকরী বাগানো, এখানে ওখানে কাগজের লোককে খুশী করে লেখা ছাপানো, মাদ্রাজীকে খুশী করে মেয়ের বাংলার ট্যুইশনি বাগানো, হাস-পাতালের বিনিপয়সায় ওষুধ, আর নামমাত্র খরচে সার্টিফিকেট বাগিয়ে বাড়ী

গাড়ী ফেঁদে বসা সব কথা বেচে। তোমার কি ঘেন্না করছে আমায় ?'

'না না। ঘেন্না করলে চলবে কেন ?'

'কথা বেচা মানে আত্মাকে বেচা নয় ললিতা, নিজেকে বেচা নয়, গুলিয়ে ফেল না।'

'পাগল আর কখনো গুলিয়ে ফেলি ? কিন্তু আমাকে দিয়ে তোমার কোন কাজটা হবে তা ত বললে না ?'

'ললিতা, মানুষের দাম কত জান ? মানুষের শরীরে যে-সব কেমিক্যালস্ আছে তার প্রি-ওআর দাম হচ্ছে ছ'আনা তিন পয়সা। এই দ্রব্যমূল্যের বাজারে দাম কি উঠেছে না পড়েছে বলতে পার ?'

'বলা কঠিন।'

'বেড়েছে। আর, তোমার যা কানেকশান, তাতে সাধারণ মানুষের চেয়ে তোমার দাম অনেক অনেক বেশী। তোমায় আমি বার বার বিক্রী করব ললিতা। মা-কে যেমন বারবার মারতাম।'

'কেন মারতে বল ত ?'

'বাবা মরছেন, মা মরছেন, বললে ধারধোর পাবার সুবিধে হত ললিতা। ধার করাটাও একটা আর্ট বই কি। বালিগঞ্জে বাবাকে মারতাম, শ্যামবাজারে মা-কে, কলেজের বান্ধবীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে একটু ভাব সাব ছিল, যারা কলকাতার বাইরে থাকত, তাদের কাছে চিঠি লিখে মা- বাবার মৃত্যুর খবর দিতাম। সেইসঙ্গে জানাতাম স্বামীদের না জানিয়ে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলতে। বান্ধবীরা টাকা পাঠাতে কখনো ভোলেনি। একজনকে জানতাম রেলের এ্যাসিস্টেণ্ট পি- আর- ও-র বউ। সে হাতের বালা বেচে টাকা পাঠিয়ে জানিয়েছিল তার স্বামী কেরানী শুধু কেরানী, তাই এর চেয়ে বেশী পাঠাবার সামর্থ্য তার নেই।'

ললিতা ছোট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল, আলো নেভাল। দিব্যেন্দুকে আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাকে যেন জানতে পারিনি, এই যেন প্রথম জানছি।'

'কেমন লাগছে ?'

'ইন্‌টারেস্টিং। এবার ঘুমোলে হয় না ?'

'ঘুমোবে ? আজকে আমাদের ফুলশয্যের রাত।'

'তাও ত বটে।'

বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনতে শুনতে দিব্যেন্দুর বোন ভাবল রোমান্সের বিয়ের ধরনই আলাদা। কথা বলেই রাত পুইয়ে দিলে।

কিছুদিন বাদেই দিব্যেন্দুর স্ত্রী-ভাগ্যে ওর বন্ধুবান্ধবরা হিংসে করতে শুরু করল।

ললিতা নিজেই প্রতিপন্ন করল ও আসলে কত দামী। বাড়ী করবার লোনটা কিছুতে বের করতে পারছিল না দিব্যেন্দু। স্যাংশন হয়ে গিয়েছে,

কিন্তু বেরুতে আর চায় না।

'কথা বেচবার থিওরী খাটছে না বুঝি?'

'না ললিতা। কেরানীরা, যাদের হাতে আটকে আছে তারাও আমার মতই কথা বেচে বেচে ঘুঘু হয়ে গিয়েছে বোধ হয়।'

'তা হলে?'

'তুমি পার ললিতা, তুমি ইচ্ছে করলেই পার। তোমার বন্ধুর জামাই-বাবুটিই ওখানকার হর্তাকর্তা বিধাতা। সীতেশ খাস্তগীর।'

'যেতে বলছ? উনি কিন্তু আমায় বিয়ে করতে বারণ করেছিলেন।'

'কেন?'

'অফিসের পরীক্ষা দিয়ে হায়ার সি· এ· পড়তে বলেছিলেন।'

'বেশ ত সেই কথাটিই জুৎ করে শুনিয়ে দাও। নিজের বাড়ী থাকলে পড়তে ভাল লাগবে তোমার। একটা সিকিওরিটিও ত মানুষের চাই!'

'ওঁকে কথাটা বলতে হলে ওঁর সঙ্গে একটু ঘোরাঘুরি করতে হবে।'

'নিশ্চয় করবে!'

ললিতা আবার বলল, 'তোমায় যেন চিনেও চিনতে পারি না। তুমি আমাকে অবাক ক'রে রেখেছ। অর্থাৎ, আমি তোমায় দেখে হতবাক।'

সীতেশ খাস্তগীরের কাছ থেকে কাজটি পেতে একমিনিট মাত্র লাগল। তিনি যেমন কাজের লোক, তেমনিই জাত ভদ্রলোক। 'আমাদের বিনির বন্ধু ললিতা না? কবে বিয়ে করেছ? নিশ্চয়, টাকা পাবে বইকি!' তিনটি কথায় কাজ সেরে তিনি ললিতাকে বিদায় দিলেন।

ললিতা সেদিন অফিস ফেরত অনেকক্ষণ একা একা হাঁটল। সহকর্মী শুভ চ্যাটার্জির কথা আজ বড্ড মনে পড়ছে। কাল তাকে বলবে না কি, 'শুভ, এস আমরা একসঙ্গে হাঁটি?' কিন্তু 'ম্যারেজ অফ্ কন্‌ভিনিয়েন্স্'-এর পর তা কি বলা যায়? হঠাৎ মন খারাপ হয়ে গেল ললিতার, স্যার আশুতোষের মূর্তির পায়ের কাছে বসে কাঁদতে ইচ্ছে করল। শিক্ষা ছড়াবার জন্যে তিনি সে সময়ে ক্ষেপেছিলেন বলেই ত ললিতার বিয়েটা আজ হ-য-ব-র-ল হয়ে যেতে বসেছে।

দিব্যেন্দুর বন্ধুরা হিংসেয় নীল হয়ে গেল। যখন একসঙ্গে থাকে তখন তারা গলায় গলায়, একজন আড়াল হলেই তাকে তারা যূথবদ্ধ ভাবে আক্রমণ করে, পশুসমাজেও এমন একতা বিরল। কি নিজেদের দলের, কি বাইরের, আক্রমণ করতে হলেই তারা যূথবদ্ধ হয়।

'রিয়েলি, দিব্য!'

দিব্যেন্দু বললে, 'দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাচ্ছে। স্ত্রী বাছবার সময়ে আমি ওর কানেকশানগুলো দেখেছিলাম। প্রমাণ হয়ে গেল ওর দাম আছে।'

নতুন বাড়ীতে এসে কিন্তু দিব্যেন্দুকেও খুব খারাপ লাগল না ললিতার। ওর মা-র ইচ্ছে ছিল এ বাড়ীতেই দেহত্যাগ করেন। দিব্যেন্দু বললে 'কেন

ত্‌ন বাড়ীতে নয় কেন ? ওখানেই সুবিধে।'

ললিতা একটু হেসে বলল, 'আমার দাম যদি কমে যায় তখন আবার ওঁকে ব্যবহার করতে পারবে।'

'দাম কমে যাবে! দ্রব্যমূল্যের বাজারে দাম কমে না কি কোন কিছুর ?'

'আমার দাম আর কতদিন থাকবে বুঝতে পারছি না কিন্তু।'

ললিতা সত্যিই বিভ্রান্ত। সংসারের প্রয়োজনের কি শেষ আছে কোন ? দিব্যেন্দুর পায়ে একটা ব্যাথা হয়, 'রে' নিলে ভাল হয়, ললিতা ছুটল অফিস ফেরত তার পিসতুত দাদার বাড়ী, 'রে'-টা ধার চাই।

দিব্যেন্দুর অফিসে ইনক্রিমেণ্ট হচ্ছে না, পরোক্ষ 'বস্'টি ললিতার দিদির শ্বশুর। ট্রেনের পাস চাই, ললিতার সেজদির বন্ধুর ভগ্নীপতিকে ধরতে হবে, আজ তেল পাওয়া যায় না, কাল চাল, পরশু কয়লা, সবতাতেই ললিতা ভাণ্ডারী, কলকাতার পরিসরটি ললিতার আত্মীয় স্বজন চেনাশোনায় ঠাসা।

শুভ চ্যাটার্জি একদিন বলল, 'ললিতা, নিজেকে একটু দাম দিতে শেখ।'

'কি রকম ?'

'বড্ড বেশী নামিয়েছ নিজেকে। রিয়ালি, দিব্যেন্দুবাবুর ঐ সাতটাকা ইনক্রিমেণ্টের জন্যে কি এসে যাচ্ছিল ? তুমি সেটা আদায় করবার জন্যে শ্বশুরায়ের কাছে অতদিন ঘুরলে কেন ? এখন তোমায় দেখলেই ভয় করে, না জানি কি কাজের কথা বলে বসবে।'

ললিতা করুণ হাসল। ঠিক এই কথাটাই এখন সে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের কাছে শোনে।

'শুভ, তুমি কি অফিসার হচ্ছ ?'

'হওয়া উচিত। সবগুলো পরীক্ষাতেই পাস করেছি। শুধু তোমার কাছেই ফেল করে গেলাম। অথচ, আর কিছু পারি না পারি, দিব্যেন্দুর মত তোমায় চারদিকে ছুট করাতাম না। কথা, শুধু কথা দেখেই তুমি...'

'বাঃ, ও কথা বেচে যে ?'

'নিজেকে বেচে বল।'

'কথা বেচা মানে নিজেকে বেচা নয়।'

'দিব্যেন্দুর কথাগুলি তোমার মুখে ঠিক মানায় না ললিতা।'

ললিতা কাজ করতে লাগল।

'একটা কাজ করবে ললিতা ?'

'কি ?'

'সব ভুলে গিয়ে পরীক্ষাটা দেবে ?'

'কেন বল ত ?'

'খুব লক্ষ্মী আর শান্ত মেয়ে হয়ে পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। অফিসের আর দুটো ব্রাঞ্চ হচ্ছে শীগ্‌গিরই, অফিসার ক্যাডারে তোমার যাবার সুযোগ আছে।'

সেদিনও ললিতা একা একা হাঁটতে লাগল। অফিসার হবে! ঠিক অফিসার

হবার জন্যে নয়, কোন একটা কাজে ডুবে যেতে ভয়ানক ইচ্ছে হচ্ছে তার। খুব পড়াশুনো করে, সিনিয়ার সি. এ. টা দিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু নিজেকে বড্ড বেশী খরচ করে ফেলেছে সে। বাপের বাড়ীর লোকজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই তাকে বড় সস্তা মনে করতে শুরু করছে, দিব্যেন্দুকে মনে করছে সুবিধেবাদী। আসলে তাকে দিয়ে নানারকম কাজ করবে বলে দিব্যেন্দু তাকে প্রতিটি জায়গায় ছুট করিয়েছে, তার প্রতিটি জানা জায়গায়।

হাঁটতে হাঁটতে আবার ললিতার কান্না পেতে লাগল। এতরকম লোকের সঙ্গে তার চেনাজানা. সে-শুধু সম্ভব হয়েছে ললিতা কাউকে কোন অনুরোধ-উপরোধ করত না বলেই। সব জায়গায় কি শুধু চাকরীর তদ্বির, ইন্‌ক্রিমেণ্টের তদ্বির, সিমেণ্টের সুবিধে, দার্জিলিঙে বিনেপয়সায় বাড়ী পাবার সুবিধে এইসব নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করে? কোন কোন জায়গা আছে যেখানে শুধু বসে থাকতে, দুটো একটা কথা বলতে কত ভাল লাগে। দিব্যেন্দু বা তার বন্ধুরা এ-সব কথা বুঝবেই না। ওদের বউরা স্বামীদের এবং নিজেদের সুবিধের জন্যে সব জায়গায় যায়, সকলের সঙ্গে ঘোরে, যদিও, নিজেকে অমন নিঃশেষে বিকিয়ে, বিনিময়ে একটা ভাল পেলেও নিজের কাছে নিজের লজ্জা ঢাকে কি করে তা ললিতার জানা নেই। এখনো একটিই জায়গা আছে, শুভ আছে। শুভ এতদিন বড়সড় কিছু হয়নি, তাই দিব্যেন্দু ওকে আমল দেয়নি। কিন্তু শুভ যখন অফিসার হবে? ভয়ানক মন খারাপ হয়ে গেল ললিতার, তারপর কি হবে?

এরই মধ্যে দিব্যেন্দুর হঠাৎ ইচ্ছে হল, তাদের চারবছরের পুরনো বিয়েটার একটা বার্ষিকী করে ফেলা যাক। ইতিমধ্যে মা গত হয়েছেন। বাবা আগেই গিয়েছিলেন। দিব্যেন্দুর ভাইবোনেরা সবাই ওর ওপর কেন কে জানে হাড়চটা। দিব্যেন্দু বলল, 'তুমি তো এখন সকলকে জেলাস্ করে তুলেছ। সব তোমার মত একটি স্ত্রী অ্যাকোয়ার করতে ব্যস্ত।'

'সে আর কঠিন কি! আগে খোঁজ নিতে হবে কোন্ মেয়ে কোন্ অফি কাজ করে, কার চাকরীর প্রস্‌পেক্ট কি রকম। তারপর দেখতে হবে কত প্রভা শালী আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব আছে। তার পরই ঝাঁপিয়ে পড়া!'

দিব্যেন্দু তর্জনী তুলে হাসতে লাগল, 'ঠাট্টা হচ্ছে! দুষ্টু মেয়ে? তা ছা আমাদের ভালবাসা? অ্যাপ্রোচটা ক্যালকুলেটেড ছিল অস্বীকার করব ন কিন্তু এখন যে ভালবাসাটাই আমাদের মধ্যে বড় তা কি তুমি জান না?'

'তুমি জানলেই হল।' ললিতা মিষ্টি হাসল।

'বিয়ের তারিখে তুমি আমার কাছে কিছু চাইবে না?'

'না। আমি ত এ পর্যন্ত আমার কোন দাবিই জানাই নি।'

'না চাইতেই ত আমি সব দিয়েছি তোমায়। আমার ভালবাসা, একটা সু বাড়ী, ছোট্ট সংসার।'

'দিয়েছই ত?'

বিবাহবার্ষিকীতে দিব্যেন্দুর বন্ধুবান্ধবরা সবাই এল। ওরা সকলেই বয়সে তরুণ। দিব্যেন্দুর মতই জীবনদর্শন তাদের, একই লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল।

'দিব্যেন্দুর মত আমরা সবাই লাকি নই।' শৈবাল ভারী গলায় বললে। একটু মোটা, ফর্সা, চকচকে চেহারা তার। তারপর অমলের বউ করবীর হাত ধরে ও-পাশে নিয়ে গিয়ে কি বোঝাতে লাগল। করবী আগে প্রণয় ভুগত, মাঝে ভুগত প্রেমে, এখন ভোগে উছলায়। একটি না একটি রোগে ভুগলে কি হয়, সে বড় চাকরী বাগাবার পর অমলের অবস্থা ফিরে গেছে। ললিতা শুনতে পেল সে শৈবালকে বলছে,'হোআই ডু ইউ কন্ডেম্ জেনিফার ? দেহ বিক্রী করা মানে নিজেকে বেচা নয়।'

শুনে চা ঢালতে ঢালতে ললিতা চমকে উঠল। দিব্যেন্দুর মত কথা, দিব্যেন্দুরই কথা।

মুখ তুলে দেখল ঘরে কয়েকটি ছেলে, কয়েকটি মেয়ে। তাদের যা বয়স, এ বয়সেই সবাই আদর্শের জন্য ত্যাগ করে. নিঃস্বার্থ হয়, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে।

'আমরা সবাই জীবনের জ্বরে ভুগছি।' কানের পাশে অমল চেঁচিয়ে বলল। ললিতার মনে হল সত্যিই এরা সবাই জ্বরে ভুগছে। সবাই পেপার ব্যাক বই পড়ছে, চালু ছবি দেখছে। 'এতদিনে আমরা বাংলাদেশ আঁতেলেক-চুয়াল জলবাতাস আনলাম', শৈবাল গালে মাংসের চপ পুরে বলল।

অন্য জীবন, অন্য বৃত্ত ওদের, সব গ্রহ এক পথে ফেরে না। ললিতা চায়ে চিনি দিয়েই চলল, নাড়তেই লাগল। এরা এখনো রাতে মদ খেয়ে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে ফুসফুস করে নোংরা কথা বলে। অথচ কি সুন্দর চেহারা স্বাস্থ্য! ওরা যার সঙ্গে মতে মেলে না, তাকে মারধোর করতেও পশ্চাৎপদ হয় না। দেহ বেচা মানে নিজেকে বেচা নয়, মেয়েরা বলে। কথা বেচা মানে নিজেকে বেচা নয়, ছেলেরা বলে।

'ভবিষ্যতে আমরাই থাকব, আর কেউ থাকবে না', দিব্যেন্দু ঘুষি মেরে বলল। চা-এ কি নেশাও হয় না কি ? ম্যাথামেটিক্স অনার্সের ছাত্রী ললিতা ভেবে পেল না। আসলে ওদের বড় অ্যাবসার্ড দেখাচ্ছে। ললিতার ইচ্ছে হল ওদের চোখের সামনে হাততালি দিয়ে বলে, 'এই, বাঘকে ভয় পাও ?' অথবা হাতের ওপর দেশলাইয়ের কৌটা নাচায়, কিংবা দেওয়ালে আঙুল নাচিয়ে দেয়ালের মুখের ছায়া ফেলে। কোথায় যেন পড়েছিল কোন নামকরা লোক, আইনস্টাইনই হবেন, জ্ঞানীগুণীদের সভায় গিয়ে ছুরিকাঁটার ওপর মটরদানা নাচিয়ে আর দেশলাই কাঠির ম্যাজিক দেখিয়ে চলে এসেছিলেন।

কিন্তু ওরা কি নিয়ে এমন ক্ষেপে উঠল ? 'ললিতা!' দিব্যেন্দু বাঘের মত ঝাঁপিয়ে এল, 'শুনেছ ? শুভ চাড়ুজ্জে হ্যাজ কিক্ড দ্য বাকেট!' উত্তেজনার বশে মুখ থেকে 'চাড়ুজ্জে' বেরোল তার।

'সে কি ? শুভ মারা গেছে ?'

'না না, কি যে বল', দিব্যেন্দু হ্যা হ্যা করে হাসল। 'তুমি বড় লিটেরালি কথা ধর। আমি বলতে যাচ্ছিলাম শুভ সকলকে কাঁচকলা দেখিয়ে সি আই. টি-তে বড় পোস্ট বাগিয়েছে। এবার দেখে নিও শৈবাল, ললিতা দিব্যি একটি সস্তার ফ্ল্যাট বাগিয়ে আসবে। এ বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে আমরা সেখানে চলে যাব, দেখে নিও !'

এতদিনে ললিতার আবার কান্না পেল। শুভ, তুমি আমার এই করলে ? শুভ, তোমার আমার মধ্যে আর কিছু নেই, স্ফটিকের মত পরিষ্কার বন্ধুত্ব। কিন্তু বন্ধুত্ব বড় দামী জিনিস, বড় আরামের. এখন তুমি উপরে উঠে গেলে, দিব্যেন্দু আমাকে তোমার কাছে ছুট করিয়ে ছাড়বে।

'ডার্লিং, কাঁদছ কেন ?' করবী মাথায় টকটকে সিঁদুর, কপালের ফোঁটা, চোখের চশমা আর হাতের লম্বা লম্বা নোখ নিয়ে ললিতার সামনে এসে দাঁড়াল। ছাতের সিলিং-এর দিকে চোখ তুলে বলল, 'ইউ মেক মি ট্রুলি ট্রুলি জেলাস।'

অফিসে গিয়ে শুভকে কথা শোনাবে ভেবেছিল ললিতা, কিন্তু শুভর হাসিভরা মুখ দেখে ওর মন খুশী হয়ে গেল। ডিপার্টমেন্টে সবাই মিলে ফেয়ারওয়েল দিলে শুভকে। লুচি, আলুরদম আর মিষ্টি খেয়ে, গলায় মালা পরে শুভ হাসি ভরা মুখে ললিতাকে বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু মাইন্ড মী! পরীক্ষাটা দিও।'

'দেব।'

'আমার অফিসে এস ললিতা।'

'আসব। এবার বিয়ে ক'রে ফেল।'

'করবই ত। সব ঠিকঠাক করে ফেলেছি। মার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি।'

খুব আনন্দ হল ললিতার। বলল, 'খুব ভাল হবে। তোমার মত লক্ষ্মী ছেলেকে যে বিয়ে করবে তার ত ভাগ্য।'

শুভ হেসে বলল, 'এই জন্যেই তোমায় ভালবাসি ললিতা। তুমি ছাড় আর কোনো মেয়ের সঙ্গে এমন পরিষ্কার বন্ধুত্ব হতে পারত বল ? কে এমন চমৎকার উপদেশ দিত ?'

শুভ চলে গেলে কি হবে, দিব্যেন্দু ওদিকে ধীরে ধীরে বাঘ হয়ে উঠল প্রথমে নেহাত বাঘ ডাঁশা। তারপর চিতাবাঘ এবং শেষে 'হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর', হয়ে ললিতাকে শাসাতে লাগল 'যাও শুভর কাছে যাও যাও, শুভর কাছে যাও। একটি ফ্ল্যাট চাই আমাদের, একটি ফ্ল্যাট, এ-বাড়িট ভাড়া দেব, ফ্ল্যাটে থাকব ললিতা।'

ললিতা একদিন শুভকে টেলিফোনে বলল, 'যদি কখনো শুনি অনুরোধ উপরোধে কোন অযোগ্য লোককে বাড়ীটাড়ী দিচ্ছ...!'

'না ললিতা। আমি ইন্‌কোরাপটিব্‌লই থাকব।'

কিন্তু দিব্যেন্দু ইন্‌ফ্লেক্‌সিব্‌ল। চাই চাই, তার ফ্ল্যাট চাই। শুভ ললিতা

বন্ধু, সেই জন্যেই চাই। সব চাই তার, দ্রব্যমূল্যের দিনে এ বাড়ি ভাড়া দিলে টাকা আসবে, সস্তার ফ্ল্যাটের সুবিধে কত, সেই জন্যেই চাই। যদি কোথাও কোন সুবিধের ব্যবস্থা রচিত হয়ে থাকে, তবে সেটা দিব্যেন্দুর চাই-ই চাই। যাও ললিতা, যাও, দিব্যেন্দু ছন্দে ছন্দে গাইতে লাগল, তোমার পুরনো বন্ধুর কাছে যাও, যে প্রণয়ী হতে পারত তার কাছে যাও। লাভ নেভার ডাইজ্ ললিতা, শুভ তোমার কথা শুনবে। ললিতা শুভর কাছে গেল।

'হোআট মেক্স ইউ থিংক্ আমি তোমায় ফ্ল্যাট দেব?'

'তোমার কাছে আমার দাম নেই শুভ?'

'একটু আগেও ছিল, এখন নিল্। ললিতা, মানুষ এখন ভীষণ সস্তা, সবচেয়ে সস্তা, হিউম্যান বীয়িংস্ হ্যাভ নো ভ্যালু অ্যাজ এ কমোডিটি। নিজের আচরণে, ব্যবহারে মানুষ নিজেকে মূল্যবান করতে পারে। এখন, এই ইন্-ফ্লেশানের দিনে, তুমি নিজেকে বস্তু খেলো করেছ। শোননি, যুদ্ধের পর ইউরোপে একবস্তা নোট দিয়েও অনেক দেশে এক টুকরো সাবান মিলত না?'

ললিতা হাসল। বলল 'শুভ, তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিলে। আমি সত্যি সত্যি ফ্ল্যাট চাই না। তোমাকে কন্‌গ্র্যাচুলেশ্যন্স জানাতে এসেছিলাম। বিয়েটাকে সাক্সেস্ কোর। শুভেচ্ছা রাখলাম।'

দিব্যেন্দু বাড়ী ফিরে এসে দেখল, ললিতা নেই। ললিতা চলে গিয়েছে।

ললিতার জামা কাপড়, বই পত্তর, কিছু নিয়েছে, কিছু ফেলে গেছে। যেন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি যা পেয়েছে তাই নিয়েই পালিয়েছে। দিব্যেন্দুর নামে একটা মস্ত কাগজে কয়েকটা কথা লিখে রেখে গিয়েছে।

"ম্যারেজ অফ কন্‌ভিনিয়েন্স থেকে কোন কিছু চাই নি। আজ মুক্তি চাই, এবং মুক্তি আমার পাওনা হয়েছে মনে জেনেই চলে যাচ্ছি। আমাকে খোঁজবার চেষ্টায় কোনরকম আতিশয্য কোর না। আমি সি. এ. পড়ে কেরিয়ার করতে চললাম।

দুটো কথা তোমার জানা ছিল না, জানিয়ে যাই। কথা বেচা মানে নিজেকেও বেচা। এত কথা বেচেছ তুমি, যে তোমার মধ্যে আর তুমি বলে কিছুই নেই। উই আর কম্‌প্লিটলি সোল্ড আউট।

আর একটা কথা। দ্রব্যমূল্য বাড়া মানে ইন্‌ফ্লেশান। মূল্যস্ফীতি, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কিছু কিছু জিনিস দাম হারায়। এইমাত্র জেনেছি আমার বর্তমানে কোন দাম নেই, এবং তোমার কাছে আমি অচল। মানুষের দামের ইকনমিক্স তুমি জানতে না। ললিতা॥"

১১ হেলেনমাসীর কাকা

হেলেনমাসীর নাম রেখেছিলেন ওঁদের পিসীমা। হেলেনমাসীদের বাবা নাকি সুবিধের লোক ছিলেন না। পরিবারের যেদিকে তাকাও সবাই কেমন ভালো। সক্কলকে দেখে চেনা যায় ওঁদের বাড়ি এঁড়েদহ কিংবা পেনেটি। সব ছেলেরা বাঁদিকে সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ে, শার্ট আর জুতো পরে আঠারো বছর বয়স হলেই জেমসন কোম্পানীতে চাকরি করতে যায়। প্রত্যেকটি মেয়ে লক্ষ্মী, শান্ত, গোছানো। সত্যি বলতে কি, জেমসন কোম্পানীতে হিসেব নিয়ে যখন দেখা গিয়েছিল তিনশো কেরানীর মধ্যে দু'শো একুশজনই মুখুজ্জেবাড়ির ছেলে, সায়েব খুশী হয়ে ওদের জন্যে একটা টিফিন হল করে দিয়েছিল।

কিন্তু হেলেনমাসীদের বাবা ও-বাড়ির দুশো একুশজন প্রহ্লাদের মধ্যে একমাত্র দৈত্য ছিলেন। জুতোমোজা পরে থিয়েটারে বেহালা বাজাতেন আর মাসপয়লায় জেমসন কোম্পানীতে এসে মুখুজ্জেদের টিফিনঘরে গিয়ে দুটো দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফুসফুস করে শিস দিতেন—

'প্রেমসাগরে বোট ভাসিয়ে বাইছিল দাঁড় দুইজনে !'

তখনকার দিনের হিট গান। মুখুজ্জেরা সবাই হেলেনমাসীর বাবাকে দু'চার টাকা দিয়ে দিতেন চটপট আর আড়ালে মাথা নেড়ে বলতেন 'বংশের কলঙ্ক একটা।' হেলেনমাসীর বাবা যখন মরে গেলেন তখন সবাই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

হেলেনমাসীর পিসীমা ভীষণ কড়াকড়ির মধ্যে মানুষ করতে লাগলেন ভাইঝি-কে। নিজে বিয়ে করেননি, ইস্কুলেও পড়াতেন না, কিন্তু কেমন করে চালাতেন কে জানে। সব কাজ দুজনে নিজের হাতে করতেন, এমন কি বাড়ি মেরামত অব্দি। পাড়ার ছেলেপিলের সাইকেলের টিউব ফুটো বা টায়ার পাংচার হলে হেলেনমাসীই সেরে দিতেন। ঘড়ি, কলম, স্টোভ মেরামত, ছোটখাটো আসবাব তৈরী, সব নিজেরা করতেন।

অথচ, এদিকে, যাকে বলে 'মেয়েমদ্দা' তা মোটেও ছিলেন না। দুজনেই, যাকে বলে আদর্শ হিন্দু নারী, তাই-ই ছিলেন। হেলেনমাসীর পিসীমা সকালবেলা দাঁতন হাতে পার্কে যেতেন অবিশ্যি, কিন্তু তাতে আর কি করা যায়! রানীভবানী যে দাঁতন করতেন না, বা অহল্যাবাই রোজ দশ মাইল হাঁটতেন না তার কোন প্রমাণ আছে?

সবাই ভালবাসত ওঁদের, পাড়া-প্রতিবেশী মুখুজ্জেদের দশদিকে যারা আছে। প্রত্যেকটি বড় বড় বাড়িতে ওঁদের যাতায়াত ছিল। ডোমডোকলার মত যেতেন না কোথাও, মস্ত বড় নতুন কাঁসার থালায় বড় বড় 'আবার খাব'

সন্দেশ সাজিয়ে নিয়ে লৌকিকতা করতে যেতেন। পইতের ব্রতভিক্ষের বল আর বিয়ে-মুখেভাত-সাধ-বৌভাতে বস্ত্র, ঝনঝনে রুপোর টাকা দিয়ে সামাজিকতা করতেন। সব চেয়ে বড় কথা কি, মুখুজ্জেদের কারো কাছ থেকে কখনো চারটি পয়সা সাহায্য নিতেন না।

কেউ সাহায্যও করত না, পিসী-ভাইঝি কাজকর্মও করতেন না, অথচ কি ভালো জামাকাপড় পরতেন ওঁরা, ধবধবে সাদা কাপড়-জামা, কানে এত বড় কানপাশা, গলায় চওড়া বিছেহার। যারা অবিশ্বাসী, যেমন পাড়ার ঘণ্টুর মা, তারা বলত 'বাইরে চেকনচাকন ভেতরে খড়পোরা'।

বলত ওঁরা নাকি আসলে একফোঁটা তেলে ডালসম্বরা দেন, আর সুঁটকি চিংড়ীমাছের আজকে মুড়োটা কালকে ন্যাজাটা খান। বলত, পিসীমা নাকি ছাতে গিয়ে গুলতি দিয়ে পায়রা মেরে রসুন দিয়ে কারী রাঁধেন।

কিন্তু এইসব অবিশ্বাসীরাই হঠাৎ ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখতে পেয়েছিল পিসী-ভাইঝি সাদা পাথরের টেবিলে খেতে বসেছেন। চোখ বড় বড় করে দেখেছিল সবুজ ধনেপাতা দিয়ে এত বড় বড় চাঁদামাছের তেলঝাল, ঘি-চপচপে মটরডালে কাঁঠালবীচি-ডাঁটা-ঝিঙে আর রাঙাআলু, তা ছাড়া ডিম-পোরা বড় বড় ট্যাংরামাছের উপকারী টলটলে ঝোল। ঘণ্টুর মা, গৌরীর মাসীমা, আরো যত সব বিশ্বনিন্দুকেরা ছিল সেদিন থেকে সবাই চুপচাপ।

'কেমন করে চলে? কে সব চালায়?'

এ প্রশ্ন কোন বোকার বোকা তস্য বোকাও করত না। কেননা সবাই জানত ওদের যথাসর্বস্ব খরচ বুচুকাকা চালায়।

বুচুকাকা কে?

তা মুখুজ্জেরাও সবাই জানত না। হ্যাঁ, ছিল বটে হেলেনমাসীর বাবার একটা ভাই, তা সে যদি না বেঁচে থাকে, তবে মরে গিয়েছে নিশ্চয় আর যদি পটল না তুলে থাকে তাহলে এখনো বেঁচে আছে, এই ছিল মুখুজ্জেদের সোজা হিসেব।

বেঁচে আছে না মরে গেছে তা জানা যাবে কি করে জিজ্ঞেস করলে পিসীমার জ্যাঠামশায় বলতেন, 'ঐ তো দুটো ভাই, বোঁচকা আর পোঁটলা। পোঁটলাটা ভ্যায়নক বজ্জাত ছিল খালি ব্যায়লা বাজাত। বোঁচকাটাকে তো জানতুম পোঁটলাই চচ, থেটারে নাচ শেখাবি চ, বলে লাহোর না কোথায় ভাগিয়ে নে' গেছল। আমি তো ভেবেছিলুম দু'ভাই এখন একঠাঁই হয়েছে, কিন্তু বোঁচকা তো দেখছি মরেনি! ঝুণ্টু আর হেলেনকে নাকি মাসে মাসে টাকা পাঠায়।'

পিসীমা যদ্দিন বেঁচে ছিলেন তদ্দিন বলতেন 'বুচুদা আছে বলে বেঁচে আছি। নইলে হয়তো, বলা যায় না, কাজকম্ম করতে হত। হেলেনকে কি আর মনের মত করে মানুষ করতে পারতাম?'

হেলেনমাসীর বিয়ের কথা তুললেই শুধু পিসীমা কড়িকাঠের দিকে চেয়ে

গম্ভীর হয়ে যেতেন। তারপর আস্তে আস্তে বলতেন, 'ও এখনো অঘোরকে ভুলতে পারেনি।'

'ভুলবে কি করে পিসীমা? অঘোর বরাট তো এখনো হপ্তায় তিনদিন আসে।'

'আসে, সভ্যভাবে আসে। জামাই হবে এ আশা নিয়ে যে আসে না সে কথা সবাই জানে। আসে, আমাকে বলে পিসীমা কেমন আছেন? আমি বলি ভাল। তারপর ওতে-আমাতে এক ঘণ্টা তাস খেলি। এক কাপ চা আর একটা পান খেয়ে অঘোর চলে যায়।'

সবাই এ-ওর দিকে চাইত।

'এখন বিয়ে হলে হয় না?'

'না। হেলেনের সাপ কথা। অঘোর আসুক, অঘোর যাক, ওর আপত্তি নেই। কিন্তু সেই যে অপমান, সে অপমান ভুলতে পারেনি। মুখুজ্জেদের রক্ত যতক্ষণ গায়ে আছে ততক্ষণ ভোলা সম্ভব নয়।'

অথচ, এমন নয় যে এর পেছনে কোন মস্ত রোমান্স ছিল। অঘোর বরাট যখন বড় দারোগা হননি, নেহাৎই পুঁচকে এস. আই. তখন নাকি পোঁটলাবাবুকে থানায় পুরেছিলেন। পোঁটলাবাবুর তখন দারুণ বাজার গরম। থিয়েটার চলছে, 'প্রেমসাগরের বোট ভাসিয়ে বাইছিল দাঁড় দুইজনে' বাজাবার লোক আর কেউ নেই।

এদিকে মুখুজ্জে পরিবারের মাথা কাটা যায়। ডান দিকে সিঁথি—পকেটে গোলাপী রুমাল—পায়ে সিল্কের মোজা আর জুতো—বগলে বেহালা এবং পুলিসের সঙ্গে মাঝরাতে চোর-চোর খেলা, এর প্রত্যেকটিই খারাপ জিনিস।

যার মধ্যে এর সব ক'টি আছে সে যদি বাড়ির ছেলে হয় তাহলে অবস্থা আরো খারাপ। অতএব সবাই এসেছিলেন ওঁরা, পোঁটলা মুখুজ্জেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। থানার বাইরে এক পরিবারের পঁচাত্তর আশীজন লোক দেখে অঘোর বরাটের নাকি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছিল।

আর, হেলেনমাসীর সঙ্গে বিয়ের কথা যখন হয়, তখন নাকি অঘোর বরাট বলেছিলেন, 'আমার বেতন একশো পঁচিশ, বাড়িভাড়া পাই চল্লিশ টাকা, দেশ থেকে খোরাকি চালটা আনি, বছরে হাজার টাকার ধান বেচে থাকি। এই আমার যথাসর্বস্ব।

'অহো! ব্রাভো! চমৎকার!' বলে পোঁটলা মুখুজ্জে চেঁচিয়েছিলেন।

কিন্তু অঘোর বরাট বলেছিলেন, 'আশীজন শ্বশুর, নব্বইজন শাশুড়ি, দেড়শো শালা আর একান্নজন শালীকে স্রেফ একটা করে বাতাসা অব্দি খাওয়াতে গেলে ফতুর হয়ে যাব। আমায় মাপ করবেন সার, একটা আর্মিকে কি বিয়ে করা যায়? আপনাকে যদি বলি মাগুরা সাবডিভসনের পুলিস ডিপার্টমেণ্টকে বিয়ে করুন আপনি কি করবেন? না না, মেয়ের বয়স মোটে বারো বছর যখন, তখন সময় পাবেন, দেখেশুনে বিয়ে দিন।'

হেলেনমাসী বারো বছর বয়সের সে অপমান ভুলতে পারেননি। সেই-জন্যেই আর বিয়েটিয়ে আর করলেন না। তারপর কতদিন কেটে গেল। অঘোরবরাট ছোট দারোগা থেকে সেজ-মেজ-বড় দারোগা হয়ে এই সেদিন ঠিক করেছেন পেনশন নিয়ে নেবেন। হেলেনমাসীর বয়স এখন আটচল্লিশ, অঘোর বরাটের বয়স আসলে সাতান্ন। অঘোর বরাটের আজকাল প্রায়ই মনে হয় শরীর ভাল যাচ্ছে না।

মাইকের গান শুনলে রাগ হয়, ছেলেপিলেকে ঘুড়ি ওড়াতে দেখলে মনে হয় কান টেনে ছিঁড়ে দিই। পাড়ার ডাক্তারবাবু সেদিন গোঁয়ারের মত ক্রিকেট নিয়ে যা-তা বলছিলেন বলে হঠাৎ অঘোরবাবু বলে বসলেন, ইডিয়ট। ইলিশ মাছ এত ভালবাসতেন, আজকাল ইলিশ মাছের ছবি দেখলেও মনে হয় পেট গরম হবে, কানের পেছনে আমবাত বেরুবে।

'আপনার বয়স হচ্ছে।' ডাক্তারবাবুই বললেন। ডাক্তারবাবু আগে অসম্ভব রাগী ছিলেন, রিকশাওআলাদের অব্দি মারতেন। কিন্তু কোন একটা আশ্রমে দীক্ষা নেবার পর জপ করে করে ওঁর রাগ পড়ে গেছে। তা ছাড়া সব সময়ে কি সুন্দর হাসি-হাসি মুখ ওঁর আজকাল। "মিত্রবাবু, আপনি আর বেশী-দিন বাঁচবেন না!" এ কথাটা অব্দি কি মিষ্টি করে বললেন সেদিন। মিত্রবাবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত বোঝেননি কি কথা হচ্ছে।

'সে তো হচ্ছেই।'

'এখন একটা বিয়ে করা দরকার।'

'এখন!'

'এখন। যখন অল্প বয়স ছিল তখন ঝিনাইদ টু মাগুরা—মাগুরা টু বনগাঁ আপনি লাফিয়ে চলে যেতে পারতেন, এখন পারেন? আগে নেমন্তন্ন বাড়িতে চল্লিশখানা দাগামাছ খেতেন, এখন পারেন? এখন আপনার একটি দেখাশোনার লোক দরকার।'

'লোক!'

'মানে স্ত্রীলোক!'

'মেয়েছেলে? সে কি মশায়, এ আপনি কি বলছেন?'

'বিয়ে করতে বলছি।'

'আমাকে কে বিয়ে করবে?'

ডাক্তারবাবুর হাসির নাম ঝোপেঝাপে নেকড়ে। সম্ভবত গোঁপের জন্যে, সম্ভবত দাঁতের জন্যে।

'হেলেনের পিসীমা বিগত হয়েছেন।'

'হ্যাঁ।'

'হেলেন এখন একা?'

'হ্যাঁ।'

'অবিশ্যি ওর বড়কাকা আছেন।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন ?'

'দেখুন ! আমি আপনাকে ডাক্তার হিসেবে বলছি, হেলেনের এখন জীবনের সেই সময়, যখন কোন কাকা, কোন পিসে বা মেসোর স্নেহ আর যথেষ্ট হতে পারে না।'

অঘোর বরাট আয়নায় দেখতে পেলেন শার্টের ফাঁকে ও'র বুকে ঘন লোম, চুলের ফাঁকে খুস্কি। হেলেনমাসীকে উনি কেমন করে স্নেহ জানাতে যাবেন ?

'তা ছাড়া, বিবেকবান ও ন্যায়পরায়ণ দারোগা হিসাবে আপনার সুনাম আছে। আপনিই বলুন, ও যে বিয়ে করেনি সেজন্যে কি আপনিই দায়ী নন ?

অঘোর বরাটের বার বার পোটলা মুখুজ্জের জুতোমোজা আর 'প্রেমসাগরে বোট ভাসিয়ে বাইছিল দাঁড় দুইজনে !' গানটি মনে পড়তে লাগল। তবু উনি হেলেনমাসীর কাছে গেলেন। ঠিক সন্ধ্যেবেলা।

হেলেনমাসী শুধু বললেন, 'বুচুকাকাই আমায় দেখবেন !'

অঘোর বরাট বললেন, 'হেলেন, এখন কি আর পিসে-কাকার স্নেহ তোমার কাছে যথেষ্ট হতে পারে ?'

'আমার আর কে আছে বলুন ?' হেলেনমাসী দোর বন্ধ করে দিলেন।

এতেই অঘোর বরাট নিরস্ত হবার পাত্র নন। আবার আসতেন তিনি, আবার বলতেন, কিন্তু আবার সেইরকম চুরি শুরু হল পাড়ায়। খুব দামী গয়না অথবা অন্য কিছু। যা চেনাজানা আত্মীয় ছাড়া কেউ নিতে পারে না, আর কেচ্ছা হবে বলে কেউ পুলিসকে জানাতে চায় না।

আগে এ ধরনের চুরি এ পাড়ায় হয়েছে। তবে ক্বচিৎ-কদাচ। বছরে একবার। পাড়ার দুর্গাপুজোর ভোগ তখন কামদাউকিলের বাড়ি রান্না হত। সেইখানে মেয়েমজলিশ থেকে উকিলগিন্নীর নেকলেশ চুরির কথাটা অঘোর বরাটের মনে আছে।

এবার চুরি হল ডাক্তার স্বামীর বাড়িতে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ডাক্তার। কলকাতারই বাসিন্দে হয়ে গিয়েছেন বলা চলে। মিসেস স্বামীর ননদ সংসার দেখেন। দারুণ মজলিশী মহিলা।

ও'রই হীরের কানফুল আর কোমরের সোনার পাত চুরি হয়ে গেল, সেই সঙ্গে ছোট্ট একটা ঘড়ি। টুং টুং করে সুর বাজে, জাপানী ঘড়ি। ডাক্তার স্বামীর আনা।

অঘোর বরাট কয়েকদিন ধরে ও'দের নার্সিং হোমের চাকরবাকর-ড্রাইভার-নার্স সবাইকে খোঁচাখুঁচি করলেন। এ পর্যন্ত, গত দশ বছরে হয়তো সাত-আটটা চুরি হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকটাকেই ঘরের লোকের কাজ বলা চলে। ডাক্তার স্বামীরা তো তবু পুলিসকে ডাকলেন। সবাই তো পুলিসকে খবর অব্দি দিতে চায় না।

চোরের খোঁজ করতে করতে হয়রান হয়ে গেলেন অঘোর বরাট। অবশেষে সেদিন সন্ধ্যেবেলা ক্লান্ত হয়ে হেলেনমাসীর বাড়ি গেলেন। বিয়ের আশা

নেই, পিসীমা নেই যে তাস খেলবেন, খানিকটা যেন অভ্যেসের বশেই গেলেন।

হেলেনমাসী মুখোমুখি বসে চা ঢেলে দিচ্ছেন।

'হেলেন, আমি রিটায়ার করছি।'

'শুনেছি।'

'চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'দেখি কোথায় যাই। তুমি তো আমায় বিয়ে করলে না।'

'এখন ওসব কথা ভুলে যাওয়াই ভালো।'

'হয়তো তাই-ই ঠিক।' জীবনে এই প্রথম, ছপটি-লাঠি ভুলে ফেলে রেখে অঘোর বরাট উঠে গেলেন। পুলিসের লোক হলে কি হয়, ছোটবেলা যাত্রা করতেন তো! ছপটি-লাঠি তরোয়ালের মতই বাঁই বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে ঘোরাতে দুষ্টু লোকদের শায়েস্তা করতে পারেন অঘোর বরাট।

ছপটি-লাঠিটার জন্যে ফিরে এলেন বলেই হেলেনমাসীর সঙ্গে ওঁর বিয়েটা হতে পারল।

ফিরে এসে দরজায় কান পাততে না পাততে উনি ডাক্তার স্বামীর ঘড়িটার জাপানী বাজনা শুনতে পেয়েছিলেন। চেনা বাজনা, ভুল হবার কথা নয়।

'হেলেন!' বলে ঝাঁপ দিয়ে অঘোরবাবু দেওয়াল-আলমারি খুলে ফেলেছিলেন। হেলেনমাসী ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। কাঁদবারই কথা। হেলেনমাসী একটু বেশী নরম-সরম তো!

'হেলেন!' অঘোরবাবু দেওয়াল-আলমারি খুলেছিলেন।

কি নিখুঁত একসেট যন্ত্রপাতি, ডাক্তার স্বামীর ঘড়ি। মল্লিকগিন্নীর রুপোর পানের বাটা, ভাল ফ্রেমে বাঁধাই পিসীমার ছবি।

'এই তোমার বুচুকাকা ?'

'হ্যাঁ।

'কত বছর ধরে হেলেন, কত বছর ধরে ?'

'সেই...সেই...বিয়ের কথা ভেঙে দেবার পর থেকে ..'

'বিয়ের কথা! বারো বছরের হেলেনমাসী, আর রাবণের গুষ্টিতে কিছুতে বিয়ে করবেন না অঘোর বরাট। পুলিসের দারোগা বিয়ে ভেঙে দিল বলেই কি হেলেনমাসী চোর হয়ে গেলেন ? অঘোর বরাট তো সাইকোলজি পড়েননি ?

অঘোর বরাট মনশ্চক্ষে দেখতে পেলেন হেলেনমাসী জেলে, হেলেনমাসী আদালতে, হেলেনমাসীর অপমানের শেষ নেই।

'হেলেন, তোমাকে আমি বিয়ে করব।'

'কি বললেন ?'

'বিয়ে করব। আর বুচুকাকা মরে গেছে বলে চারদিকে জানিয়ে দাও। আমাকে কথা দাও আর কখনো চুরি করবে না।'

'না।' হেলেনমাসীর গলা প্রায় শোনা যায় না বললেই হয়।

এতক্ষণে অঘোর বরাটের মনে হল জলতেষ্টা পাচ্ছে, মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে, ক্লান্ত লাগছে। চোরের পেছনে ঘুরে ঘুরে তাঁর এই ক্লান্তি। কিন্তু চোর মানে তো হেলেন! তার পেছনে ঘুরে ঘুরেই কি অঘোর বরাট আজ ক্লান্ত?

বিয়েতে দুজনেই খুব সুখী হয়েছেন। পাড়ার লোকও খুশী।

চাকরি ছেড়ে দেবার ঠিক আগে অঘোর বরাট ডাক্তার স্বামীদের চোরাই মাল উদ্ধার করে দিয়েছেন। সবাই তো বলে ওঁর মত দারোগা আর পাওয়া যাবে না।

এই বয়সে বিয়ে করবার জন্যে কেউ ওঁদের নিন্দে করেনি। অঘোর বরাটের কি আর বয়স হয়েছিল। হেলেনমাসীর বয়সটা মেয়েছেলে আন্দাজে একটু বেশী। কিন্তু বুচুকাকা মারা যেতে উনি অসহায় হয়ে পড়েছিলেন তো! নইলে কি আর ..!

বিয়েতে বড় বড় লুচি হয়েছিল, সব ঘিয়ে ভাজা। তার ওপর চিংড়ী মাছের চীনেকাবাব। বুচুকাকার নাকি বরাবর ইচ্ছে ছিল হেলেনমাসীর বিয়েতে এইসব খাওয়ান লোক ডেকে।

১১ বিশালাক্ষীর ঘর

মায়ের কোলে সন্তান আসত যেত, আসত যেত, অবশেষে কোলের মেয়েটিকে শাশুলীর থানে ফেলে দিয়ে মা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে কেঁদেছিল। বলেছিল, সবগুলোকে খেয়েছিস আক্কুসী, এটাকেও খা।

সে চল্লিশ বছর আগেকার কথা। সে বছর সময়ে জল, মাঠে ধান। বাশুলীর থানে পুজো পড়েছিল খুব। তাছাড়া তখনো এত ওষুধ-বিষুধ বেরোয়নি। ফি বছর ম্যালেরিয়া-বসন্ত-কলেরা—মা-মনসা কয়েক হাজার প্রাণ নিতেন।

হয়তো খেয়ে খেয়ে বাশুলীর অরুচি হয়েছিল, তাই বিশালাক্ষীকে উনি আর নিলেন না।

ও বিশু, তুমি বড় হলে কি করে মা?

দুক্ষু কষ্ট করে গো! বড় দুক্ষু করে! কিন্তুক একসময়ে আমার বাপ-জ্যাঠার কপালে গাড়ী চেপে বেইড়েছি! মোটরগাড়ী নয়, ঘোড়াগাড়ী। তখনো গড়িয়া-রাজপুর-জগদ্দল-বোড়াল ধু ধু গ্রাম। ওদের অনেক জমি ছিল। বিশালাক্ষীর বাপ-জ্যাঠার ঘরে সন্তান বলতে ও একা। ওর জ্যাঠা পরাণে পণ্ডিত যে উঠতি জমিদারকে সব জমিজমা বেচেছিল নেশার ঘোরে, তারই বেতো ঘোড়া আর ভাঙা গাড়ী কিনে এনেছিল জমি-বেচা টাকায়।

সেই গাড়ী চড়ে বিশালাক্ষী বেড়াত।

বড় অহঙ্কার বেড়েছিল ওর বাপ-জ্যাঠার। তার আগে অব্দি ওরা জাতে বুঝি নিচু ছিল। কিন্তু সেই যে গান্ধী বললেন, তোমরা সবাই মানুষের জাত, সেই যে যজ্ঞ করে সবাই জাতে উঠল, সেই থেকে ওরা ভাল জাত।

জাতের অহঙ্কার, হাতে কাঁচা টাকা তার অহঙ্কার, ওলাবিবির থানে বুঝি পুজো পড়েনি, তা উঠনো কলেরায় ওলাবিবি ওর বাপ-জ্যাঠাকে নিলেন। প্রথমে বাপ-জ্যাঠার মড়া বেরোল। শ্মশানে মড়া নিতে না নিতে আত্মীয়স্বজন গিয়ে বললে, বিশুর মা, জেঠিও বমি করছে গো, মড়া তোমরা জাগিয়ে রাখ।

এক দিন, এক রাত মড়া নিয়ে সবাই শ্মশানে বসে। তারপর একসঙ্গে চারজনকেই ওরা হরিধ্বনি গঙ্গাজল দিয়ে স্বর্গে পাঠালে। বিশুকে মা নিলেন না।

তারপর কতদিন গেল, বিশু পাগল বরের বউ হল। এক ছেলে কোলে নিয়ে একদিন বিধবাও হল। ঝি খেটে খেটে ওর দেহ কালি হল, হাতে-পায়ে হাজা। ওর যে একখানা ঘর হতে পারে, সেকথা বিশু স্বপ্নেও ভাবেনি।

জ্ঞাতগুষ্টিই খবর দিলে।

ওর বাপ-জ্যাঠার দরুন একফালি জমি হালতুতে। সে জমির আশপাশে কোথাও আর মানুষ বসতে বাকি নেই।

অত জমি সব আমাদের ছিল তুমি জানতে ?

বিশুর ছেলে সাইকেল পাম্প করতে করতে জিজ্ঞেস করল। বিশুর ছেলে কারখানায় লেদমেসিন চালায়। বিকেলবেলা সরু প্যাণ্ট পরে ও, গলায় রুমাল বাঁধে। বছর কয়েক হল বিয়ে করে ও শ্বশুরবাড়ি গিয়ে উঠেছে। মাকে দেখলে ওর বড় লজ্জা হয়। ওর শ্বশুরবাড়িতে কেউ ঝি খাটে না।

মাঝে মাঝে এসে মাকে দেখে যায়।

অত জমি সব আমাদের ছিল ?

সব আমাদের।

সব সময়ে বিশু ভাত রাঁধে না, ভাত খায় না। না খেলে মাথা ঝিমঝিম করে, আর আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখে জেগে জেগে।

ছেলের কথায় বিশু স্বপ্ন দেখল যেন। বলল, সব আমাদের ছিল, জানলি ? তোর দাদামশায়রা মস্ত জমিদার ছিল তা জানলি ? এই য্যাত জমি দেখতে পাস, সব তাদের ছিল ?

তোমার বাপ তা'লে বড়লাট ছিল বল ?

মস্করা নয় বাপ !

এ জমি তা'লে তোমার ?

আমি কি জমি নে' সগ্গে যাব ? যদি একখানা কুঁড়ে তুলে নিস সে তোদের থাকবে।

বিশু নিঃশ্বাস ফেলে বললে। ছেলের সঙ্গে অব্দি ও জোরগলায় কথা

বলতে পারে না। সংসারে কারো ওপর জোর করতে পারে না বিশু। জন্ম-কাল থেকে এ পর্যন্ত কাউকেই ও আপন করতে পারেনি। পরে স্বামী ওকে ভাত-কাপড় দিত না বটে কিন্তু পাগলামির ফাঁকে ফাঁকে ওকে বড় বড় কথা শোনাতে ছাড়ত না।

বলত, হতভাগী, কুল-জাত, কুল-সমাজ সব ভুলে খেয়ে ঝি খাটতেছ?

স্বামী দেওর ভাসুর সবাই ওর ঝি-খাটা পয়সা কেড়েকুড়ে নিত বটে কিন্তু ওকে কথা শোনাতে ছাড়ত না।

এই গাড়িয়ায় পরের ঘরে পড়ে থাকবার জন্যেও ওরা কথা শোনাত খুব।

বলত, আজপুরের খোড়োঘর আজকন্যের পছন্দ হল না?

ছিল, রাজপুরে ওর শ্বশুরদের একখানা খড়ের ঘর ছিল। কিন্তু স্বামী পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়তে দেওররা মা-ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

এই হয়েছে সারাজীবন। একটি মানুষ, একটি জীবন, কোন কিছুই আপন করে হাতে পায়নি বিশু। মানুষ ওকে শুধু ব্যবহার করেছে একদিকে, অন্যদিকে গালাগালি করেছে।

মনে জ্বালা ধরলে মাঝে মাঝে বিশু চেঁচামেচি করেছে বটে কিন্তু স্বামী-ছেলে সবাই ধূর্ত হেসে চুপ করে থেকেছে। ওরা জানত রাগ পড়ে গেলেই বিশু ঘোষালবাড়ি থেকে একথালা ভাত, দোকান থেকে বিড়ি আর পানসুপুরি নিয়ে আসবে। ওরা বিশুকে চিনে ফেলেছে। বিশুকে যারা গামছার মত মুচড়ে মুচড়ে কষ্ট দেয়, ও তাদের জন্যেই জীবন দেয়। এটা ওর স্বভাব।

স্বামীর সময়ে বিশুর যে ভাগ্য ছিল, এখন ছেলের সময়েও তাই। বিশুর বড় ইচ্ছে ও ছেলের কাছে থাকে। কিন্তু সে তো আর ছেলের শ্বশুরবাড়িতে সম্ভব নয়?

নিজের সংসারের মানুষ ছেলের কাছে থাকে। নিজের ঘরে থাকে। কিন্তু নিজের ঘর কোথায় পাবে বিশালাক্ষী? কে ওকে নিজের ঘর দেবে?

বিশু তাই এমন দুরাশার কথা মনের কোণে ঠাঁই দেয়নি কোন দিন। কিন্তু জ্ঞাতগুষ্টি হঠাৎ ওকে মন্তরের মত আশ্চর্য কথা শুনিয়ে গেল।

ও মহেশের মা, হালতুতে তোমার জমি আছে মা, দখল নাও গা!

বিশু ছেলেকে ডেকে পাঠাল। মহেশ ওর উপযুক্ত ছেলে। তাছাড়া বেটাছেলে সাহায্য না করলে মেয়েমানুষ হয়ে বিশু কি জমিজমা উদ্ধার করতে পারবে?

ছেলে বলল, এ জমি কোত্থেকে এল বল তো?

মা, বলল, জানি না বাপ! চল যেয়ে বেত্তান্ত শুনে আসি।

কসবার লাইন ছাড়িয়ে সূর্য-ওঠার দিকে হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় ওরা সেই বাবুর বাড়ি খুঁজে পেল।

রীতিমত পাকা ঘরদোর, তক্তাপোষে বসে বাবু কাগজপত্তর দেখছিলেন।

তুমি বিশালাক্ষী পণ্ডিত? তোমার বাবা ঈশ্বর পরাণচন্দ্র পণ্ডিত? তোমার জেঠা হারাণচন্দ্র পণ্ডিত?

হ্যাঁ, বাবা।

বাবার স্নেহ, মায়ের মমতা কাকে বলে তা জানে না বলেই বিশালাক্ষী বিশ্বসংসারে যাকে পায় তাকেই বাবা-মা বলে ডাকে।

তোমার বাপ-জেঠার এখানে দেবত্ত জমি ছিল?

উনি কি জানবে? আমার কাছে শুনুন।

বিশালাক্ষী উপেনকে দেখে অবাক হয়ে গেল। উপেন তো ওদের গ্রামের মানুষ। ওদের সমাজের মাথা। উপেন এখানে কি করে এল?

মাছের গন্ধে বেড়াল আসে জানলে পিসী!

উপেন গোঁফের ফাঁকে হাসল। বলল, আমার জেবনটা তো কার জমি, কার মামলা তার চিন্তাতেই কেটে গেল। তোমার বাপ-জেঠার দেবত্ত জমির কথা শুনেছিনু বটে। আর তোমার গিয়ে সোয়ামী, আমাদের পিসে, তিনিও জানত।

তিনি জানতু?

নয়তো কি? তুমি ছিলে অজ-বোকা। দেবত্ত সম্পত্তি আর মায়ের থানের কথা তুমি জানতে পিসী? শুনেছিলে?

শুনেছিলাম বটে ছিল সব, কিন্তু ময়েশের বাপ বলতু ওসব হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।

আর তুমিও তাই বিশ্বাস করেছিলে, তাই নয়?

হ্যাঁ, বাবা।

বিশুর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ল। অনাথা, সংসারে কেউ ছিল না। দিদিমার কোলেপিঠে মানুষ। দিদিমা ময়েশের বাপের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল। তখন বিশুর বয়েস মোটে ন'বছর। দিদিমা ঘর করতে দিতে চায়নি কিন্তু বিশুর শাশুড়ী বলেছিল—ন'বছুরে মেয়ে কাজকম্ম করে না? কাজ করলে তোমার নাতনী মরে যাবে?

বিশু ঘর করতে গেল। বিশুর বর কখনো বাড়ি থাকত, কখনো থাকত না। টাকাপয়সা বিশু চোখে দেখেনি বটে কিন্তু ধানচালের কষ্ট তেমন ছিল না। ক্রমে ধানচালের কষ্ট হল। শোনা গেল বিশুর বর ঠাকুর-ঠাকুর করে ধর্মপাগল হয়েছে। তখন বিশুর বড় কষ্ট। ময়েশকে কোলে নিয়ে বিশু শরিকদের ধান ভানত। ময়েশের বাপ মরে যেতে চালাঘরের আশ্রয়টুকুও ঘুচে গেল।

বিশু তো ময়েশের বাপের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করত। বিশ্বাস করবে না? ময়েশের বাবাকে যে পাঁচজনে খুব বাহবা দিত! বিশু আর ময়েশকে ভাত-কাপড় দিক বা না দিক, ময়েশের বাবা বুক চাপড়ে চাপড়ে গরম গরম কথা বলতে কখনো ছাড়ত না।

স্বামীর কথা মনে পড়ল বিশুর। মাথায় উকুন, গায়ে চাম-উকুন, একমুখ দাড়ি। ময়লা গেরুয়া কাপড় পরে তিন চার মাস বাদে ঘুরে ঘুরে আসত

লোকটা।

লে আও টাকা! হম বড়া সাধু হ্যায়! আও সাধুজনকো সেবা লাগাও।

সঙ্গে সঙ্গে দু'একটা লোকও থাকত। বিশু ওদের ভাত রেঁধে দিত, জামা-কাপড় ক্ষার কেচে দিত, দাড়ি কাটতে পয়সা দিত।

বেশ দেখতে ছিল ময়েশের বাপ। খুব গলা ছেড়ে গান গাইতে পারত। হাত দেখতে জানত। পাড়ার ভদ্রঘরের বউ-ঝি সবাই ওর কথা শুনতে ভালবাসত। বলত, তোর কি ভাগ্য বিশু! তোর স্বামী কি সামান্য লোক?

বলত, হ্যাঁ ময়েশের বাপ, ঘরে থাক না কেন? গান গাইলে, হাত দেখলে, তাতে দুটো পায়সা তো হয়?

ময়েশের বাপ বলত, তা যা বলেছেন মায়েরা! ঘরে থাকা যে ভাল তা কি আর বুঝি না? কিন্তুক কি জানেন? উ মাগীর জন্যে ঘরে থাকতে সাধ যায় না। উ কি কম বজ্জাত মেয়েছেলে! আজপুরের খোড়োঘরে লাথি মেরে উ শওরে এল। কেন এল? আমরা জানলেন, বংশ ভাল, উঁচু ঘর। নিজঘরে না রইলে মান থাকে কি?

সবাই তো বিশুকেই দোষ দিত। আহা! মানুষটা এমন গান গায়, এমন ধর্মকথা বলে? তার বউ হয়ে ঝি খাটে বিশু সেই দুঃখেই তো লোকটা দেশান্তরী। আর কি সচ্চরিত্র! ঘরে থাকুক, বা না থাকুক যখন খোঁজ চাইবে, তখনি দেখবে কোন-না-কোন শিবের থানে পড়ে আছে!

সবাই ওর কথা বিশ্বাস করত।

বিশুও বিশ্বাস করত। বিশুকে ওর দিদিমা বলেছিল—তোর তিভুবনে কেউ নি' বিশু! মানুষ নাথি-ঝাঁটা মারলেও নিনু হয়ে থাকবি!

বিশু তাই মুখ নিচু করেই থাকত। বাপ-জ্যাঠার জমি কি ছিল আর কি ছিল না বিশু কিছু জানে না। ময়েশের বাপ বিশুর দিদিমার সঙ্গে মাঝেমধ্যে কোটকাছারি যেত বটে কিন্তু কেন যেত তা বিশু জানে না।

উপেনের কথায় তাই বিশু বলল, আমাকে ময়েশের বাপ যা বলত আমি তাতেই বিশ্বাস যেতু বাপ!

ময়েশ বলল, কি ব্যাপার বলুন তো?

উপেন বলল, তোমার মায়ের বাপ-জ্যাঠার এখানে শেতলাথান ছিল। আর ছিল জমি। গড়ের জমিজমা জমিদারদের দিয়ে দেয়। তা বাদে সব ঝপাঝপ মরে গেল যখন, তখন তোমার মায়ের দিদিমা যেয়ে হাত পায়ে ধরে তোমার মায়ের যিনি জ্যাঠা ছিল, তার শালাদের এনে এই মন্দিরে বসায়।

ঐ মন্দিরে?

অবাক হয়ে তাকাল বিশু। নিচু একতলা মন্দির। মন্দিরের ওপর নিশান বাঁধা। দুটো রোগা হ্যাংলাপনা লোক বসে ঝিমোতে ঝিমোতে মা-মা-মা-মা বলে কীর্তন গাইছে। এই মন্দির ওর বাপ-জ্যাঠার ছিল? বাপ কেমন, জ্যাঠা কেমন, কিছুই মনে পড়ে না বিশুর, কিন্তু এখন মনে হল তারা বোধ হয়

মহাপুরুষ ছিল। মানুষ তো একখানা খোড়োঘরই তুলতে পারে না। এমন মন্দির এমন দালান যাদের থাকে তারা মহাপুরুষ ছাড়া আর কি?

ঐ মন্দিরে। কথা ছিল পুজো এখন ওরা করবে, আবার তোমার বে-থা হলে তোমার বর-ও পূজারী হবে। যতদিন না হবে ততদিন ওরা তোমাদের মন্দিরের আয় অর্ধেক দেবে।

দিতু কি?

আ রে আমার বোকা মাধাই! দিত বই কি। না দিলে তোমার দিদিমা তোমার পিতিপালন করল কি করে? বে' দিল কি আকাশ হতে? তোমার বরের সোমসারটা কিসে চলত?

আমি জানিনি বাপ! আমায় কেউ কিছু বলতুনি।

তা বাদে কথা ছিল দেবত্ত জমি যখন, তখন বিক্রীবাটা করতে পারবে না কেউ!

উপেন বাবুর দিকে তাকাল, বাবু উপেনের দিকে। বাবু বললেন।

বিক্রী কেন করবে বাছা? লীজ দেবে। লীজ বোঝ?

না, বাবা!

উপেন বলল, সে আমি ওনাকে বুঝিয়ে দে'বখন। আপনি এখন বলুন দখল নেবার কি হবে!

দখল নিতে হবে। ঘর তুলতে হবে।

কে ঘর তুলবে, বিশু? কে দখল নেবে, বিশু আর ময়েশ?

দখল নিতে হলে তো শরীরে শক্তি চাই, লাঠি ধরবার মত লোকজন! তা ছাড়া বুকে সাহস থাকা চাই। বিশু তো জানে কেমন করে মানুষ জমি জোর করে দখল করে, সরকারের পয়সায় কুঁড়ে তোলে!

দখল নিতে হবে বাবু?

হ্যাঁ, বাছা। দখল নিলেই ঘর তুলতে হবে। আর তুলে যদি বসে থাক বাছা, তা'লে ওরা অবিশ্যি গণ্ডগোল করবে।

কারা?

যারা পুজো কত্তেছে।

আমাকে শুনতে দাও দিখিনি?

ময়েশ এগিয়ে এল। এতক্ষণে কিছুটা আঁচ করতে পারছে ও।

অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। এখন বোঝা গেল এই মন্দির আর জমির ভোগস্বত্ব আসলে বিশুর। নেহাৎ রক্তের গুঁড়ো। এতটুকু মেয়ে বলে ওর দিদিমা খুঁজে খুঁজে ওর জ্যাঠার শালাসুমুন্দিদের ডেকে এনেছিল। বলেছিল ধর্মের থান বাছারা! অধম্ম করনি। মোর বিশু বড় হলে ওকে আধেক দিও।

সে আর বলতে?

জ্যাঠার শালা কচিরাম সেই দিনকালেও জানত চাষাভুষোর লোকবলই আসল বল। ওর সাতটা ছেলে ছিল। আর ছিল দজ্জাল এক বউ। ওর

বউয়ের হাতের মাংসে থলথল করে নড়ত।

ওরা এসে দখল করে বসেছিল সব।

তখন তো বিশ্বাসের দিন। মা-শীতলার দোর্দণ্ডপ্রতাপ। মানুষ ডালা বোঝাই চাল এনে, কালো পাঁঠা এনে শীতলার পুজো দিত।

তাই কাঁচিরামের পাকা দালান হল। নিজের টেপাকল। ছেলেরা সবাই মন্দির আঁকড়ে পড়ে রইল। এখনো শনি-মঙ্গলবারে ওরা মন্দিরে কীর্তন গায়।

এতদিন একভাবে গিয়েছে। তারপর বছর-বিশেক ধরে ওরা একটু একটু করে দু'পাঁচঘর মানুষকে যেমন তেমন টাকা নিয়ে জমি লীজ দিয়েছে। ময়েশের বাপ তা জানত। সে নেশাভাঙের দশ-বিশ টাকা নিয়ে কাগজে টিপ দিয়ে সরে পড়েছে। একা বিশু কোন কথা জানত না। বাবু জানতেন। সব জানতেন। কিন্তু সে টাকা যে বিশু পায় না তা তো ওঁর জানার কথা নয়! তা ছাড়া ওরা তখন বাবুর পরামর্শ নিত।

এখন ওরা আরেক বাবুর আশ্রয়ে গিয়েছে। এই বাবুর কোমরের জোর অনেক বেশী। পার্টির লোক উনি, পাড়ার কাউন্সিলার। এখন ওরা সমস্ত জমি, এই এক বিঘা চার কাঠাই টুকরো টুকরো করে একুশ বছরের লীজ দিয়ে দিতে চলেছে। তাই জানতে পেরেই উপেন আর বাবু বিশুকে খোঁজ করেছেন। বড় দয়ার প্রাণ উপেনের, বড় ধর্মপ্রাণ এই বাবু। ওঁদের তো কোন স্বার্থ নেই!

তা আমায় কি করতে হবে?

ঘর তোলবে।

কেমন করে? ওরা দেবে?

আহা! ঘর তুমি তোল না কেন? বড় জোর ঘর তুললে পরে ওরা বলবে তোমার সবটা লয়! তখন ওরা যেয়ে পার্টিশানের সুট করুক না। মামলা করুক।

মামলা করবে কেন গো?

আহা! পার্টিশানের সুট হলে ডিক্রী বেরুতে দশ বছর। তা কি ওরা জানে না? ঐ ঘর তোলাটা হল যেয়ে মস্ত প্যাঁচ। জানলে পিসী? ওরাও তখন বলবে চল বাছা, আপসে মিটিয়ে নেই। লেখাপড়া করে তোমার আধা নাও, আমাদের আধা থাকুক।

তা বাদে? তা বাদে কি হবে বাবা উপেন? আমার তো ভয়ে হাত-পা কালি মেরে যাচ্ছে।

উপেন মুখ খিঁচিয়ে বলল, শালা মোদের জাতের এই মরণ। মুখে মোয়া তুলে দিলেও মোয়া দেখে না! তা বাদে কি হবে শুধাও কেন গো? তা বাদে তোমাদের জমি তোমরা দু'পাঁচ হাজার করে করে লীজ ছাড়বা আর ঘরে বসে টাকা গোনবে!

ঘরে বসে?

হ্যাঁ গো পিসী। এখন হল গা কাজের সময়। এখন আর বাবুর টাইন লষ্ট করোনি।

কি করতে হবে?

বাবু কাগজে নিকে একেছেন সব! এই দাগনথর নিয়ে যেয়ে বেহালার আদালতে দিয়ে টাকা দিয়ে দলিল খালাস করুক গা ময়েশ।

ময়েশ কি পারবে?

আহা, আমি তো আছি।

তা বাদে খরচ-খরচা......

বাবু তো আছেন!

বিশু হঠাৎ কেঁদে ফেলল। মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ে গিয়ে হাত জোড় করে বলল, একখানা খোড়োঘরের বেবস্থা আমায় করে দেন বাবু! আমি বড় অনাথিনী গো! ঝি খেটে খেটে মোর হাড়মাস কালি হয়ে গেল। একখানা খোড়োঘর হলে আমি ছেলের সোম্সারে রইতে পারি। গতর পড়ে যাচ্ছে বলে গিন্নীমা নিত্য বলেন, বিশু এবার পঁত দেখ বাছা! য্যাতক্ষণ আমি আছি ত্যাতক্ষণ একরকম! কিন্তু ছেলেরা কি আমি চোখ বুজলে তোমায় এই ঘরে থাকতে দেবে, না কাজে রাখবে?

ময়েশ চোখ পাকিয়ে মা-র দিকে চাইল। ময়েশের হাতে উল্কিতে টিয়া-পাখী আঁকা, পরনে রঙীন জামা, গলায় রুমাল। মা ওকে অপদস্থ করবে বলেই যেন কথাগুলো বলল।

বাবু করুণায় গলে গেলেন। একটু ঝুঁকে বললেন, ঘর হবে বই কি। খুব ভাল ঘর হবে তোমার। পাকা দালান, নিজের টেপাকল। প্রথমে অবশ্য ওদের আঁতে ঘা দেবার জন্যে খোড়োঘরই তুলতে হবে। তা বাদে ভাল ঘর হবে।

সে ঘরে বাস করা যাবে?

বাস তো করতেই হবে। নইলে কাজ আগাবে কেন বল?

টাকা-পয়সার কি হবে?

আমি দেব, সব আমি দেব। ঘর তুলবার বাঁশ, খড়, ভিতের ইট, মিস্ত্রী-মজুরের ব্যবস্থা সব আমার। এখন যেয়ে দলিলটা তোল আর একটা ভাল দিন দেখে ভিতটা পুজো করে ফেল, কেমন? ঐ কাঁচরামের বংশ আর ওদের বাবু হারুমিত্তিরকে আমি একবার দেখে নিই!

বাবুকে পেন্নাম করে উঠে পড়ল বিশু। মন্দিরের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, মাগো, আমার পিতিপুরুষের হাতে তোমার পিতিষ্ঠে! আমাকে দয়া কর মা, ষোড়শোপচারে তোমায় পুজো দেব মা, সোনার নত দেব।

পথে বেরিয়ে ময়েশ বলল, উপেনজেঠা? বাবুর নাম কি?

রাখাল দত্ত। হেরো মিত্তিরের পিসতুত ভাই।

উনি কি এখানকার লোক?

না বাছা! উনিও ভিনদেশী। তোমার বাবা যখন কাঁচরামের চোলে

পড়েছিল তখনই কচিরামকে চুমরে-চামরে রাখালবাবু বাড়ীর জমি বের করে নেন।

দেবত্তরের জমি ছিল।

লীজ নিয়েছিল, সে তুমি বুঝবে না।

ঐ ওদের কাছ থেকে?

ছিল, ময়েশের বাপও ছিল। তোমার বাপকে তো তুমি দেখনি ময়েশ, সে তোমার জ্ঞানে নেই।

থাকবে না কেন মশায়? মোল তো আমাদেরি রকে পড়ে। কম বিছনা-মাদুর কেচিছি ওর?

সে তো শেষকালে। সে সময়ে বাপ তোমার সাধু রে, সন্নিসী রে বলে যতরাজ্যের গেঁজেল-মাতালের পেছু ছুটতে লেগেছে। ঐ কচিরামের সঙ্গে কি আঁবেদুধে ছিল তোমার বাবার! সেই করে করেই তো কচিরাম ওকে দিব্যি হাতগন্ত করে নিলে। বললে তুমি আমার বোনাইরের ভাইঝি-জামাই। সন্তানতুল্য। আমারও তো তাই বট হে। তোমার দিদিশাওড়ীর দয়ায় এটুকু করে খাচ্ছি না! তোমায় তো বঞ্চিত করতে পারব না।

ওনাকে টাকা দিতু?

অনেক টাকা পিসী! নিজেরা দুশো নিলে, ওকে হাতে পাঁচটা টাকা দিলে। পা ধরে বললে তুমি হলে সাধুমানুষ, হ্যানো-ত্যানো কত কি। অমনি সে মানুষও গলে জল হয়ে গেল।

কচিরাম না কে সেই লোকটা?

না বাবা, মিছে বলব না, ঐ রাখালবাবুও ছিল। কচিরাম যেমন কচালে, আমাদের বাবু তেমনি কুচুন্ডে। দুজনে তখন ভাব কত!

এসব কথা বিশুর কানে যাচ্ছিল কি যাচ্ছিল না। ও শুধু ভাবছিল ঘর হবে ওর, নিজের ঘর। ছ্যাঁচা বেড়া, খোলার চাল, জ্যৈষ্ঠে রোদে ফাটবে, ভেসে যাবে শ্রাবণে। তবু নিজের ঘর।

ভাবতেই ওর মনে হচ্ছিল স্বপ্ন দেখছে বোধ হয়। নিজের ঘর থাকা না থাকার সঙ্গে জাতে ওঠার কথা আছে তো। আসলে তো বিশুরা নিনু জাত নয়, আর ও যখন রক্তের ডেলা তখন যে যজ্ঞি হয়ে সবাই ভাল হিন্দু হয়ে গেল তার পর আর মন্দ জাত এ ভু-ভারতে নেই।

সব জানে বিশু। কিন্তু সেই যে দিদিমা বলত পর-ভেতো হওয়া ভাল, পরঘোরো হতে নেই, সে কথা তো ও ভোলেনি!

এই তো বছর-বছর ভাদ্র মাসে ছাতামনসার ডাল ভেঙে বাস্তুপুজো হয়। যাকে বলে রান্নাপুজো। আগের রাতে রেঁধেবেড়ে পরদিন সেই আসিবাসি পাঁচ ভাজায় থালা সাজিয়ে বিশু ছেলেকে খেতে দেয়। কেন দেয়? মনে ঐ এক আশা, বাস্তুপুজো করতে করতে যদি নিজের ঘর হয় একদিন।

ঘর হলে জাতে উঠবে বিশু। কেউ আর দুরোছাই করতে পারবে না। এই

তো আনন্দ ঝি চাটুজ্জেদের গিন্নী মরতে সংসারের ভার হাতে তুলে নিয়েছিল। কি খাটা খেটেছিল ও সংসারে তা সবাই জানে। কর্তা তো কত কি দিতে চেয়েছিল, আনন্দ নেয়নি কিছু।

এখন আনন্দ রথতলায় ভিক্ষে করে। কুটকুটে কালো রং শরীর এঁকেবেঁকে যেন হেন্তালের লাঠি। বিষ্টি বল, বাদল বল, বটতলায় পড়ে থাকে আনন্দ। বিশুকে দেখলেই বলে আমার নয় কেউ ছিল না তাই নারকোলের আধখানা মালা নে' বেইরেছি। তোর তো ছেলে আছে, তুইও আধখানা মালা নিয়ে বেরুবি, ও ময়েশের মা?

শুনলে কি ভয়ই পায় বিশু। ভিখিরী হয়ে পথে কারা বেরোয়? যাদের সাতকুলে কেউ নেই। ময়েশের-বাপের কথাবার্তা আর কালীকেত্তন শুনে বাবুদের ঘরের বউ-ঝি সব আহা-আহা করত। তার বউ হয়ে ঝি খেটেই তো কত অন্যায় করেছে বিশু।

পরাণে আর নারাণে দুই পণ্ডিত ভাইয়ের প্রতিই বা কি সুবিচার করেছে? তারা কি কম মানুষ ছিল? হলে বা কলেরা, দুজোড়া স্বামী-স্ত্রীকে একটা চোকো চিতায় দাহ করা হয়েছিল যখন, তখন কি কম ধন্য ধন্য হয়েছিল চারদিকে? রথের সময়ে নাকি কারা "সতীমাহাত্ম্য" নামে গোলাপী কাগজে পদ্যের বই ছাপিয়ে একপয়সা করে বিক্রী করেছিল।

এখন একজনদের গোয়ালঘরের পেছনে গো-চোনার দুর্গন্ধে ব্যোঝাই একখানা এঁদোঘরে বাস। মাঝে মাঝে গরুর খুরের খটখটানি শুনেও ভুল হয়ে যায় বুঝি কারা জুতো খটখটিয়ে বিশুকে ধরতে আসছে।

একখানা ঘর হলে সব দুঃখ ঘুচে যায়। বিশু জাতে ওঠে।

ও ময়েশ, ও উপেন! এই তো কেমন দোকান! এট্টু দই খাবে বাবারা? মিষ্টিদই?

ময়েশ অবাক হয়ে চাইল। বলল, কেন মা?

আজ শুভদিন এট্টা।

বিশু অন্যমনস্ক হয়ে বলল। হঠাৎ, মাঝখানের সব কথা ভুলে গিয়ে ওর দিদিমার উঠোনের মনসাগাছটার কথা মনে হয়েছে বিশুর। কেমন সড়া সড়া মনসাপাতা! ছাতিমগাছের মত শোভা সে পাতার। এই মনসাপাতার কাজল পরলে চোখ বাঁচে, এর ছায়ায় গেরস্থের লক্ষণ।

মনসাগাছটা বড় হয়ে বেশ ছায়া-ছায়া হয়েছিল। ওর নিচে বসে-বিশু ছোটবেলা

এক পয়সা তেলের দাম—মনোরঞ্জন ব্রাহ্মণ!
বদ্যিবাটি বদ্যিবামুন—হে সূর্য তুমি সাক্ষী!
হাড়ের গলায় পাঁচ পাট্টি—তোল ঝাঁপ!

ছড়া কেটে কেটে তেলতেলে নুড়ি দিয়ে গুটি খেলত। মাটির উঠোনে। দিদিমা বলত শানের মেঝেয় গুটিখেলার টুকটুক শব্দ হলে মা-লক্ষ্মী পালিয়ে যান। মাটির উঠোনে শব্দ হয় না।

মনসাগাছের ডাল একটা চাই। বাস্তুপুজোর সময়ে। বিশু বলল, যাও উপেন! তুমি না হলে কে বলতে যেতু বল! যে আঁধারে আছি সে আঁধারেই থাকতু বাপ! আর কিছু হতুনি। তবে এট্টা কথা!

কি?

ঐ, জ্যাঠার শালার ছেলেগুলোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ না করে ভাবেসাবে কাজ করলে ভাল হতু না?

ভাব করতে হয় পরে করো পিসী। এখন তোমাদের জমিতে ওদের হক থাক বা না থাকু ওরা বাস করতে করতে এট্টা হক জন্মেছে। তা ভিন্ন তল্লাটের লোক, তুমি ধরগা, ওদেরি চেনে। তোমাদের নাম আদালতের দলিলে আছে কিন্তুক সে সংবাদ তো সবাই রাখে না। তোমাদের ঘরখানা উঠুক! এবার তোমরা এসে এখানে বাবুর বাড়ী থিতু হয়ে বসো। বসে ঘরখানা করে নাও। তোমাদের ঘরে যেমন তোমরা উঠবে, ওরা এসে বলবে সম্পত্তি ভাগ হোক!

বলবে?

বলবে বই কি! আমরাও বলব ভাগ হোক। তা বাদে সব মানুষ এসে দাঁড়িয়ে ভাগজোক করে দেবে।

ময়েশের মুখ সন্দেহে কুটিল হয়ে রইল। বিশুকে ঘরের টাকা দেবে বাবু, দলিল তুলতে খরচ দেবে, কেন দেবে? মাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বলল, কারো কাছে বলতে বসনি যেন। দিনকাল তেমন কি!

না বলে কেমন করে পারবে বিশু? বৌ-বরণের গরম দুধের মত, চোখের জলের মত, বিশুর বুক থেকে আবেগ উথলে উথলে উঠল।

ও পিসী, কাজে যাবে না? মা ডাকলে।

আর কাজে যাবে না গোপাল, পিসির এখন অনেক কাজ গো!

কাজের জন্যেই তো ডাকলে।

নিজের কাজ গো, নিজের কাজ!

পিসির যে নিজের কাজ থাকতে পারে তা জেনে গোপাল অবাক হয়ে গেল। পিসি তো তাদের কাজ করে, চাটুজ্জেদের বাসন মাজে, গোয়াল কাড়ে। পিসি তো বোসদের বাড়ী বসে বসে কয়লার গুল দেয়, নারকেলপাতা চাঁছে।

অ গোপাল, এট্টা কাটারী দে!

কেন পিসী?

মনসাডাল এনে ওঠোনে পুঁতে রাখি, নয়তো পুকুরপাড়ে?

মনসাডাল, পিসী?

পিসীর যে ঘর হবে বাপ! বাস্তুপুজো করতে হবে না?

বিছানা-মাদুর বার কচ্ছ যে?

বিশু ভরদুপুরে বিছানা-মাদুর নিয়ে পুকুরে গেল। এঁটোকাঁটার কাজ, অপবিত্র কাজ। সব পরিষ্কার আর শুচি করে নিতে হবে। তারপর ঘর বাঁধা। তারপর ঠাকুরপুজোয় গিয়ে হামি হয়ে দাঁড়ানো। তারপর শুধু

থ্পে-থ্নো ঠাকুরের নাম-গান। মটকার থান পরে বিশ্ব হেঁটে যায়, সবাই বলে, কে গো। কি গো। সবাই বলে পণ্ডিতদের ওয়ারিস উনি। উনিরই সব।

বিশ্বর মনিবরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তারপর গিন্নী বললেন, লোকবল নেই, অর্থবল নেই, পারবে বাছা? ছেলে তো সুপুত্তুর। মা মরলে চেয়ে দেখবে না। ঘর যে ছাড়ছ বিশ্ব, এ ঘর এখনি কিন্তু ভাড়া বসে যাবে।

বিশ্ব গিন্নীর দিকে নয়, রান্নাঘরের বারান্দার দিকে চেয়ে রইল। কেমন তালগাছটা উঠেছে। কেমন কাঁঠালগাছটা। এইরকম পাকা গাছে তক্তা, খুঁটি সব ভাল হয়।

তারপর বিশ্ব একদিন উপেনের সঙ্গে ওখানে গিয়ে উঠল। ময়েশের বউ বাস্তুপুজোর দিন এসে চলে গেল। কোথায় থাকবে মা? শওর নয়, বাজার নয়। ওঃ, কচুগাছের জঙ্গল দেখেছ? ঘরদোর হলে একরকম! এখন এখানে কে থাকবে বল?

বাবু বললেন, এই তো বাস্তুপুজো হয়ে গেল। ও-পক্ষের সাড়াশব্দ পেলে কিছু?

না।

আহ্লাদে ডগমগ বিশ্ব, যেন বাবুর বাড়ীর একখানা খুপরিতে বাস করে, বাপজেঠার দেবত্র জমিতে মনসা পুঁতে এখনি ও জাতে উঠে গিয়েছে। ও এখন বন্যাত্রাণের দিদিমণি! কাপড়, খাবার জনে জনে বিলোতে পারে। ও এখন চাটুজ্জে-জেঠাইমা! সত্যনারায়ণের প্রসাদ বিলিয়ে বছরে, কয়েকবার অন্নপুর্ণা হয়ে বসে থাকে! বিশ্ব তাই কাঁচরামদের বাড়ী একথালা প্রসাদ পাঠিয়ে দিল।

পরদিন রাখাল দত্ত মুখ অন্ধকার করে বিশ্বকে ডাকলেন। বললেন, তোমারি সব বাছা! নেয্য জিনিস! কিন্তু আমার পরামর্শ নেবে তো? তুমি কি এ জায়গার চল-চলতি জান?

কেন বাবা? কি দোষ হয়ে গেল?

তোমার পেসাদ ওরা ছাগলের সামনে এট্টু দিয়েছিল। খেয়ে ছাগলটা ছটফটিয়ে মরে গেল। এখন, বিষ্যুৎবারে পুকুরের পশ্চিমপাড়ে, বুঝলে না, ছাগলের অপঘাত মরণটা ভাল দেখায় না!

মরে গেল কেন? সাপ কামড়ায়নি তো?

সর্পাঘাত হতে পারে। আবার ওরা বলছে তুমি দেইজি করে বিষ দিইছিলে।

বিশ্ব তো প্রথমে অবাক হল, তারপর কাঁদতে শুরু করল। বাবু বললেন, কাঁচরামের ঝাড় তো ওরা! জাতসাপের বংশ! ছোবল না দিয়ে একটা কথা কবে না। দেখ! যতক্ষণ না ঘর ওঠে, আর যতক্ষণ না সে ঘরে তুমি বাস করতে পার, ততক্ষণ জেনো বিপদে আছ।

আমার তুমি আছ বাবা!

মনে মনে জাতে উঠেছে বিশ্ব। ময়েশের সঙ্গে এক করে ফেলেছে রাখাল

দস্তকে। রাখালবাবুর সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, কিন্তু তিনি কথা বললেন না। বরঞ্চ ঠিক করলেন ভেতরে বলে দিতে হবে বিশুকে তুইয়ে-তুষিয়ে রাখতে।

বিশুর ঘর উঠল।

দুটো-তিনটে মজুর এল। বাঁশ রে, খুঁটি রে, খোলা রে, বেড়া রে।

শুধু ঘরের চেহারা বিশুর মনের মত নয়। ঘর হবে—সে-ঘরে এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে চলে যাওয়া যাবে। পুবের রোদে ভোরবেলা বসা যাবে, সন্ধ্যে-বেলা দক্ষিণের দাওয়ায়। এই এত এত জমি বিশুর, ঘর এত ছোট কেন?

ও বাবা রাখাল, ঘর যে খেলনাঘর! মজুরগুলো বলে তুমি নাকি মোটে ওদের দেড়শো টাকা দিয়েছ?

আহা ঘরে গিয়ে ওঠ না গো। দখলপত্তর ঠিক হোক, কোটা তুলে দেব।

ময়েশ বললে ধুত্তোরি, তাই বিশু গিয়ে ওর নতুন ঘরে শুয়ে রইল। নতুন ঘর নিজের ঘর। সে-ঘরের গন্ধ অব্দি অন্যরকম। মনে মনে বলল, যদি ভালয় ভালয় ভাব হয়ে যায় তবে যেয়ে কাঁচিরামের বাড়ীতে সবাইকে নেমন্তন্ন করব। খোরো গেরস্থর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেইজি করা ঠিক নয়।

বিশু যখন ঘুমে অচেতন তখন কাঁচিরামের ছেলেরা রাখালবাবুর কাছে গেল। আবার উপেন এল। দোর বন্ধ করে আলো জেলে অনেক কথা হল সকলের। এতদিন তো বিশুর কোন খোঁজ ছিল না, বেশ তো কাঁচিরামরা লীজ দিচ্ছিল, রাখালবাবুর বাড়িতে কথাবার্তা হচ্ছিল। ময়েশের বাপ যতদিন ছিল, ছিল। ময়েশরা তো কিছুই জানত না। কি দরকার ছিল রাখালবাবুর খাল কেটে কুমীর আনবার?

রাখালবাবু বললেন, বাছা! জাতসাপের ন্যাজে পা দেবে, এট্টু ছোবল খাবে না?

নেন বাবু, যা হয় ঠিক করেন। দিনকাল ভাল নয়। জবরদখলের দিন। ঐ যে যা বলে এট্টা বেবস্থা করে পার্টি বসিয়ে দিন।

তবে যাও, ময়েশের নামে একটা ডায়েরী করে এস।

সে করা আছে মশায়! এখন আপনি তাঁকে এনে এখানে রাত্তিবাস করান দেখি? বেটাছেলে নইলে কি আর ফোজদুরী হয়?

উপেন উসখুস করে বললে, কাজটা ঠিক ধম্মো হয় না তো? ময়েশের মা স্তীলোক, তায় বুড়ো হয়েছে। ওরে কিছু টাকা দে সইরে দিলে হত না?

রাখালবাবু বললেন, বুড়ো হয়েছে! বুড়ো হয়েছে তো এত লোভ কিসের? তিনকাল গেল ঝি খেটে এখন উনি কাঁঠালকাঠের চৌকিতে শুতে চান!

উপেন বললে, আমাকে মাপ করে দেন বাবু। চক্ষে বসে বসে ওটা আর নাই বা দেখলাম।

উপেন বিশুর কাছে গেল।

ও পিসী, ও ময়েশের মা! একবার যাবে? আমার দেশে যাবে?

কেন?

এই। ধর যেয়ে সব দেখে আসবে!

কি যে বল বাবা! আমার হল যেয়ে নতুন সোমসার। হ্যাঁ দেখ, ও-পক্ষ তো কোন সাড়া দেয় না, আজ একদফা মায়ের থানেও ঘুরে এনু। রাখাল ছেলেকে বল দিকি, পিসীর·ঘরটা পাকা করে দাও। আর একটা কল-সেজখানা নইলে কি আর গেরস্ত হয়?

তোমার কাগজ দলিল কোথায় পিসী?

সব ঐ রাখাল ছেলের কাছে। ঐ তোলালে, ঐ রেখেছে।

উপেন বিড়বিড় করে বলল, ডাইনের হাতে ছেলের আত্তি।

জোরে বলল, পিসী, চললাম গো!

তার কয়েক দিন বাদেই বিশুর ঘর ছাই হয়ে গেল। কি যে হল, কেমন করে যে হল কিছুই বুঝলে না বিশু। কারা ওর ঘরে আগুন দিলে, কারা ময়েশকে দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্যে ফৌজদারীতে ফেললে, কেন রাখালবাবু সেই সময়টাই এখানে রইলেন না, কেন বিশুকে অনেক অনেক ভাল কথা বলেও থানাবাবুরা পাড়া ছেড়ে চলে যেতে বললে!

নয়তো মামলা কর। মামলা মানে উকীল-মোক্তার-টাকার খেলা। ময়েশের তিন মাস জেল হয়ে গেল। ময়েশের বউ বিশুকে দাওয়ায় অব্দি উঠতে দিলে না। হেঁটে হেঁটে আদালতের গাছতলায় বসে কেঁদে কেঁদে বিশুর চোখ ঝাপসা হয়ে গেল একেবারে।

ময়েশকে দেখতে গেল বিশু জেলে নিয়ে যাবার কালে। তা ময়েশ বললে, ছেলে-ছেলে কারে কচ্ছ? তুমি আমার কেউ নও। আমি তোমার কেউ নই!

আমার কি হবে ময়েশ?

যাও, ভিখ মাঙ্গা যেয়ে!

অঝোরে কাঁদল বিশু। পুরনো মনিববাড়ীতে ওর জায়গা নেই, দেশঘর বলে ও কিছু মনে করতে পারে না। ঝি কাজ করে স্বামীর নাম ডুবিয়েছিল একদিন, আবার অতিলোভ করতে গিয়ে তার দোষে ছেলেটা জেলে গেল।

তিনটে মাস আমায় চরণে ঠাঁই দেন মা! মাইনে চাই না, বাসনকোসন মাজব, পড়ে থাকব। ময়েশ না বেরোলে তো আমার উপায় হবার নয়।

গিন্নীর দয়া হল। বললেন, তোমার ঘর তো রাখিনি বাছা। তবে ঐ গোয়ালঘরে যদি পড়ে থাকতে পার তাই দেখ।

বুড়ো গাইটাও দুধ দেয় না। বিশুরও আর তেমন গতর নেই। রাতে শুয়ে শুয়ে গোরুটার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনে আর ভাবে, গোরু মরলে মুচি চামড়া নেয়, শিং-জোড়া বিক্রী হয়। মাংস শেয়াল-শকুন খায় বটে কিন্তু হাড় থেকে সার হয়। বিশু মরলে কি হবে? ময়েশ ওকে আগুন দেবে তো?

জেল থেকে বেরিয়ে ময়েশ ওকে ক্ষমাঘেন্না করে আশ্রয় দেবে এই ভরসায় জেল-খালাসের দিন বিশু গিন্নীমার নাতি জটেশ্বরের সঙ্গে জেলের ফটকে গেল।

ময়েশ খালাস হয়ে গিয়েছে আগের দিন। চলে গিয়েছে কোথায়। বিশুকে ওরা ঠিক তারিখটা অব্দি বলেনি। ঐ ময়েশের শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা। বা কি অনামুখো গো! বিশু তো ওকেও সাধ্যমত পান খেতে দিত, সেপাই বাবা বলে গড় হয়ে নমস্কার করত।

ঝিমঝিমে বিষ্টি! ভাদুরে আকাশে ঘোলা মেঘ। ট্রাম থেকে নেমে পড়ল বিশু। জটেশ্বরকে বলল, তুই যা বাবা, আমি এট্টু মায়ের মন্দির হয়ে আসি।

সেই যে নামল, আর ফিরে গেল না বিশু। মায়ের মন্দিরের চারদিকে সোম্‌সারের ভিখিরী। কারো কি ঘর ছিল না গো? কারা বুঝি প্রেতকাজ করে বেরুচ্ছে, কুচো-কুচো এক পয়সা ছিটোচ্ছে। বিশুও একটা পেল, অবাক হয়ে চাইল। ওর পাশের মেয়েটা বলল, নতুন বুঝি? তা এট্টা নারকেলমালা, না হোক অ্যালুমিনির বাটি আনবে তো? এখানকার কথা কে বললে ঃ পাঁচী? দেখ, বাবুরা বলে গতর খাটিয়ে খাও! গতর খাটাবার চেয়ে এ এমন মন্দ কাজ নয়কো। তুমি আমাদের কাছে থাক বাছা। তোমার মুখখানা বেশ ভন্দর-ভন্দর, কাঁদ—কাঁদ। দেখে বাবুদের মায়া হবে। খাবে?

জীবনে এই প্রথম বিশুকে কেউ আদর করে ডাকল, সমাজে নিতে চাইল।

বিশুর চোখ জলে ভেসে গেল। কত বড় সমাজের মানুষ সে এখন! শ্রেণী হারাতে হারাতে সে এখন ভারতের নিস্ব-দরিদ্র-উপবাসীর শ্রেণীতে পেঁীছে গিয়েছে। তার শ্রেণী তার সমাজ সব চেয়ে বড়- সব চেয়ে বেশী সে সমাজের ক্ষমতা। ভিখিরীর জাত মারে কে?

মায়ের মন্দিরের ওপরে ফ্যাকাশে নীল আকাশে কাক উড়ছে। এখন ঐ আকাশ তার মাথার ওপর ছাত, তার ঘরে চাঁদসূর্য আলো দেয়। মেঘ ছায়া ধরে। বিশালাক্ষীর ঘর এখন আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বিশ্বসংসারের সব পথঘাট বিশুর। বিশু নিজের ঘরে হাঁটতে লাগল।

১৩ জন্মদিন

দীপ্ত অলিভ পায় নি জেনে অদিতি ভীষণ রেগে গিয়েছিল। অঙ্কুরের জন্মদিন বলে কথা। দীপ্ত তার একমাত্র ছেলের দশ বছরের জন্মদিনে অলিভ আনতে পারল না, অদিতি বেইজ্জৎ হয়ে গেল যাকে বলে।

—কিছু করা যাবে না, সর্বনাশ হয়ে গেল।

দীপ্ত বলল, সর্বনাশ?

—বাকি থাকল কি?

—বাজারে জলপাই কোথায়?

—সে আমি জানি না?

—জলপাই দিয়ে তো চাটনি বানাতে বাপু! আমসত্ত আর আঙুর, নয় আমসত্ত আর খেজুর…

অদিতির মুখ আপনারা দেখেন নি, ওর চুল দেখেছেন দূরদর্শনে। হ্যাঁ, একটি তত-বিখ্যাত-নয় শ্যাম্পুর বিজ্ঞাপনে দেখেছেন ওর পিঠছাপানো চুল, দেখেছেন ওর চুলে কত রকমের খোঁপা। মুখ ও দেখায় না, কেননা মুখ ততো সুবিধের নয়।

সেই চুল ঝাপটে অদিতি ঝামরে উঠল।

—চাটনি আর চাটনি। জানো তো শুধু চাটনি আর পায়েস আর মাছের কালিয়া।

—না অদিতি। মা অত কিছু পারতেন না, তবে জন্মদিনে ছেলেমেয়েদের একটু পায়েস করে দিতেন।

—জন্মদিনই করতেন না?

—বাবা পেতেন পাঁচশো আশি, আমরা ছিলাম পাঁচজন, ঘটা করে জন্মদিন কে করবে?

—তোমার মুখে এক কথা!

সত্যি, দীপুর লজ্জাও নেই। বেশ তো, তোমরা গরিব ছিলে, থাকতে বাদুড়বাগানে ঠাকুরদার বাড়িতে তোমাদের ভাগে পাওয়া দুটো ঘরে, একখানা লেপে তিন ভাই শুতে। সে কথা বার বার বলার দরকার কি? মামারা পড়িয়েছিলেন বলে তিন ভাই কৃতী তো হয়েছ। বড় কাজও করো, ফ্ল্যাটও কিনেছ, ছেলেকে দামী স্কুলে পড়াচ্ছ, পাহাড়ে হস্টেলে রেখেছ, কি করছ না?

—ছেলেটারও কপাল, ছুটির সময়ে জন্মদিন পড়ে!

—কপালখানা মন্দ কি?

—তুমি বুঝবে না, শুধু একশোটা অলিভ…

—আবার অলিভ!

অদিতি রাগে ক্ষোভে মরে গেল যেন।

—ওর বন্ধুরা তো আসবে তিনজন। আসলে ওর মামাতো, মাসতুতো, পিসতুতো ভাইবোনেরা আসবে না?

—আসুক না, প্রতিবারই তো আসে।

—ওর মামী, মাসীরা, পিসিরাও তো আসবে।

—সেও তো বরাবর আসে সবাই।

—ওঃ, তোমাকে বোঝানো…

—বেশ, বসলাম চেপে। বোঝাও আমাকে।

অদিতি হিসহিসিয়ে বলল, প্রত্যেকের ছেলেমেয়ের জন্মদিনে আমরা যাই, আমরা খাই। এ নিয়ে কি রকম টেনশান চলে জানো? প্রত্যেকে প্রতি বছর নতুন নতুন মেনু করে…

—তুমিও তো জয়াদির রান্নার ক্লাস করছ। তুমিও নতুন কিছু করে

দেখিয়ে দাও।

অদিতির চোখে জল নামল!

—নতুন কিছু করার নেই। চিংড়ির চীজকারী? মাংসের স্প্যানিশ পোলাও? কাঁচা আমের পায়েস? সব ওরা করে ফেলেছে। গতবার কমলা-লেবু দিয়ে মাংস রাঁধলাম, তোমার ছোট বোনটি তো কম নয়, বলল, গতবার দিদি এটা করেছিল না বউদি?

দীপ্ত হতাশ হয়ে বলল, ওরা তো ভাত-রুটিও করে। ওরা করে বলে তুমি ভাত-রুটি করবে না?

—ওঃ! অলিভের পোলাও আর অলিভ-চিকেন, এ দুটোই ওরা জানে না। জয়াদির কাছ থেকে লিখে আনলাম কেন? একেবারে নতুন রেসিপি।

—রক্ষে করো অদিতি, জলপাই দিয়ে মুরগি!

—দেখ, রঙিন ফোটোটা দেখ, কি দেখতে!

—একটা কথা বলব?

—কি আর বলবে!

—তবু বলি।

—কি?

ভাত, মুগের ডাল, ভাজা, মাছ, মাংস, পায়েস—একেবারে দেশী রান্না করো তো। কেউ করে না, সবাই অবাক হয়ে যাবে, খুশি হয়ে খাবে।

—অসম্ভব।

—অতো দামী রুই মাছটা দিয়ে কি করবে?

মটরসুটি দিয়ে রোস্ট!

—কেন, ওটা কি তাতার খুব প্রিয়?

—তাতা? তোমার ছেলে তো জানে শুধু মাংস খেতে। তাতার জন্যে ভাবছিই না।

—সে যা ভালোবাসে তাই করো।

—বড়রা আসছে যে! আমার একটা প্রেস্টিজ নেই?

—এ বছর জলপাই! আগামী বছর কি করবে?

অদিতি সগর্বে বলল, জয়াদিকে অত টাকা দিয়ে রান্না শিখছি কেন? উনি বিদেশ থেকে সবচে' নতুন রান্নার বই ম্যাগাজিন আনান। ওঁর কাছে শিখে তবে না সুমতি প্যাটেল বাড়িতে রান্নার ক্লাস খুলল। চার হাজার টাকা রোজগার করছে।

দীপ্ত বলতে পারত, ছবি আঁকা, ইকেবানা, কনে সাজানো, কত ক্লাসই তো করলে। কোন্‌টায় তুমি লেগে থেকেছ?

বলতে পারত। বললেই ঝগড়া হত। তাই ও বলল, তাতা কোথায়? তাকেই তো দেখছি না।

—ভি, সি, আর দেখছে।

—বেশ, বেশ ! হয় ভি. সি. আর নয় কমিক্‌স, নয় ইলেকট্রনিক গেম্‌স !

—সবাই করে, ওর বন্ধুরা। করবে না কেন ? ওর বাবা তো গরিব নয়, আর ওর মা ওর মন বোঝে।

—হ্যাঁ…তাই ঠিক। কোথায় চললে ?

—নিউ মার্কেট। অলিভ আনব।

হ্যাঁ, জলপাই ফুএল, জয়াদির কাছে শেখা রান্নাও হল। বাড়িতে টুনি বাল্‌বের মালা, মস্ত কেক, তাতার বন্ধুদের জন্যে দামী উপহার, কিছুই বাদ থাকল না।

আর কাজ করতে গেলেই অদিতির মেজাজ থাকে তুঙ্গে। দীপ্ত জানে, দু'জন কাজের লোক নিয়েও অদিতি কিছুতে সামলাতে পারে না কিছু।

তাতা বলল, মামি ইজ হলারিং।

—না রে, যুদ্ধ করছে।

—উইথ হুম ?

—নিজের সঙ্গে।

বিশুর মা আর কাজলী খাবি খাচ্ছিল। গার্লিক গ্রেট করো, লেমন স্কুইজ করো, কড়াই চাপাও, এ রকম সব হুকুমের বান ডাকছিল। বিশুর মা আদা বাটতে বাটতে বলল, অ কাজলী ! এ যে একটা বিয়েবাড়ির যজ্ঞি।

কাজলী বলল, করবে না কেন ? থাকলেই করে।

—হাত তুলে এট্টা সামগ্‌গিরি দেয় নে কখনো।

—যাদের থাকে, তারা দেয় ?

বিশুর মা অত মুখ করতে পারে না। চুপ করে গেল।

—তুমিও যেমন বোকা, মাসি !

কাজলী বোকা নয়। চাল-ডাল-মাছ-মাংস-সাবান যা পারে তাই চুরি করে। বিশুর মা সাহস পায় না।

—আমার ভয় করে যে ! কিছু করি নি তাতেই বিশ্বনাথের দোর ধরে একা বিশু রয়েচে, পাঁচটা ছেলেমেয়ে গেল, সোয়ামি গেল, পাপ কল্লে দেবতার মন্যি লাগবে না ?

কাজলী এক স্বামীর দ্বারা দু'বার পরিত্যক্তা হবার পর বর্তমানে মরীয়া।

সে হি হি করে হেসে বলল, আমি দেবতার ভয় করি না। টি. ভিতে সেই মেয়েটার ফিলিম দেখনি ? আমিও ওর মতো ভেগে যাব।

—লতিফের সঙ্গে ?

—নিচ্চয়। ডাইভারি করে, বে' করবে।

—বাড়িতে মানবে ?

—বাড়ি যাচ্চে কে ? আমরা তো বেলেঘাটায় থাকব।

বিশুর মা চুপ করে গেল। কাজ আজকে পাহাড়প্রমাণ। সব সেরে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে গড়াবে। বউদিকে কেমন করে কথাটা বলা যায়, কখন

—বউদিকে বলেচো মাসি ?

—কাল যেমন ম্যাজাকটা নরম ছিল, তাতে বলিছিলাম, সেও বলল –"বেশ তো।" আজ সকাল হতেই ম্যাজাক গরম, কাপগুলো ভাঙল কেমন ! কে বলবে ?

—নতুন কাপড়টা পরবে তো ?

—থাম্ দিকি তুই। ঘরে বিশু রয়েচে। সকালে তো হয় নে আমার। রাতে দুটো রাঁদি। সকালা পান্তা খায়, দুপুরে মুড়ি। না খেলে ও খাবে কি ? খোঁড়া ছেলে টলমল করে। "রেঁদে নে" বলতে ভস্সা হয় নে...

—পা সারচে ?

—ওষুদ মালিশ করচি, ঠাকুরের বেলপাতা মাদুলি করে দিইচি, লাঠি বিনে চলতে পারে নে, তবে একটু যেন ভালো।

—কোথা য্যানো মান্সা করেচো ?

—ওই নিমড়ে—বিশ্বনাথতলায়।

—নিয়ম পাল্না পারচো ?

—একনো তো পারচি।

কাজলী বলল, দ্যাকো ! ভালো হলেই ভালো।

আর অদিতি চেঁচিয়ে বলল, বিশুর মা! চারটে ডিম ফাটিয়ে দাও, টোম্যাটো বেটেছ ?

—এই যে দিচ্ছি !

—ইশ্ ! তিনটে বেজে গেল !

অদিতি দুপুরে খেল না। কাজলী খেয়ে উঠল সাড়ে চারটেয়। আর বিশুর মা কিছু একটা বলল, অদিতির কানে গেল না। দরজা বন্ধ করে ও শাড়ি বাছছিল।

বিশুর মা কাজলীকে বলল, বললাম তো জবাব করল না। একোন না গেলে টেন পাবু নি। বেস্তর দেরি হবে মা। সব্বস্ব কাজ সেরে রেকিচি।

—যাও না তুমি। আমি বলে দোব।

বিকেলে অদিতির ছোট বোনের কাজের লোক চলে এল। রূপা খুবই চটপটে, ঝকঝকে। বিশুর মাকে না দেখে অদিতি ক্ষেপে উঠেছিল, রূপা ওর হাতে জিন ও লাইম ধরিয়ে দিতেই রাগ নেমে গেল। রূপা ও কাজলী নতুন কাপড়ে, খোঁপায় ঝলমলে। বিশুর মা চলে গেছে বলে অদিতির স্বস্তিই হল। বিশুর মা দেখতে বিশ্রী, এতটুকু স্মার্ট নয়, অতিথিদের সামনে দেখানোর মতো নয়।

এ বাড়ির দারোয়ানের ভাইকে দীপ্ত একটা কাজ করে দেবে। ফলে সে ছেলেটিও অদিতির কাছে ডিউটি দেয়।

সন্ধ্যাটা ওরাই সামলে দেবে।

তবু অদিতি দীপ্তকে বলল, বিশুর মার কোনো সেণ্টিমেণ্ট নেই। ছেলেটার ন্মদিন, আজ তো থাকতে পারত।

দীপ্ত বলল, কোথা থেকে যেন আসে?

—জানি না। মনে থাকে না।

—বাড়িতে বোধ হয় কেউ আছে...

—হ্যাঁ, ওর ছেলে।

—আর কেউ আছে? কত বড় ছেলে?

—দেখ দীপ্ত! কাজের লোকের সঙ্গে আমি কামারাদোরি করি না, কোনো বরও রাখি না।

—যাক গে, রূপা এসে গেছে, বিজয়ও আসছে। রান্না-বান্না তো করে ফলেছ।

—মাছ, মাংস, পোলাও। জয়াদির কেটারার আনছে রাধাবল্লভী, ডাল, ছের ফ্রাই আর আইসক্রীম।

—তুমি তৈরী হয়ে নাও।

—হ্যাঁ। তাতার প্রেজেণ্টটা?

তখনি খোলা যাবে।

—বিশুর মা কাপড়টাও রেখে গেছে।

কাজলী মনে মনে বলল, ভিড়ে চ্যাপটা হয়ে সোনারপুর যাবে, নতুন কাপড় াতে পারে?

মুখে বলল, বউদি ফুল এসে গেছে।

—ফুল? লাভলি! অদিতি নেচে চলে গেল।

জন্মদিনটা খুব, খুব জমেছিল।

অলিভ-পোলাও আর অলিভ চিকেন খেয়ে সবাই মুগ্ধ। অদিতির দাদা লল, তুই একটা জিনিয়াস।

বউদি বলল, আগামী বছর কি করবে ভাই?

—দেখি!

সব মিটেছিল অনেক রাতে। সকালে উঠতেও দেরি হয় অদিতির। বেলা শটা বাজতে তবে ওর খেয়াল হয় যে বিশুর মা কাজে আসে নি।

—দেখেছ, আস্পর্ধা দেখেছ? এত বাসন, এত ওয়াশিং, তার মধ্যে এ কম...

কাজলী অবশ্য বলেছিল, মাসি পরশুও বলেছিল, আপনি "হ্যাঁ" বললেন। লকেও বলেছিল ..

—হোআট?

বলে অদিতি চেঁচাতে থাকে। কাজ, এত কাজ, কি বেইমান মেয়েছেলে াই দেখ!

দীপ্ত সটে করে চা খেয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু অদিতির মেজাজ দে
ও বিজয়ের কাছে গেল। বিজয় আর কাজলীকে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে দীপ্ত
সব কাজ করাল। অদিতি ভীষণ রেগে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দী
তাতাকে নিয়ে গেল লাঞ্চ খাওয়াতে। না, অদিতি দিন দিন অসম্ভব হ
উঠছে। কাজলী আর বিশুর মা তো সেদিন এসেছে, মাস তিনেক হল
কাজের লোক অদিতি রাখতেই পারে না। বিশুর মা লোকটা নিরীহ, খাটে
খুব।

—তোর মার মেজাজ, বুঝলি তাতা...

—অ'ফুল।

—কাজের লোকদের...

—উই শুড লাভ দেম, ফাদার বলেছেন।

—লাভ ?

—ইয়েস। দে আর হরিজন্স অ্যান্ড গান্ধী লাভড্ দেম, অ্যান্ড উ
ট্যু শুড !

দীপ্ত গলে গেল। না, স্কুলের নাম সার্থক। তাতা কি চমৎকার বুঝি
দিল।

—আমরা যদি কাজগুলো করি...

—উই শুড্‌নট। আমার ফ্রেন্ড্স করে না।

দীপ্ত চুপসে গেল।

—নে, আইসক্রিমটা খা।

তার পরদিন সকালে বিশুর মা এল।

অদিতিই চেঁচাতে শুরু করেছিল, দীপ্ত বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্
হঠাৎ একটা অচেনা গলার চিৎকারে ও বেরিয়ে আসে। বিশুর মার গলাই
শোনেনি কখনো, সেই বিশুর মা চেঁচাচ্ছে।

—কেন আসিনি তা তুমি জানতে নি ?

—নো-ও—ও—ও !

—এই দেখ দাদাবাবু, পরশু পই পই করে বলে গেচি যে আমি রোববার
আসবু নি।

—কিন্তু, কেন ?

বিশুর মা সতেজে বলল, আমার বিশুর জন্মদিন ছিল যে! আমি উনো
ঝাড়ব, নতুন মেটে হাঁড়িতে রেঁধে দেবো, আমার খোঁড়া ছেলের জ
মান্‌সা করিচি, সব বলিচি।

—ও ..তোমার ছেলে খোঁড়া ?

—জন্ম হতে এট্টা পা দুব্বল। টেনে টেনে চলে। বউদিকে সকল কতা
কাজে ঢুকিচি।

—কি বলেছ আমাকে ?

—সগল কতা। হেতা ভাত খাবুনি, নিত্য বিকেলের টেনে ঘরে যাব, কি বলি নি ?

দীপ্ত আস্তে বলল, তোমার ঘর কোথা ?

—সোনারপুরে নেমে আদ ঘণ্টা হাঁটতে হয়।

—শুধু ছেলে বাড়িতে থাকে ?

—আর কে আচে ?

—কত বড় ছেলে ?

—তাতার বইসি হবে। খাওয়া নি, মাকা নি, চ্যায়রা তেমন বাড়ে নে ওর।

অদিতি বোঝে যে দীপ্ত খুব লজ্জিত হয়েছে।

ও হিংস্র রাগে বলে, জন্মদিন আবার কি ? তুমি কি পার্টি দিচ্ছিলে ?

বিশুর মা ঈষৎ হাসে।

পার্টি দোব কেন ? নতুন একটা প্যান্ কিনে দি, নতুন হাঁড়িতে রাঁদি, সকালা পুজো দি।

দীপ্ত বলে, ইশ্! কাল এত খাবার ছিল!

বিশুর মা মাথা নাড়ে।

—এখেনে তো আমি চা অবদি খাই না। মুড়ি বেঁদে আনি তাই খাই। হেতা সব মদে-মুরগিতে ছোঁয়ানেপা, সে খাবার আমি বিশুকে দিতে পারি ? দেবতার দোর ধরা ছেলে, স—ব মানতে হয়।

অদিতি যেন চড় খায়।

—ছোঁয়ালেপা মানে ? এসব খাবার খারাপ ?

—খারাপ কেন ? খারাপ খেলে তোমাদের অত কান্তি হয় ? কিন্তুক আমাকে তো মানসা মানতে হবে।

—জন্মদিন বলে কাজ কামাই করা...

—খুব অন্যাই। আমাদের ছেলে যে! তা পন্নাম হই বউদি, আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দাও, আমি যাই।

—এখন পাবে না, মাসের শেষে পাবে।

—বটে ?

বিশুর মা এবার চেঁচাতে শুরু করে। দীপ্ত আর অদিতি ভয় পেয়ে যায়। প্রতিবেশী, চারদিকে প্রতিবেশী।

—চুপ করো বিশুর মা; আমি টাকা দিচ্ছি।

—চুপ করবো ক্যানে ? তো' মাগীর ছেলের জন্মদিনে খা করলি গতরে খেটে তুলে দিয়ে গিচি। আমার শিবরাত্তির সলতে খোঁড়াছেলেটার জন্মদিন ওর ষোলো বচর অবদি মানসা। সেটি কস্তে বলে ছুটি নিলাম..

—আমি শুনি নি বিশুর মা...

—শুনবে কম্নে ? একন মদের ঘোরে, তকন ট্যাবলেটের ঘোরে, সোয়ামি

মাগের ভেড়ো, দেখেও দেকে না। আমার সোয়ামি হলে..., আমার ছেলের জন্মদিনটা এতবড় অপরাধ হয়ে গেল ?

সবাই শুনতে থাকে চারপাশে। টাকা গুনে-গেঁথে নেয় বিশুর মা। যাবার কালে বলে যায়, সবাই বলিচিল বউটা পাজি, লোক পায়নে আর। তবুও বিশুর মুখ চেয়ে···আমাদের চেনাজানা লোকেরাই তো আসে, দেকব কেমন করে লোক পাও এবারে...

তাতা এবার ইলেকট্রনিক ট্রেনটি চালিয়ে দেয় ঘরে।

শব্দটা ভীষণ কানে বাজে দীপ্তর।

কোনোমতে দরজাটা বন্ধ করে ও।

ট্যাবলেট, একটা ট্যাবলেট, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তাতা ওদের দিকে ওরকম চোখে তাকিয়ে আছে কেন ? যেন এই প্রথম ওদের দেখছে !

১৪ রাক্ষস

শিশুর মত হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, বয়স্ক লোকও হতে পারে না।

বাজারে ঘুরতে ঘুরতে আমার কথাটা মনে হল। আজকাল বাজারে কোন জিনিসেই হাত দেওয়া যায় না, আমার সাধ্য নেই। যাঁরা বাজার করেন, তাঁদের দেখতে আমার ভাল লাগে। দেখে দেখেও কথা না বলেও কতজনের মনের কাছে পৌঁছনো যায়। একটি ছোট ছেলেকে আমি কত বছর ধরে দেখছি, দেখতে দেখতে সে পাঁচ থেকে দশে পৌঁছে গেল। রুগ্ন, কাহিল চেহারার ছেলেটি ওর রুগ্ন, কাহিল, গরিব বাবার হাত ধরে মাছের ঝুড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে চলে যায় আর কুমড়ো ডাঁটা কেনে।

এমনি কতজনকে দেখি, প্রত্যহ দেখি। কিন্তু আজ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লোভার্ত চোখে বড় বড় চিংড়ি কিনতে দেখে হঠাৎ ওই কথাটা মনে হল।

শিশুর মত হৃদয়হীন হয় না।

আমার শৈশবের কথা মনে পড়ল। ভুটুর দাদু ভবতারণবাবুকে মনে পড়ে গেল।

ওঁর মনে আমি নির্দয় আঘাত দিয়েছিলাম।

ভবতারণবাবু আমাদের পাড়ার জেঠু। ওঁর অনেক বয়স হয়েছিল। স্ত্রী এক ছেলে, বউ, ছ-সাতটি নাতি-নাতনীর ভরাভর্তি সংসার।

উনি যে আপিস থেকে পেনশন নিয়ে রিটায়ার করেন, ছেলে বরেনদা সেই আপিসেই ঢুকেছিল। উনি একশো আশি টাকা পেনশান পেতেন, বরেনদা পেত দুশো। বাড়িটা ওঁদের নিজেদের ছিল, দোতলা বাড়ি।

যখনকার কথা বলছি তখন আড়াই টাকায় মোটা চাল মিলত। সরু চালের মণ ছিল বড়জোর সাড়ে তিন বা চার টাকা। ছ আনা মণ কয়লা মিলত সরষের তেল ছিল ছ আনা সের। বাড়ির ওপর গাই এনে খাঁটি দুধ, টাকায়, চার সের, দুইয়ে দিয়ে যেত গোয়ালা। শীতকালে এই কলকাতাতেই বাজারদর অবিশ্বাস্যরকম নেমে যেত। তখনও উনচল্লিশের যুদ্ধ হয়নি। থলের প্রচলন ছিল না। চাকর ঝুড়ি নিয়ে বাজারে যেত।

শীতকালে দু টাকার বাজার করলে ঝুড়ি উপচে পড়ত। ইলিশের মরসুমে টাকায় চারটে গঙ্গার ইলিশ হরদম পাওয়া যেত।

সেই দিনকালে ভবতারণবাবু রোজ দু-আড়াই টাকার বাজার করতেন। বরেনদা আর বউদি তাই নিয়ে হাসাহাসি করতেন। শুধু জেঠিমা বলতেন, "মা গো! সেই চোদ্দ বছর বয়সে হেঁসেলে ঢুকেছি, আজও ছুটি পেলুম না।"

জেঠিমা রেগে রেগে বলতেন না, হেসে হেসেই বলতেন। সবাই জানত জেঠু যেমন বাজার করতে ভালবাসেন, জেঠিমা তেমনি রাঁধতে ভালবাসেন।

পাড়ার সবাই বলত, "দেড় সের মাছ, সাত-আটটা তরকারি রোজ এই এত খাওয়া? মা গো! ওরা কি রাক্ষস!"

রাক্ষস কথাটার মধ্যে কোন খোঁচা ছিল না।

বাবা বলতেন, "বাজার তো হয়ে গেল ভবতারণদা। আবার ছুটছেন?"

জেঠু হাঁটতে হাঁটতেই বলতেন, "কাগজ দিচ্ছে জান না?"

"কিসের কাগজ?"

"অর্ধোদয় যোগ পড়েছে তাই ভীমনাগের দোকান থেকে কাগজ বিলুচ্ছে। আজ রসগোল্লার সের ছ আনা। তাই ভাবলাম একবার গিয়ে—"

জেঠিমা বলতেন, "কি রাক্ষস তোদের জেঠু? ট্যাংরা মাছের ঝাল, কই-মাছের ঝোল, ঝালের ঝোল, তিন রকম ভাজা, এতেও হয় না? আবার রসগোল্লা চাই!"

'রাক্ষস' কথাটা খুব মিষ্টি করে বলতেন।

'রাক্ষস' কথাটা জেঠিমা বুক চাপড়ে চাপড়ে বলেছিলেন যেদিন জেঠুর ওষুধ আনতে গিয়ে বরেনদা চাপা পড়ে মারা যান।

"কি রাক্ষস তুমি! কি রাক্ষস আমি! জলজ্যান্ত ছেলেটাকে খেয়ে বসে রইলাম!"

তখন রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে দেখে আমাদের এমন সয়ে যায়নি। তাই বরেনদার মৃত্যুতে সবাই খুব দুঃখ পেয়েছিল। সবাই কেঁদেছিল।

কিছুদিন ও-বাড়ির জানলা কেউ খুলত না।

ভুটুরা স্কুলে যেত না। তারপর জানলা খুলে একদিন বউদি বারান্দায় দাঁড়ালেন। একদিন ভুটুরা স্কুলে যেতে শুরু করল। শুধু জেঠিমা আর রাঁধতেন না। ওঁর বুক ব্যথা করত। ভুটুর এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি এল কাটোয়া থেকে। সেই-ই রান্না করত।

জেঠু আবার বাজার করতে লাগলেন। উপযুক্ত ছেলে মরে গেলে মা কি কি করে সে সম্পর্কে পাড়ার লোকের স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। মা কাঁদে, খায় না, পাড়ায় কীর্তন শুনতে এসে কেঁদে উঠে যায়।

বাবা কি করলে ঠিকমত ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে কোন ধারণা ছিল কি না জানি না, তবে সবাই বলত জেঠু রাক্ষস হয়ে গেছেন।

রোজ কর ডাক্তারের কাছে গিয়ে অসুখ হয়েছে কি না দেখান, তারপর বাজারে গিয়ে ভাল ভাল খাবার জিনিস কেনেন। আবার ওদের বাড়ী মাছ-মাংস আসতে লাগল।

একদিন ওদের বাড়ি থেকে দুর্বো আনতে গিয়ে শুনলাম জেঠিমা বলছেন, "বউমার সামনে আমি ও মাংসের পিণ্ডি রাঁধতে পারব না, খেতে পারব না, দিতে পারব না। ছেলেটাকে খেলে তাতেও নোলা ঘোচেনি? এমন লালচ তোমার?"

রাগলেই জেঠিমা 'পিণ্ডি' 'নোলা' 'লালচ' এই বিচ্ছিরি কথাগুলো বলতেন।

জেঠু কি বললেন তা আমরা না শুনেই পালিয়ে এলাম। তবে পরে ভুটু বলল, "ঠাকুমা আর মাছ মাংস রেঁধে দেবে না দাদুকে। দাদু তাই নিজে নিজে মাংস রাঁধছিল।"

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ভুটু, তোর দাদু কি সত্যিই রাক্ষস হয়ে গেছে না কি রে?"

"মা ঠাকুমা তো তাই বলে।"

"কাঁচা মাংস খায়?"

আমরা পার্কের মেলায় নররাক্ষস দেখেছিলাম। লোকটা কাঁচা মাংস কচ-কচিয়ে খেত।

ভুটু বলল, "দূর, সে রকম রাক্ষস নয়। ঠাকুমা মাংস রাঁধতে চায় না তাই দাদু আজ হাঁড়িতে মাংস রাঁধল। এরপর কুকার কিনে নিজে নিজে রাঁধবে।"

তখনি রেবা বলল, "তোর দাদু সত্যিই রাক্ষস। অত লোভ হলে মানুষ রাক্ষসই হয়।"

"তোকে বলেছে!"

"রাক্ষসই তো!"

ভুটুর চোখে চিন্তা নেমে এসেছিল। আমরাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে-ছিলাম। আমাদের খেলুড়ীদের মধ্যে রেবাকেই আমরা সবজান্তার জায়গাটা দিয়েছিলাম। অচিদের বাড়ি কাচের চৌবাচ্চায় লাল মাছ ছিল। রেবাদের বাড়ি ছিল না। হিমাংশুদের বাড়ি একটা অর্গ্যান ছিল। আমাদের বাড়ির চিলে-কোঠায় বাড়িওয়ালার বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। ফুলের কাকা বিলেত গিয়েছিলেন একবার।

তবু রেবার গোজিশান সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ ওর দু হাত দু পায়ে পাঁচটার জায়গায় ছটা করে আঙুল ছিল। রেবার প্রত্যেকটি কথা আমরা

বিশ্বাস করতাম। রেবার মা বলতেন, "পাঁচটা আঙুল তো সবারই থাকে, ছটা আঙুল আছে যখন ও মেয়ে সামান্য নয়।"

আমরাও রেবাকে সমীহ করতাম। ওর কথা শুনেই আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি জেঠু রাক্ষস। তখন থেকেই হিমাংশু আর অচি ওঁকে 'ফলো' করত।

ওঁর হাঁটা আঁদ্দ পালটে গিয়েছিল। হাসি নেই, কথা নেই, মাটির দিকে চেয়ে হনহন করে উনি হেঁটে যেতেন। পেছন ফিরেও দেখতেন না হিমাংশু আর অচি ওঁকে 'ফলো' করছে কি না। ভুটু আমাদের খবর দিত আজ দাদু মাংস আর দই কিনল। আজ দাদু পাকা পেঁপে আনল।

ভুটু বলত, "শ্যামবাজার থেকে পিসিমা এসে কি সব বলছিল। ওর শ্বশুর বাড়িতে সবাই দাদুকে নিন্দে করছে।"

ভুটুটা বেজায় বোকা ছিল, তাই একদিন এসে বলেছিল, 'দাদা আমাদের দশ দিতে চায়, ঠাকুমা নিতে দেয় না।"

রেবা বলেছিল, "দেবে কেন? তোর দাদু রাক্ষস তো?"

জেঠুর খাওয়া নিয়ে ওদের বাড়িতে খুব বিচ্ছিরি সব কথা হত। বাবা খুব রাগ করতেন। মাকে কি যেন বলতেন। মনে হত জেঠিমার ওপরই রাগ করতেন।

সেবারই গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি গিয়ে টাইফয়েডে ভুটু মরে গেল। সবাই বলল ওদের বাড়িতে শনির দৃষ্টি লেগেছে।

এখন আর কেউ ভাবেনি বড় নাতি মরে গেলে জেঠু কি করবেন। সবাই ওঁকে ভয়-ভয় চোখে দেখত।

আমরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। রেবা বলেছিল পুজোর সময় শিউলি ফুল কুড়োতে এবারও ভুটু আসবে। ভোররাতে ডাকবে। জেঠুর সামনে যেতেও কেন যেন ভয় পেতাম।

ওঁর সামনেই আমায় পড়তে হয়েছিল।

কর ডাক্তারের কাছে আমি কাকার সঙ্গে দাঁতের ব্যাথার ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম। এন্তার মিষ্টি খেতাম, দাঁতে পোকা হয়েছিল, লবঙ্গের তেল দিলে ব্যথা কমে যেত।

দেখলাম জেঠু বসে আছেন। যেন রাক্ষসই একটা। এতখানি থপথপে শরীর, মাথার চুল প্রায় সাদা, কোঁকড়া, রুক্ষ। ওঁর পাশে একটা পোটলা। আমি জানতাম তাতে দুটো কমলালেবু, দুটো কলা, একটা সন্দেশ আছে।

আমাকে উনি বললেন, "এদিকে আয়।"

আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

"নে, লেবু নে!"

আমি কথা বললাম না। কাকা নিচু গলায় বললেন, "দিচ্ছেন যখন, নাও! উনি বলছেন, নাও!

আমি কেঁদে বলেছিলাম, নেব না। জেঠু রাক্ষস, তাই এত এত খায়। তাই ভুটু মরে গেছে। আমি নেবু নেব না।”

কাকা আর কর ডাক্তার আমাকে একসঙ্গেই ধমকে ওঠেন কিন্তু সহসা ভবতারণবাবু হো হো করে কেঁদে উঠেছিলেন। আমার হাত ধরে বলেছিলেন, “ওরে, আমি লোভে খাই না? কপাল আমার খাওয়ায়। বরেন নেই, নাতিটা চলে গেল, এতগুলো নাতনী ঘরে। আমার পেনশনেই তো ভরসা। আমি যদি না খাই, না বাঁচি, ওরা তো ভেসে যাবে। ভুটুর মা, বরেনের মা, সবাই... ওরে আমি লোভে খাই না রে. কপাল আমায় গলায় পা দিয়ে খাওয়ায়।”

কাকার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উনি আমাকেই বোঝাতে চাইছিলেন কথাগুলো। যেন আমি বুঝলেই উনি শান্তি পাবেন। তারপর হো হো করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিলেন।

তারপরের বছরই জেঠু মারা যান।

ভাসিয়ে চলে গেলে? জেঠিমার বন্য, দুর্বার আর্তনাদ এখনও আমার কানে বাজে।

তাই, কোন বৃদ্ধের মুখেচোখে লোভ দেখলেই আমার ভবতারণবাবুর কথা মনে পড়ে যায়।

শিশুর মত হৃদয়হীন ও নির্দয় আমি কারুকে দেখিনি।

১৫ ভাত

সকাল থেকে সন্নেসীচরণ ভাত খাবে বলে তৈরি। হাইড্র্যান্টের জলে স্নান করেছে। উলঙ্গ হয়ে পার্কের রেলিঙে কাপড়টা শুকিয়েছে। তারপর এসে রায়দের গাড়িবারান্দায় বসে আছে। রোজ যে-বাড়িতে ভিক্ষে চেয়েও মেলে না, আজ সে বাড়িতে পাত পেড়ে খাবার নেমতন্ন।

সন্নেসীচরণ এই পার্কেই ঘুমোয়। ঠিকে ঝি তা জানত। কাল ঠিকে ঝি কাকভোরে এসে ওকে বলল, কাল বাবুদের বাড়ি ঠিক দুকুরে ভাত খাবি।

আমাকে বলতেছ?

হ্যাঁ রে। তোরেই ডাকতে বলল।

ভাত খাব?

হ্যাঁ। কি যেন পুজো কত্তেছে মা। ঠিক দুকুরে ক্যাঙালীরে ভাত দিতে হয়। তা সকাল-সকাল যাস। টাইনে খেতে হবে।

ভিক্কেয় বেরোব নি?

না, এট্টা টাকা ক্যাঙালী বিদেয়ও পাবি।

ভাত হেথাকে এনে খেতে দেবে?

কেন? ওই নুলীকে দিবি?

ও-ও ভাত খায় না, আমিও খাই না কদ্দিন। তাই—

না বাপু, বসে খেতে হবে। না পারিস তো বল, ভিখমাঙাতে ফুটপাতর ভরে আছে, লোক খুঁজিগা।

না না, আমিই যাব।

সকাল থেকে সন্নেসী গাড়িবারান্দার ছায়ায় বসে আছে। বাড়িতে কি পুজো কে জানে! তবে আজ ওর মান খুব। ড্রাইভার, ঝি, চাকর, রাঁধুনী সবাই ওকে দেখে দেখে যাচ্ছে। দরোয়ানটা ওর দিকে চেয়ে বসে আছে। যেন পাহারা দিচ্ছে। চাকরটা আবার একবার এসে ওকে একটা বিড়িও খাইয়ে গেল। সন্নেসীর চোখে ছানি। নইলে ও বুঝত সবাই ওর দিকে যখন চাইছে, চোখে কৌতূহল, আতঙ্ক, করুণা।

ঝি একবার এসে পান খাইয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, ই কি মহাপাতক গো!

সন্নেসী শুনতে পেল না। ও হেলান দিয়ে বসে ভাতের স্বপ্ন দেখছে। ভাত, গরম ভাত, ওর কাছে স্বপ্ন বই কি! সেই কবে থেকে কলকাতার কাঙালী, ভাত ওর কাছে স্বপ্নের অতীত স্বপ্ন। এখন ওর দেহ গলিত, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, সর্বাঙ্গে ব্যথাবিষ। এই পার্ক থেকে হাজরার মোড় অব্দি অলিগলি ঘুরতেই ওর শরীর এলে যায়। রোজ চার আনা বাট্টা দিতে পারে না বলেই মাগনদাস ওকে দল থেকে বের করে দিয়েছিল।

দলের ভিখিরি সকালে চা-রুটি পায়, সন্ধ্যেয় ডাল-রুটি। চাল, কাপড় আর চার আনা মাগনদাস নেয়। সন্নেসী যখন থেকে আর পারল না তখনি মাগনদাস ওকে বের করে দিল। সেই জন্যেই তো মাগনদাসের দখলী ফুটপাত ছেড়ে পার্কের গাছতলায় নির্বাসন। মাগনদাস বলেছিল, রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে ভিখ্ মাঙ্। তাতেও পয়সা।

সন্নেসী বলেছিল, পারবুনি। ডর লাগে।

কেন?

যারা হাঁটতে চলতে দেখেছে, তারা পথে গড়ালে মুখ চিনে মারে যদি? সেই লালনকে যেমন মেরেছিল?

তবে ভাগ্! চট, টিনের কৌটো, সব সুখনকে জিম্মা করে দিয়ে যা। কোনটা তোর নয়।

সব দিয়ে দিব?

মাগনদাস কান চুলকে বলেছিল, স—ব! বেশি কথা বললে পরনের কানিও খুলে নিব। ছুপনকে কাপড় কেড়ে নিয়ে কাগজ পরিয়ে বের করে দিয়েছিলাম মনে নাই? টিন চট, তোকে দিব কেন? আমি যেমন তোর মাহাজন, আমার মাহাজন নাই? মাসে মাসে হিসাব দিতে হয় না? যাঃ, ভাগ্ এখান থেকে।

ভয়ে কেঁপে পালিয়ে এসেছিল সন্নেসীচরণ। মাগনদাস তার মহাজন,

মাগনদাসের ওপর আরেক মহাজন আছে, তার ওপরেও বুঝি আরেক মহাজন আছে। কোন মানুষই নিজের নয় তবে? ভাবতে গিয়ে সন্নেসীর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ভিখ মাঙে, যা পায় মাগনদাসকে দেয়। অন্য ক্যাঙালীদের গায়ের ওমে জড়াজড়ি করে ঘুমোয়। ব্যস, এই হল সন্নেসীর জীবন ও জগৎ। কিন্তু সে জীবন ও জগতের যে এত এত নিয়ন্তা আছে তা কে জানত?

ভিখমাঙারা বড় নির্দয়, নির্মায়া। দল ছাড়ার পর থেকে কেউ শুধোয়নি, হ্যাঁ রে, ভিখ জোটে?

বুড়ো হতে কষ্টের শেষ নেই। পথে পথে যারা ঘোরে, তারা দলের ভিখিরি। সন্নেসীকে ওরা মারবে বলে ভয় দেখায়। তাই ওরা সবাই চলে গেলে সন্নেসী ঠিক দুপুরে বেরোয়। ঠিক দুপুরে কে কাকে ভিক্ষে দেয় বল? তাই সন্নেসী মাসে বিশদিন বাতাস আর কলের জল খায়।

কিন্তু আজ ও ভাত খাবে। অনেক ভাত। চাকরটা বলেছে, যত ভাত, যত ডাল, যত মাছ পারবি খাবি। পেসাদটা আগে খেয়ে নিবি।

সন্নেসী ভাতের স্বপ্নে চোখ বুজল।

ভেতরে তখন গুপ্তপুজো শেষ হয়ে এসেছে। বুড়ো কর্তার দুই বিয়ে, দু-পক্ষে সাত ছেলে, চার মেয়ে, দু বউই জীবিত।

কর্তার অসুখ খুব। ভাইরাস কোথায়, কিভাবে কাজ করছে, ধরতে চেষ্টা করে করে ডাক্তাররা এলে দিয়েছে। আগে যত ঝগড়া-বিবাদ থাক, এখন দুই গিন্নি, এগারো ছেলেমেয়েতে খুব একতা। সেই কবে এক উইল করে কর্তা তাঁর প্রণয়িণী (অধুনা মৃত) হেলেন রানীর ছেলেকে সম্পত্তির এক ভাগ দিয়ে গেছেন।

সে ছেলে লোচ্চা লম্পট। কিন্তু উইলের কথা সেও জানে।

কর্তা ভেবেছিলেন, হাতেও ছিল, নব্বুই বছর বাঁচবেন। ইদানীং বলতেন, উইল পালটাব। মদনাকে কিছু দেব না।

জ্বর হতেই বলেছিলেন, সেরে উঠে উইল পালটাব।

কিন্তু ছিয়াত্তর না হতেই সামান্য জ্বর থেকে এমন কাণ্ড দাঁড়াবে কে ভেবেছিল? উইল না পাল্টাতেই কর্তা মরে গেলে মহা মুশকিল। উইল যে অ্যাডভোকেটের কাছে, তিনি আবার, কি ঝামেলা, পয়সায় ভোলেন না। এই তৈরি উইল নস্যাৎ করার কেসে সেদিনই একবার ফেঁসেছেন। এখন তিনি কিছুতে উইল নড়চড় হতে দেবেন না।

আসল কথাও সবাই জানে। মদন বর্তমানে অত্যন্ত শক্তি ধরে। মদনকে চটিয়ে অ্যাডভোকেট বেশি দিন বাঁচতে পাবেন না।

কর্তা সেরে উঠে উইল পাল্টালে সব ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু তিনি অজ্ঞান, অচৈতন্য। ডাক্তাররা এলে দিয়েছে।

তখনি বড় ছেলের শ্বশুর দেশের বাড়ি থেকে তান্ত্রিক আনান। গুপ্তপুজো চলছে। সাতদিন ধরে দোর বন্ধ করে কি হচ্ছে কেউ জানে না। তবে আজ,

কর্তার সকল ব্যাধি ও আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনা একটি সরষের ভরে সেই সরষে কলায় পুরে কলাটি খাইয়ে একজনকে এই পুজোর নিবেদিত অন্ন খাওয়াতে হবে।

লোকটা মরে যাবে। কর্তা বেঁচে উঠবেন। সে লোক বুড়ো-হাবড়া হোক, নুলো বা খোঁড়া বা বিকলাঙ্গ হলে চলবে না।

না। কোনো সুস্থ-সবল দেহ মানুষের দরকার নেই। সেই জন্যেই সন্নেসীর নিমন্ত্রণ। বড় ছেলের শ্বশুর এই তান্ত্রিককে হয়-কে-নয় করতে দেখেছেন। তান্ত্রিকও বলেছেন, আমার চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয়নি।

সেই জন্যেই কর্তার উচ্চশিক্ষিত, বড় চাকুরে, বিলেত-ফেরত ছেলে-জামাই-মেয়ে সবাই গুপ্তপুজোয় সম্মতি দিয়েছে। তান্ত্রিক ইংরিজী জানেন। তাঁর পুজোবিধির সপক্ষে তিনি ইংরিজীতে বহু কথাই বলছেন। তাতেও সকলে খুব অভিভূত হয়েছে।

মদন তার দলবল নিয়ে পাশের বাড়ি বসে আছে। তার জনৈক বিশ্বাসী ডাক্তার রুগীর ঘরে তার তরফ থেকে কর্তার ওপর নজর রাখছেন। কর্তার বৈধ ছেলেরা তাতে আপত্তি করেনি। রুগীর ঘরে তো কিছু হচ্ছে না। পুজো হচ্ছে নিচের একটা ঘরে। মদনও সব কথা জানে না। তবে আপত্তির কিছু সেও দেখেনি। দুরারোগ্য অসুখে পুজো-মানত-স্বস্ত্যয়ন কে না করে? মদন আজকাল ওপরমহলের খবর অন্তরঙ্গে রাখে।

পুজো শেষ হল।

হঠাৎ সন্নেসীর চটক ভাঙল ডাকাডাকিতে। একটা বেজে তিন মিনিটে ওকে কলাটি খেতেই হবে। সন্নেসী দেখল নতুন কলাই করা থালায় চুড়ো করা ভাত, মাছ, ডাল, তরকারী, দই, মিষ্টি। তান্ত্রিক ওর মাথায় হাত রেখে কি বলে ঘড়ির দিকে চেয়ে একটা ছোট্ট কলা খেতে দিলেন। পুজোর কলা যেমন হয়, ছোট ছেলের কড়ে আঙুলের মত ছোট।

সন্নেসী এক গ্রাসে কলাটা খেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ যেন জ্বলে উঠল প্রত্যাশায়, নিশ্বাস পড়ল স্বস্তির।

তান্ত্রিক বললেন, এখন ও খাক গে। আর চিন্তার কিছু নেই। চল, ভেতরে চল, একটু চা খাওয়া যাক।

সন্নেসীচরণ ভাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাত, এত ভাত, বাপ্ রে, দুনিয়ার সব খামারের সব মিহি চালের ভাত তার পাতে? চোখ ঘোলাটে।

হাতে টিপে ও বুঝে বুঝে ও খেতে থাকল। খেতে খেতে ওর পেট ফুলে উঠল।

খেতে খেতে বুকে চাপ ধরল, শরীর ভেঙে এল ভাতের ভারে, কিন্তু সন্নেসী খেতে থাকল। হাতড়ে হাতড়ে ও সব ভাত খাবে। এক দানা ফেলবে না। এমন সুগন্ধি ভাত, রুই মাছের তৈলাক্ত পেটি, পটলের ডালনা, মুগের ডাল, ও ফেলতে পারে? ও কেন? কোন্ ভিখমাঙা কবে এমন অন্ন খেয়েছে?

এ কি নেমন্তন্ন বাড়ির পাতা চেটে খাওয়া ?

সন্নেসীকে দেখতে দেখতে ঝি দারোয়ানকে বলল, এবার বেঁচে গেল গো! কিন্তু উ লোকটা ?

দূস্‌! ভিখ্‌মাঙা!

মানুষ তো ?

দূস্‌! ভিখ্‌মাঙাটা!

সন্নেসী খেতে থাকল। ও চোখেও দেখে না, কানেও শোনে কম, ঝি ও দারোয়ানের কথা ওর কানে ঢুকলই না।

তারপর, এক সময়ে, প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে ও বাড়ির মুখোমুখি পার্কে গেল। গাছের নিচে গড়িয়ে পড়ল, চোখ বুজল।

সকাল না হতে মহা গোলমাল। পার্কের গায়ের রাস্তা গাড়িতে গাড়িতে ভরে গেল। বোম্বাই খাট, ফুলের পাহাড়, কর্তা রাতেই মারা গেছেন। কাতারে কাতারে লোক আসতে থাকল। মদন নিজের অধিকার জাহির করবার জন্যেই শবযাত্রার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। কর্তার ছেলেরাও বুঝলেন, যখন হয়-কে-নয় করা গেলই না তখন মদনের হাতেই সব ছেড়ে দেয়া ভাল। ওকে চটিয়ে, শত্রু করে, এখন আর লাভ নেই। বরঞ্চ যে দিনকাল, ওকে সপক্ষে রাখাই লাভজনক।

কর্তাকে নিয়ে ব্যবস্থা করতে সবাই এত ব্যস্ত থাকল যে, বিকেলে পার্কে অবসরপ্রাপ্ত বুড়োরা এসে বসতে শুরু করার আগে কারও নজরেই পড়ল না উৎকৃষ্ট বাসমতি চালের ভাত বমি করে ভাত সর্বাঙ্গে মেখে সন্নেসীচরণ মরে কাঠ হয়ে আছে।

১৬ নিজের জন্য

তরা ভাবিস আমার নিজের লোক কেও বলতে কেও নাই। তাতেই বন্দী কইরা রাখছস। আমি মনসা মেলায় যামুই যামু। আমার লোকও লাগব না। আমি একাই যামু।

পিসির কথায় পলাশ খুব অসুবিধেয় পড়ে। বালিগঞ্জ সার্কুলারে ওর সাত তলার ডিলাক্স অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ওর কথার কোন দাম নেই। রিমাই সর্বেশ্বরী। এটা বিয়ের আগেই বলে কয়ে নেওয়া।

দুজনের রোজগার, জয়েন্ট নামে অ্যাপার্টমেন্ট। বাড়ির ভেতরে সব দেখবে রিমা। পলাশ কোন কথা বলবে না।

পলাশ তার অধিকারের বাইরে নাক গলালে ?

রিমার মিগ্রেন হয়।

রিমার নার্ভ বিদ্রোহ করে।

রিমা হিংস্র হয়ে যায়।

এ বাড়ির সব টাইমও রুটিনে বাঁধা।

রান্নাঘরে খাতায় সাত দিনে কি কি রান্না হবে কোন বেলা, তা লেখা। কোন্‌দিন ওয়াশিং মেসিনে কাপড় কাচা হবে, কোনদিন ওয়ার ও চাদর বদলানো হবে।

—ডিসিপ্লিন শেখো পলাশ। দেখবে কাজের সময় বেশি পাচ্ছ, বেশিক্ষণ রিল্যাক্‌স করতে পারছ।

—নিশ্চয়।

পার্ট-টাইমার দীপালি এসে সব রান্না করে রেখে যায়। সে আসেও চার দিন। ওয়াশিং মেশিনটার পরিচালনা পদ্ধতি পিসিমার মাথায় ঢোকানো যায় নি। ও কাজটা পলাশ করে শনিবার।

পিসিমা এর মধ্যে কোন কাজেই হাত লাগাতে পারেন না। তিনি থাকেন অবশ্য ওদের আত্মজা নিনার ঘরে। নিনা বর্তমানে, মাত্রই মাসখানেক হল, পুনা ফিল্‌ম ইনস্টিটিউটে পড়তে গেছে। নিনা থাকতে এ বাড়ির এমন অবস্থা হয় নি। নিনা যাবার সময়ে পিসিকে বলে গেছে, দিদা! মার ডিসিপ্লিনের ভয়ে পালাচ্ছি। আমি একদিন দারুণ অ্যাকট্রেস হব। স্মিতা পাতিলের মত।

—কিসের পাতিল?

—আঃ সেই যে সিনেমা দেখালাম, দুধ দোয়ানো বউটা, যার মোষ মরে গেলে তুমি দুঃখ করছিলে।

—করুম না? এট্টা মোষ মরল কি কম দুঃখ?

—তুমি একটা···তার মত অভিনয় করব।

—ওই কাম করস না নাতিন। তাহলে ভাস্কর তরে বিয়া করব না, ছিনেমা বইলা কথা!

—আসল কথাটাই তো জান না। মা জানে ভাস্কর চলে গেছে। সে তো ওখানেই গেছে।

—সর্ব্বনাশ! তর মা জানলে?

—বিয়ে করে নিলে কি করবে? আর, আমি কথা দিচ্ছি দিদা, বিয়ে কেন, কাজ পেলেই তোমাকে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি বেড়াবে, হাসবে, গিন্নি হবে, বুঝেছ? আর শোন, এই দুশো টাকা রেখে দাও।

—তর লাগব।

—বোক না। রেখে দাও। দিদা! তুমি গিন্নি হতে খুব ভালবাস?

—ল! মাথা সোজা রাখ। চুলটা বাইধা দেই।

—তোমাকে আমি অনেক জায়গা ঘোরাব। কি কি জায়গা যেন বল?

—তা ধর, গয়া—কাশী—প্রয়াগ—বিন্দাবন—কিছুই ত দেখি নাই।

—কে দেখাবে? আমার পিসি যেমন ধুরন্ধর, মা একটি! এরা তোমায়

বেরোতে দেবে ?

নিনার ঘরে ঢুকলে পিসি ওর টেবিল ঝাড়েন, মোছেন। রিমার নির্দেশ, আপনি মাটিতে শোবেন।

মাটিতেই শুতেন। কিন্তু নিনা তো কম জেদী ছিল না। ও বলত, দিদা কি ঝি, যে মাটিতে শোবে? আমার কাছে শোবে। নইলে আমিও শোব মাটিতে।

নিনা এ বাড়িতে একটা অঘটন। কে বলবে ও রিমার মেয়ে। মা বাবা বিদেশ ঘোরা, মস্ত বিজ্ঞাপন আপিসে দুই ডিরেক্টর। বাড়ি বোঝাই বিদেশী গ্যাজেটে। রিমা বাংলা বলে চিবিয়ে চিবিয়ে, ইংরিজিতেই ও সহজ।

পলাশও তাই। আগে অমন ছিল না, কিন্তু বউয়ের মত হবার সাধনায় ও নিজেও বাংলা ভুলে গেছে।

নিনা ইংরিজি ইস্কুলে পড়লে কি হয়, বাংলা বলত, শাড়ি পরত। কোমর ছাপানো চুলে পিসিকে দিয়ে একটা লম্বা বেণী বাঁধিয়ে নিত। মা বেরিয়ে গেলেই পিসিকে বলত, ঝাল ঝাল আলু চচ্চড়ি, আর লুচি করো দিদা। ভাস্করের মা ফার্স্ট ক্লাস নারকেল নাড়ু দিয়েছে। তুমি আর আমি খাব।

বলত, দিদা! তুমি তোমার জন্যে যে তরকারি রাঁধবে, আমার জন্যে রেখে দিও।

হবেই তো! ভাস্করের সঙ্গে ভাব ছোটবেলা থেকে। ভাস্করের বাবা মা ভীষণ রকম বাঙালী। ভাস্করের সঙ্গে নিনার ভাব খেলার মাঠে, পাড়ার পার্কে। রিমা মেয়েকে নিয়ে এই অ্যাপার্টমেণ্টে খুবই লজ্জিত। নিনা বাংলায় কথা বলে ও দাবী করে ওর সঙ্গে বাবা, মা বাংলা বলবে।

ও শাড়ি পরে। বাংলা বই পড়ে। বাংলায় থিয়েটার করে। কেন ও এমন হল ?

—ছোটবেলা থেকে পিসির কাছে থেকে .

নিনা একটু বড় হয়েই বলত, নিজেরা রাতদিন বাইরে থাকো, সেজন্যেই তো দিদাকে এনেছিলে। দিদা আমাকে দেখবে। নিজেরা বাইরে থাকবে।

কথাটা তো খুব সত্যি। পিসির কবে বিয়ে, কবে বিধবা তা মনেও নেই। বিয়ে অবশ্য আঠারো বছর বয়সেই হয়েছিল। তা হলে পঞ্চাশ বছর আগে। তখন ফরিদপুরে গ্রামের বাড়ি, অনেক ধান চাল, বাবা বিয়ের পর জেনেছিলেন, যে জমিজমা দেখে বিয়ে দেন, তা ছেলের জ্যাঠার। ছেলের বাবার, সেই সময়ের পক্ষে খুব নিন্দের ব্যাপার, বাগদী দোষ আছে। আর ছেলেও ম্যাট্রিক পাস নয়।

বাবার ছিল মেজাজ! ধান-চাল-বাগান-পুকুর-টাউনে বাড়ির মেজাজ। বাবা অষ্টমঙ্গলার পর পিসিকে যেতে দেন নি। বলেছিলেন, চাকরি কর, মানুষ হও, বউকে নিয়ে যেও। আমি হরকালী বসু, মেয়েকে চিরকাল পালতে পারি।

পিসির বরের বয়স মোটে বাইশ ছিল। ভাসা ভাসা মনে পড়ে—বেঁটে, রোগা মানুষ। লাজুক ও অপ্রতিভ।

শ্বশুরের কথা শুনে মনস্তাপে শ্বশুরবাড়ি থেকেই ঢাকা চলে যান। শ্বশুরকে লিখেছিলেন, "যোগ্যতা হইলে ফিরিব। আপনার কন্যাকে লইয়া আসিব।"

তিনি আর ফেরেন নি।

নিনা এ সব কথা বার বার শুনেছে।

—তারপর?

—বারো বৎসর সধবা চিহ্ন রাখছিলাম। বারো বৎসর হইতে সকলে আমারে লইয়া গাঙে ছান করাইয়া, শাখা ভাইঙা. সিদুর মুছাইয়া, থান পরাইয়া বাড়ি লইয়া আইল।' আমারে দেইখা মায়ে এক চিকুর পারল, 'অমানিষ্য আমার মাইয়ারে মাইরা ফালাইল!' তারপর টান কইরা মাটিত্ পরল আর মরল।

—ইশ! দিদা! কত কষ্ট পেয়েছ গো! তারপর কি হল দিদা?

—দ্যাশ তো ভাগ হইয়াছিলই। হকল বেইচা বুইচা এহানে আসা হইব, তা বাবারে কে বুদ্ধি দিল কে জানে। আমারে পাঠাইয়া দিল, তর বাপের ঠাকুরদার বারি রানাঘাটে। বাবার কেমুন বা ভাই, জানি না। পরে শুনছি যে বাবার এক দূর সম্পইর্কের মামার পোলা। দাদা আইসা থুইয়া যায়।

—সেই থেকে এখানে?

—আর কি করতাম? বাবায় দ্যাশ ছারল না, মায়ের লিগ্যা তাপাইয়া তাপাইয়া মরল দ্যাশেই। দাদা হকলটি বেইচা বুইচা আসামে গেল বউদিরে লইয়া খুরাশ্বশুরের কাছে। তিনি চা বাগানে মেনেজার। তা কি বা জ্বরে দাদা মরে, তা জানি না।

—দিদা! তোমার কেউ নেই?

নিশ্বাস ফেলেন পিসি।

—কেউই আছিল না। অহন তুই...

—তোমার টাকা নেই. কিচ্ছু নেই?

—তুই এতও জাইন্‌তে চাস!

—বল না?

—আমি জানি না। তহন শুনছি কত্ কথা! অহন মনেও পরে না।

তুমি বললে না। একদিন ঠিক শুনব।

সব কথা কেমন করে বলতেন পিসি? বাবার মনস্তাপ ছিল খুব। বলতেন। বিজয়রে আমিই ঢাকায় লইয়া আইন পরাই। রানাঘাটে আমিই পাঠাই। যৎদিন না হেয় দারাইছে, অর মায়েরে টাকা দিছি। হেই সকলের হিসাব করি না, তয় কি, হেয় বলত, কুনদিন ভগবান দিন দেয় তো আপনার লিগ্যা করুম! আজ আমার দরকার। হকলই বিতং কইরা লেইখা দিছি, অহন তোরে নিমন্ত্রণীও পাঠাইনা রে মা!

পাঁচ হাজার টাকা, বিশ ভরি সোনা, সবই ধরে দিয়েছিল দাদা ওই কাকাকে। বলেছিল, বাবায় কইছে, একখান জমি দ্যাখতে। আইয়া পইরা বাবায় বাড়ি কইরা নিব। মা চইলা গেল, মুক্তিরে আর রাখতে চায় না বাবা। কইছে আপনে অর নামে থুইয়া দিবেন টাকা আর সোনা। অর খরচ চইলা যাইব।

বিজয় কাকা সেই মুহূর্তে মহান হয়ে যান।

—হরকালী দাদা আমার লিগ্যা যা করেছেন ···সম্পর্ক বিচারে তিন রাইতের জ্ঞাতি, কিন্তু মনের বিচারে ..মুক্তি আমার মাইয়া। তার লিগ্যা ভাইব না। অর টাকা লাগব আমার বাড়ি থাকতে? এই দালান কোঠা, এই কইলকতায় পেকটিস, হকলডির মূলে তোমার বাবা। তোমরা আইয়া পরো। দিন থাকতে দিন কিইনা লও।

সেই দিন কেনা তো হল না। বাবা মারা গেলেন। দাদা বা খুড়শ্বশুরের কথায় কোথায় গেল। কি এক জ্বরে ধরল, হার্ট নাকি বিকল হল। দাদা লিখেছিল, "এখানে বর্ষা খুব বেশী। পুজার সময়ে তোমাকে লইয়া আসিব। এখানে টাকা আছে, তবে জল ভাল নয়।"

দাদাও মরে গেল।

বিজয় কাকা সে টাকা আর সোনা কি করলেন, পিসি জানেন না।

ও সংসারে তিনি হয়ে গেলেন আশ্রিতজন। খাটো খাও। আত্মীয় মানুষ, মাইনে দেবার কথা ওঠে না। জামা-কাপড়-তেল-সাবান পাবে। আঁশ রান্নার আগে নিরিমিষ যা হয় করে নিও। বিধবা বলে কথা। ঘি-দই-দুধ ভোজনে দেহে গরম বাড়ে। সাদাসাপ্টা খাবে, দম দিয়ে খাটবে।

আস্তে আস্তে পিসি আশ্রিতজনই হয়ে গেলেন। ও সংসার যতদিন বিজয় কাকার ছিল, ওঁদের কাছে।

তারপর পলাশের বাবা কলকাতাবাসী হলে তাঁদের কাছে।

পলাশের বাবাই দেশের ভাষা ছাড়েন।

তারপর পলাশের বড়দিদি নীলিমার কাছে।

নীলিমার বরের কিছু জ্ঞানগম্যি ছিল। সে পিসিকে মাঝে মধ্যে দশ-পাঁচ টাকা দিত।

—রাখুন পিসি। পান দোক্তা খেতেও লাগে।

নীলিমা ওঁকে ভয়েলের থান ধরাল, নরম সাদা জামা। বাড়িতে লোকজন আসে, কেতাদুরস্ত থাকতে হয় পিসি। নইলে আমার মাসিদের তো জানো, বলবে, পিসি হয়, ঝি করে রেখেছে?

পিসি মনে মনে বলতেন, ঝি কইরাই ত রাখছ মা।

জিনিসে ঘর ভরতেয়াছ, হকল ঝারা মুছা, নিত্য তিন চার পদ পাক করা, কি করি না?

নীলিমা জানত কাজ আদায় করতে।

তবু অদিতি দীপ্তকে বলল, বিশুর মার কোনো সেণ্টিমেণ্ট নেই। ছেলেটার জন্মদিন, আজ তো থাকতে পারত।

দীপ্ত বলল, কোথা থেকে যেন আসে?

—জানি না। মনে থাকে না।

—বাড়িতে বোধ হয় কেউ আছে...

—হ্যাঁ, ওর ছেলে।

—আর কেউ আছে? কত বড় ছেলে?

—দেখ দীপ্ত! কাজের লোকের সঙ্গে আমি কামারাদোরি করি না, কোনো খবরও রাখি না।

—যাক গে, রুপা এসে গেছে, বিজয়ও আসছে। রান্না-বান্না তো করে ফেলেছ।

—মাছ, মাংস, পোলাও। জয়াদির কেটারার আনছে রাধাবল্লভী, ডাল, মাছের ফ্রাই আর আইসক্রীম।

—তুমি তৈরী হয়ে নাও।

—হ্যাঁ। তাতার প্রেজেণ্টটা?

—তখনি খোলা যাবে।

—বিশুর মা কাপড়টাও রেখে গেছে।

কাজলী মনে মনে বলল, ভিড়ে চ্যাপটা হয়ে সোনারপুর যাবে, নতুন কাপড় নিতে পারে?

মুখে বলল, বউদি ফুল এসে গেছে।

—ফুল? লাভলি! অদিতি নেচে চলে গেল।

জন্মদিনটা খুব, খুব জমেছিল।

অলিভ-পোলাও আর অলিভ চিকেন খেয়ে সবাই মুগ্ধ। অদিতির দাদা বলল, তুই একটা জিনিয়াস।

বউদি বলল, আগামী বছর কি করবে ভাই?

—দেখি!

সব মিটেছিল অনেক রাতে। সকালে উঠতেও দেরি হয় অদিতির। বেলা দশটা বাজতে তবে ওর খেয়াল হয় যে বিশুর মা কাজে আসে নি।

—দেখেছ, আস্পর্ধা দেখেছ? এত বাসন, এত ওয়াশিং, তার মধ্যে এ রকম...

কাজলী অবশ্য বলেছিল, মাসি পরশুও বলেছিল, আপনি "হ্যাঁ" বললেন। কালকেও বলেছিল ··

—হোআট?

বলে অদিতি চেঁচাতে থাকে। কাজ, এত কাজ, কি বেইমান মেয়েছেলে তাই দেখ!

দীপ্ত সট্ করে চা খেয়ে বেরিয়ে যেতে পারত, কিন্তু অদিতির মেজাজ দেখে ও বিজয়ের কাছে গেল। বিজয় আর কাজলীকে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে দীপ্তই সব কাজ করাল। অদিতি ভীষণ রেগে ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। দীপ্ত তাতাকে নিয়ে গেল লাঞ্চ খাওয়াতে। না, অদিতি দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। কাজলী আর বিশুর মা তো সেদিন এসেছে, মাস তিনেক হল। কাজের লোক অদিতি রাখতেই পারে না। বিশুর মা লোকটা নিরীহ, খাটেও খুব।

—তোর মার মেজাজ, বুঝলি তাতা...

—অফুল।

—কাজের লোকদের···

—উই শুড লাভ দেম, ফাদার বলেছেন।

—লাভ?

—ইয়েস। দে আর হরিজন্‌স অ্যান্‌ড গান্ধী লাভড্‌ দেম, অ্যান্‌ড উই ট্যু শুড!

দীপ্ত গলে গেল। না, স্কুলের নাম সার্থক। তাতা কি চমৎকার বুঝিয়ে দিল।

—আমরা যদি কাজগুলো করি...

—উই শুড্‌নট। আমার ফ্রেন্‌ড্‌স করে না।

দীপ্ত চুপসে গেল।

—নে, আইসক্রিমটা খা।

তার পরদিন সকালে বিশুর মা এল।

অদিতিই চেঁচাতে শুরু করেছিল, দীপ্ত বাথরুমে ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা অচেনা গলার চিৎকারে ও বেরিয়ে আসে। বিশুর মার গলাই ও শোনেনি কখনো, সেই বিশুর মা চেঁচাচ্ছে।

—কেন আসিনি তা তুমি জানতে নি?

—নো-ও—ও—ও!

—এই দেখ দাদাবাবু, পরশু পই পই করে বলে গেচি যে আমি রোববার আসবু নি।

—কিন্তু, কেন?

বিশুর মা সতেজে বলল, আমার বিশুর জন্মদিন ছিল যে! আমি উনোন কাড়ব, নতুন মেটে হাঁড়িতে রেঁদে দেবো, আমার খোঁড়া ছেলের জন্যি মান্‌সা করিচি, সব বলিচি।

—ও ..তোমার ছেলে খোঁড়া?

—জন্ম হতে এট্টা পা দুব্বল। টেনে টেনে চলে। বউদিকে সকল কতা বলে কাজে ঢুকিচি!

—কি বলেছ আমাকে ?

—সগল কতা। হেতা ভাত খাবুনি, নিত্য বিকেলের টেনে ঘরে যাব, কি বলি নি ?

দীপ্ত আস্তে বলল, তোমার ঘর কোথা ?

—সোনারপুরে নেমে আদ ঘণ্টা হাঁট্‌তে হয়।

—শুধু ছেলে বাড়িতে থাকে ?

—আর কে আচে ?

—কত বড় ছেলে ?

—তাতার বইসি হবে। খাওয়া নি, মাকা নি, চ্যায়রা তেমন বাড়ে নে ওর।

অদিতি বোঝে যে দীপ্ত খুব লজ্জিত হয়েছে।

ও হিংস্র রাগে বলে, জন্মদিন আবার কি ? তুমি কি পার্টি দিচ্ছিলে ?

বিশুর মা ঈষৎ হাসে।

পার্টি দোব কেন ? নতুন একটা প্যান্‌ কিনে দি, নতুন হাঁড়িতে রাঁদি, সকালা পুজো দি।

দীপ্ত বলে, ইশ্‌! কাল এত খাবার ছিল!

বিশুর মা মাথা নাড়ে।

—এখেনে তো আমি চা অবদি খাই না। মুড়ি বেঁদে আনি তাই খাই। হেতা সব মদে-মুরগিতে ছোঁয়ানেপা, সে খাবার আমি বিশুকে দিতে পারি ? দেবতার দোর ধরা ছেলে, স—ব মানতে হয়।

অদিতি যেন চড় খায়।

—ছোঁয়ালেপা মানে ? এসব খাবার খারাপ ?

—খারাপ কেন ? খারাপ খেলে তোমাদের অত কান্তি হয় ? কিন্তুক আমাকে তো মান্‌সা মানতে হবে।

—জন্মদিন বলে কাজ কামাই করা…

—খুব অন্যাই। আমাদের ছেলে যে! তা পন্নাম হই বউদি, আমার পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দাও, আমি যাই।

—এখন পাবে না, মাসের শেষে পাবে।

—বটে ?

বিশুর মা এবার চেঁচাতে শুরু করে। দীপ্ত আর অদিতি ভয় পেয়ে যায়। প্রতিবেশী, চারদিকে প্রতিবেশী।

—চুপ করো বিশুর মা ; আমি টাকা দিচ্ছি।

—চুপ করবো ক্যানে ? তো' মাগীর ছেলের জন্মদিনে কা করলি গতরে খেটে তুলে দিয়ে গিচি। আমার শিবরাত্তির সলতে থোঁড়াছেলেটার জন্মদিন ওর ষোলো বচর অবদি মান্‌সা। সেটি কত্তে বলে ছুটি নিলাম ..

—আমি শুনি নি বিশুর মা…

—শুনবে কম্‌নে ? একন মদের ঘোরে, তকন ট্যাবলেটের ঘোরে, সোয়ামি

মাগের ভেড়ো, দেখেও দেকে না। আমার সোয়ামি হলে..., আমার ছেলের জন্মদিনটা এতবড় অপরাধ হয়ে গেল ?

সবাই শুনতে থাকে চারপাশে। টাকা গুনে-গেঁথে নেয় বিশুর মা। যাবার কালে বলে যায়, সবাই বলিচিল বউটা পাজি, লোক পায়নে আর। তবু বিশুর মুখ চেয়ে...আমাদের চেনাজানা লোকেরাই তো আসে, দেকব কেমন করে লোক পাও এবারে...

তাতা এবার ইলেকট্রনিক ট্রেনটি চালিয়ে দেয় ঘরে।

শব্দটা ভীষণ কানে বাজে দীপুর।

কোনোমতে দরজাটা বন্ধ করে ও।

ট্যাবলেট, একটা ট্যাবলেট, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তাতা ওদের দিকে ওরকম চোখে তাকিয়ে আছে কেন? যেন এই প্রথম ওদের দেখছে !

১৪ রাক্ষস

শিশুর মত হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর, বয়স্ক লোকও হতে পারে না।

বাজারে ঘুরতে ঘুরতে আমার কথাটা মনে হল। আজকাল বাজারে কোন জিনিসেই হাত দেওয়া যায় না, আমার সাধ্য নেই। যাঁরা বাজার করেন তাঁদের দেখতে আমার ভাল লাগে। দেখে দেখেও কথা না বলেও কতজনের মনের কাছে পৌঁছনো যায়। একটি ছোট ছেলেকে আমি কত বছর ধরে দেখছি, দেখতে দেখতে সে পাঁচ থেকে দশে পৌঁছে গেল। রুগ্ন, কাহিল চেহারার ছেলেটি ওর রুগ্ন, কাহিল, গরিব বাবার হাত ধরে মাছের ঝুড়ির দিকে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে চেয়ে চলে যায় আর কুমড়ো ডাঁটা কেনে।

এমনি কতজনকে দেখি, প্রত্যহ দেখি। কিন্তু আজ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লোভার্ত চোখে বড় বড় চিংড়ি কিনতে দেখে হঠাৎ ওই কথাটা মনে হল।

শিশুর মত হৃদয়হীন হয় না।

আমার শৈশবের কথা মনে পড়ল। ভুটুর দাদু ভবতারণবাবুকে মনে পড়ে গেল।

ওঁর মনে আমি নির্দয় আঘাত দিয়েছিলাম।

ভবতারণবাবু আমাদের পাড়ার জেঠু। ওঁর অনেক বয়স হয়েছিল। স্ত্রী এক ছেলে, বউ, ছ-সাতটি নাতি-নাতনীর ভরাভর্তি সংসার।

উনি যে আপিস থেকে পেনশন নিয়ে রিটায়ার করেন, ছেলে বরেনদা সেই আপিসেই ঢুকেছিল। উনি একশো আশি টাকা পেনশান পেতেন, বরেনদা পেত দুশো। বাড়িটা ওঁদের নিজেদের ছিল, দোতলা বাড়ি।

যখনকার কথা বলছি তখন আড়াই টাকায় মোটা চাল মিলত। সরু চালের মণ ছিল বড়জোর সাড়ে তিন বা চার টাকা। ছ আনা মণ কয়লা মিলত সরষের তেল ছিল ছ আনা সের। বাড়ির ওপর গাই এনে খাঁটি দুধ, টাকায়, চার সের, দুইয়ে দিয়ে যেত গোয়ালা। শীতকালে এই কলকাতাতেই বাজারদর অবিশ্বাস্যরকম নেমে যেত। তখনও উনচল্লিশের যুদ্ধ হয়নি। থলের প্রচলন ছিল না। চাকর ঝুড়ি নিয়ে বাজারে যেত।

শীতকালে দু টাকার বাজার করলে ঝুড়ি উপচে পড়ত। ইলিশের মরসুমে টাকায় চারটে গঙ্গার ইলিশ হরদম পাওয়া যেত।

সেই দিনকালে ভবতারণবাবু রোজ দু-আড়াই টাকার বাজার করতেন। বরেনদা আর বউদি তাই নিয়ে হাসাহাসি করতেন। শুধু জেঠিমা বলতেন, "মা গো! সেই চোদ্দ বছর বয়সে হেঁসেলে ঢুকেছি, আজও ছুটি পেলুম না।"

জেঠিমা রেগে রেগে বলতেন না, হেসে হেসেই বলতেন। সবাই জানত জেঠু যেমন বাজার করতে ভালবাসেন, জেঠিমা তেমনি রাঁধতে ভালবাসেন।

পাড়ার সবাই বলত, "দেড় সের মাছ, সাত-আটটা তরকারি রোজ এই এত খাওয়া? মা গো! ওরা কি রাক্কস!"

রাক্কস কথাটার মধ্যে কোন খোঁচা ছিল না।

বাবা বলতেন, "বাজার তো হয়ে গেল ভবতারণদা। আবার ছুটছেন?"

জেঠু হাঁটতে হাঁটতেই বলতেন, "কাগজ দিচ্ছে জান না?"

"কিসের কাগজ?"

"অর্ধোদয় যোগ পড়েছে তাই ভীমনাগের দোকান থেকে কাগজ বিলুচ্ছে। আজ রসগোল্লার সের ছ আনা। তাই ভাবলাম একবার গিয়ে—"

জেঠিমা বলতেন, "কি রাক্কস তোদের জেঠু? ট্যাংরা মাছের ঝাল, কই-মাছের ঝোল, ঝালের ঝোল, তিন রকম ভাজা, এতেও হয় না? আবার রসগোল্লা চাই!"

'রাক্কস' কথাটা খুব মিষ্টি করে বলতেন।

'রাক্কস' কথাটা জেঠিমা বুক চাপড়ে চাপড়ে বলেছিলেন যেদিন জেঠুর ওষুধ আনতে গিয়ে বরেনদা চাপা পড়ে মারা যান।

"কি রাক্কস তুমি! কি রাক্কস আমি! জলজ্যান্ত ছেলেটাকে খেয়ে বসে রইলাম!"

তখন রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে দেখে আমাদের এমন সয়ে যায়নি। তাই বরেনদার মৃত্যুতে সবাই খুব দুঃখ পেয়েছিল। সবাই কেঁদেছিল।

কিছুদিন ও-বাড়ির জানলা কেউ খুলত না।

ভুটুরা স্কুলে যেত না। তারপর জানলা খুলে একদিন বউদি বারান্দায় দাঁড়ালেন। একদিন ভুটুরা স্কুলে যেতে শুরু করল। শুধু জেঠিমা আর রাঁধতেন না। ওঁর বুক ব্যথা করত। ভুটুর এক দূর-সম্পর্কের বিধবা পিসি এল কাটোয়া থেকে। সেই-ই রান্না করত।

জেঠু আবার বাজার করতে লাগলেন। উপযুক্ত ছেলে মরে গেলে মা কি কি করে সে সম্পর্কে পাড়ার লোকের স্পষ্ট একটা ধারণা ছিল। মা কাঁদে, খায় না, পাড়ায় কীর্তন শুনতে এসে কেঁদে উঠে যায়।

বাবা কি করলে ঠিকমত ব্যবহার হয়, সে বিষয়ে কোন ধারণা ছিল কি না জানি না, তবে সবাই বলত জেঠু রাক্ষস হয়ে গেছেন।

রোজ কর ডাক্তারের কাছে গিয়ে অসুখ হয়েছে কি না দেখান, তারপর বাজারে গিয়ে ভাল ভাল খাবার জিনিস কেনেন। আবার ওদের বাড়ী মাছ-মাংস আসতে লাগল।

একদিন ওদের বাড়ি থেকে দুর্বো আনতে গিয়ে শুনলাম জেঠিমা বলছেন, "বউমার সামনে আমি ও মাংসের পিণ্ডি রাঁধতে পারব না, খেতে পারব না, দিতে পারব না। ছেলেটাকে খেলে তাতেও নোলা ঘোচেনি? এমন লালচ্ তোমার?"

রাগলেই জেঠিমা 'পিণ্ডি' 'নোলা' 'লালচ্' এই বিচ্ছিরি কথাগুলো বলতেন।

জেঠু কি বললেন তা আমরা না শুনেই পালিয়ে এলাম। তবে পরে ভুটু বলল, "ঠাকুমা আর মাছ মাংস রেঁধে দেবে না দাদুকে। দাদু তাই নিজে নিজে মাংস রাঁধছিল।"

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "ভুটু, তোর দাদু কি সত্যিই রাক্ষস হয়ে গেছে না কি রে?"

"মা ঠাকুমা তো তাই বলে।"

"কাঁচা মাংস খায়?"

আমরা পার্কের মেলায় নররাক্ষস দেখেছিলাম। লোকটা কাঁচা মাংস কচ-কচিয়ে খেত।

ভুটু বলল, "দুর, সে রকম রাক্ষস নয়। ঠাকুমা মাংস রাঁধতে চায় না তাই দাদু আজ হাঁড়িতে মাংস রাঁধল। এরপর কুকার কিনে নিজে নিজে রাঁধবে।"

তখনি রেবা বলল, "তোর দাদু সত্যিই রাক্ষস। অত লোভ হলে মানুষ রাক্ষসই হয়।"

"তোকে বলেছে!"

"রাক্ষসই তো!"

ভুটুর চোখে চিন্তা নেমে এসেছিল। আমরাও খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের খেলুড়ীদের মধ্যে রেবাকেই আমরা সবজান্তার জায়গাটা দিয়েছিলাম। অচিদের বাড়ি কাচের চৌবাচ্চায় লাল মাছ ছিল। রেবাদের বাড়ি ছিল না। হিমাংশুদের বাড়ি একটা অর্গ্যান ছিল। আমাদের বাড়ির চিলে-কোঠায় বাড়িওয়ালার বউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। ফুলের কাকা বিলেত গিয়েছিলেন একবার।

তবু রেবার পোজিশান সবচেয়ে বেশি ছিল, কারণ ওর দু হাত দু পায়ে পাচটার জায়গায় ছটা করে আঙুল ছিল। রেবার প্রত্যেকটি কথা আমরা

বিশ্বাস করতাম। রেবার মা বলতেন, "পাঁচটা আঙুল তো সবারই থাকে, ছটা আঙুল আছে যখন ও মেয়ে সামান্য নয়।"

আমরাও রেবাকে সমীহ করতাম। ওর কথা শুনেই আমরা বিশ্বাস করতে শুরু করি জেঠু রাক্ষস। তখন থেকেই হিমাংশু আর আঁচ ওঁকে 'ফলো' করত।

ওঁর হাঁটা অব্দি পালটে গিয়েছিল। হাসি নেই, কথা নেই, মাটির দিকে চেয়ে হনহন করে উনি হেঁটে যেতেন। পেছন ফিরেও দেখতেন না হিমাংশু আর আঁচ ওঁকে 'ফলো' করছে কি না। ভুটু আমাদের খবর দিত আজ দাদু মাংস আর দই কিনল। আজ দাদু পাকা পেঁপে আনল।

ভুটু বলত, "শ্যামবাজার থেকে পিসিমা এসে কি সব বলছিল। ওর শ্বশুর বাড়িতে সবাই দাদুকে নিন্দে করছে।"

ভুটুটা বেজায় বোকা ছিল, তাই একদিন এসে বলেছিল, 'দাদা আমাদের সব দিতে চায়, ঠাকুমা নিতে দেয় না।"

রেবা বলেছিল, "দেবে কেন? তোর দাদু রাক্ষস তো?"

জেঠুর খাওয়া নিয়ে ওদের বাড়িতে খুব বিচ্ছিরি সব কথা হত। বাবা খুব রাগ করতেন। মাকে কি যেন বলতেন। মনে হত জেঠিমার ওপরই রাগ করতেন।

সেবারই গরমের ছুটিতে মামার বাড়ি গিয়ে টাইফয়েডে ভুটু মরে গেল। সবাই বলল ওদের বাড়িতে শনির দৃষ্টি লেগেছে।

এখন আর কেউ ভাবেনি বড় নাতি মরে গেলে জেঠু কি করবেন। সবাই ওঁকে ভয়-ভয় চোখে দেখত।

আমরা খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম। রেবা বলেছিল পুজোর সময় শিউলি ফুল কুড়োতে এবারও ভুটু আসবে। ভোররাতে ডাকবে। জেঠুর সামনে যেতেও কেন যেন ভয় পেতাম।

ওঁর সামনেই আমায় পড়তে হয়েছিল।

কর ডাক্তারের কাছে আমি কাকার সঙ্গে দাঁতের ব্যাথার ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম। এন্তার মিষ্টি খেতাম, দাঁতে পোকা হয়েছিল, লবঙ্গের তেল দিলে ব্যথা কমে যেত।

দেখলাম জেঠু বসে আছেন। যেন রাক্ষসই একটা। এতখানি থপথপে শরীর, মাথার চুল প্রায় সাদা, কোঁকড়া, রুক্ষ। ওঁর পাশে একটা পোঁটলা। আমি জানতাম তাতে দুটো কমলালেবু, দুটো কলা, একটা সন্দেশ আছে।

আমাকে উনি বললেন, "এদিকে আয়।"

আমি শক্ত হয়ে বসে রইলাম।

"নে, লেবু নে!"

আমি কথা বললাম না। কাকা নিচু গলায় বললেন, "দিচ্ছেন যখন, নাও! উনি বলছেন, নাও!

আমি কেঁদে বলেছিলাম, নেব না। জেঠু রাক্কস, তাই এত এত খায়। তাই ভুটু মরে গেছে। আমি লেবু নেব না।"

কাকা আর কর ডাক্তার আমাকে একসঙ্গেই ধমকে ওঠেন কিন্তু সহসা ভবতারণবাবু হো হো করে কেঁদে উঠেছিলেন। আমার হাত ধরে বলেছিলেন, "ওরে, আমি লোভে খাই না? কপাল আমায় খাওয়ায়। বরেন নেই, নাতিটা চলে গেল, এতগুলো নাতনী ঘরে। আমার পেনশনেই তো ভরসা। আমি যদি না খাই, না বাঁচি, ওরা তো ভেসে যাবে। ভুটুর মা, বরেনের মা, সবাই... ওরে আমি লোভে খাই না রে কপাল আমায় গলায় পা দিয়ে খাওয়ায়।"

কাকার হাত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উনি আমাকেই বোঝাতে চাইছিলেন কথাগুলো। যেন আমি বুঝলেই উনি শান্তি পাবেন। তারপর হো হো করে কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়েছিলেন।

তারপরের বছরই জেঠু মারা যান।

ভাসিয়ে চলে গেলে? জেঠিমার বন্য, দুর্বার আর্তনাদ এখনও আমার কানে বাজে।

তাই, কোন বৃদ্ধের মুখেচোখে লোভ দেখলেই আমার ভবতারণবাবুর কথা মনে পড়ে যায়।

শিশুর মত হৃদয়হীন ও নির্দয় আমি কারুকে দেখিনি।

১৫ ভাত

সকাল থেকে সন্নেসীচরণ ভাত খাবে বলে তৈরি। হাইড্র্যান্টের জলে স্নান করেছে। উলঙ্গ হয়ে পার্কের রেলিঙে কাপড়টা শুকিয়েছে। তারপর এসে রায়দের গাড়িবারান্দায় বসে আছে। রোজ যে-বাড়িতে ভিক্ষে চেয়েও মেলে না, আজ সে বাড়িতে পাত পেড়ে খাবার নেমতন্ন।

সন্নেসীচরণ এই পার্কেই ঘুমোয়। ঠিকে ঝি তা জানত। কাল ঠিকে ঝি কাকভোরে এসে ওকে বলল, কাল বাবুদের বাড়ি ঠিক দুকুরে ভাত খাবি।

আমাকে বলতেছ?

হ্যাঁ রে। তোরেই ডাকতে বলল।

ভাত খাব?

হ্যাঁ। কি যেন পুজো কত্তেছে মা। ঠিক দুকুরে ক্যাঙালীরে ভাত দিতে হয়। তা সকাল-সকাল যাস। টাইনে খেতে হবে।

ভিক্কেয় বেরোব নি?

না, এট্টা টাকা ক্যাঙালী বিদেয়ও পাবি।

ভাত হেথাকে এনে খেতে দেবে?

কেন ? ওই নুলোকে দিবি ?

ও-ও ভাত খায় না, আমিও খাই না কদ্দিন। তাই—

না বাপু, বসে খেতে হবে। না পারিস তো বল, ভিখমাঙাতে ফুটপাতর ভরে আছে, লোক খুঁজিগা।

না না, আমিই যাব।

সকাল থেকে সন্নেসী গাড়িবারান্দার ছায়ায় বসে আছে। বাড়িতে কি পুজো কে জানে। তবে আজ ওর মান খুব। ড্রাইভার, ঝি, চাকর, রাঁধুনী সবাই ওকে দেখে দেখে যাচ্ছে। দরোয়ানটা ওর দিকে চেয়ে বসে আছে। যেন পাহারা দিচ্ছে। চাকরটা আবার একবার এসে ওকে একটা বিড়িও খাইয়ে গেল। সন্নেসীর চোখে ছানি। নইলে ও বুঝত সবাই ওর দিকে যখন চাইছে, চোখে কৌতুহল, আতঙ্ক, করুণা।

ঝি একবার এসে পান খাইয়ে গেল। বিড়বিড় করে বলল, ই কি মহাপাতক গো!

সন্নেসী শুনতে পেল না। ও হেলান দিয়ে বসে ভাতের স্বপ্ন দেখছে। ভাত, গরম ভাত, ওর কাছে স্বপ্ন বই কি! সেই কবে থেকে কলকাতার কাঙালী, ভাত ওর কাছে স্বপ্নের অতীত স্বপ্ন। এখন ওর দেহ গলিত, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, সর্বাঙ্গে ব্যথাবিষ। এই পার্ক থেকে হাজরার মোড় অব্দি অলিগলি ঘুরতেই ওর শরীর এলে যায়। রোজ চার আনা বাট্টা দিতে পারে না বলেই মাগনদাস ওকে দল থেকে বের করে দিয়েছিল।

দলের ভিখিরি সকালে চা-রুটি পায়, সন্ধ্যেয় ডাল-রুটি। চাল, কাপড় আর চার আনা মাগনদাস নেয়। সন্নেসী যখন থেকে আর পারল না তখনি মাগনদাস ওকে বের করে দিল। সেই জন্যেই তো মাগনদাসের দখলী ফুটপাত ছেড়ে পার্কের গাছতলায় নির্বাসন। মাগনদাস বলেছিল, রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে ভিখ্ মাঙ্। তাতেও পয়সা।

সন্নেসী বলেছিল, পারবুনি। ডর লাগে।

কেন ?

যারা হাঁটতে চলতে দেখেছে, তারা পথে গড়ালে মুখ চিনে মারে যদি ? সেই লালনকে যেমন মেরেছিল ?

তবে ভাগ্! চট, টিনের কৌটো, সব সুখনকে জিম্মা করে দিয়ে যা। কোনটা তোর নয়।

সব দিয়ে দিব ?

মাগনদাস কান চুলকে বলেছিল, স—ব! বেশি কথা বললে পরনের কানিও খুলে নিব। ছুপ্পনকে কাপড় কেড়ে নিয়ে কাগজ পরিয়ে বের করে দিয়েছিলাম মনে নাই ? টিন চট, তোকে দিব কেন ? আমি যেমন তোর মাহাজন, আমার মাহাজন নাই ? মাসে মাসে হিসাব দিতে হয় না ? যাঃ, ভাগ্ এখান থেকে।

ভয়ে কেঁপে পালিয়ে এসেছিল সন্নেসীচরণ। মাগনদাস তার মহাজন

মাগনদাসের ওপর আরেক মহাজন আছে, তার ওপরও বুঝি আরেক মহাজন আছে। কোন মানুষই নিজের নয় তবে? ভাবতে গিয়ে সন্নেসীর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ভিখ মাঙে, যা পায় মাগনদাসকে দেয়। অন্য ক্যাঙালীদের গায়ের ওমে জড়াজড়ি করে ঘুমোয়। ব্যস, এই হল সন্নেসীর জীবন ও জগৎ। কিন্তু সে জীবন ও জগতের যে এত এত নিয়ন্তা আছে তা কে জানত?

ভিখমাঙারা বড় নির্দয়, নির্মায়া। দল ছাড়ার পর থেকে কেউ শুধোয়নি, হ্যাঁ রে, ভিখ জোটে?

বুড়ো হতে কষ্টের শেষ নেই। পথে পথে যারা ঘোরে, তারা দলের ভিখিরি। সন্নেসীকে ওরা মারবে বলে ভয় দেখায়। তাই ওরা সবাই চলে গেলে সন্নেসী ঠিক দুপুরে বেরোয়। ঠিক দুপুরে কে কাকে ভিক্ষে দেয় বল? তাই সন্নেসী মাসে বিশদিন বাতাস আর কলের জল খায়।

কিন্তু আজ ও ভাত খাবে! অনেক ভাত। চাকরটা বলেছে, যত ভাত, যত ডাল, যত মাছ পারবি খাবি। পেসাদটা আগে খেয়ে নিবি।

সন্নেসী ভাতের স্বপ্নে চোখ বুজল।

ভেতরে তখন গুপ্তপুজো শেষ হয়ে এসেছে। বুড়ো কর্তার দুই বিয়ে, দু-পক্ষে সাত ছেলে, চার মেয়ে, দু বউই জীবিত।

কর্তার অসুখ খুব। ভাইরাস কোথায়, কিভাবে কাজ করছে, ধরতে চেষ্টা করে করে ডাক্তাররা এলে দিয়েছে। আগে যত ঝগড়া-বিবাদ থাক, এখন দুই গিন্নি, এগারো ছেলেমেয়েতে খুব একতা। সেই কবে এক উইল করে কর্তা তাঁর প্রণয়িণী (অধুনা মৃত) হেলেন রানীর ছেলেকে সম্পত্তির এক ভাগ দিয়ে গেছেন।

সে ছেলে লোচ্চা লম্পট। কিন্তু উইলের কথা সেও জানে।

কর্তা ভেবেছিলেন, হাতেও ছিল, নব্বুই বছর বাঁচবেন। ইদানীং বলতেন, উইল পালটাব। মদনাকে কিছু দেব না।

জ্বর হতেই বলেছিলেন, সেরে উঠে উইল পালটাব।

কিন্তু ছিয়াত্তর না হতেই সামান্য জ্বর থেকে এমন কাণ্ড দাঁড়াবে কে ভেবেছিল? উইল না পাল্টাতেই কর্তা মরে গেলে মহা মুশকিল। উইল যে অ্যাডভোকেটের কাছে, তিনি আবার, কি ঝামেলা, পয়সায় ভোলেন না। এই তৈরি উইল নস্যাৎ করার কেসে সেদিনই একবার ফেঁসেছেন। এখন তিনি কিছুতে উইল নড়চড় হতে দেবেন না।

আসল কথাও সবাই জানে। মদন বর্তমানে অত্যন্ত শক্তি ধরে। মদনকে চটিয়ে অ্যাডভোকেট বেশি দিন বাঁচতে পাবেন না।

কর্তা সেরে উঠে উইল পাল্টালে সব ল্যাঠা চুকে যায়। কিন্তু তিনি অজ্ঞান, অচৈতন্য। ডাক্তাররা এলে দিয়েছে।

তখনি বড় ছেলের শ্বশুর দেশের বাড়ি থেকে তান্ত্রিক আনান। গুপ্তপুজো চলছে। সাতদিন ধরে দোর বন্ধ করে কি হচ্ছে কেউ জানে না। তবে আজ,

কর্তার সকল ব্যাধি ও আসন্ন মৃত্যুসম্ভাবনা একটি সরষের ভরে সেই সরষে কলায় পুরে কলাটি খাইয়ে একজনকে এই পুজোর নিবেদিত অন্ন খাওয়াতে হবে।

লোকটা মরে যাবে। কর্তা বেঁচে উঠবেন। সে লোক বুড়ো-হাবড়া হোক, নুলো বা খোঁড়া বা বিকলাঙ্গ হলে চলবে না।

না। কোনো সুস্থ-সবল দেহ মানুষের দরকার নেই। সেই জন্যেই সন্নেসীর নিমন্ত্রণ। বড় ছেলের শ্বশুর এই তান্ত্রিককে হয়-কে-নয় করতে দেখেছেন। তান্ত্রিকও বলেছেন, আমার চেষ্টা কখনও ব্যর্থ হয়নি।

সেই জন্যেই কর্তার উচ্চশিক্ষিত, বড় চাকুরে, বিলেত-ফেরত ছেলে-জামাই-মেয়ে সবাই গুপ্তপুজায় সম্মতি দিয়েছে। তান্ত্রিক ইংরিজী জানেন। তাঁর পুজাবিধির সপক্ষে তিনি ইংরিজীতে বহু কথাই বলছেন। তাতেও সকলে খুব অভিভূত হয়েছে।

মদন তার দলবল নিয়ে পাশের বাড়ি বসে আছে। তার জনৈক বিশ্বাসী ডাক্তার রুগীর ঘরে তার তরফ থেকে কর্তার ওপর নজর রাখছেন। কর্তার বৈধ ছেলেরা তাতে আপত্তি করেনি। রুগীর ঘরে তো কিছু হচ্ছে না। পুজো হচ্ছে নিচের একটা ঘরে। মদনও সব কথা জানে না। তবে আপত্তির কিছু সেও দেখেনি। দুরারোগ্য অসুখে পুজো-মানত-স্বস্ত্যয়ন কে না করে? মদন আজকাল ওপরমহলের খবর অন্তরঙ্গে রাখে।

পুজো শেষ হল।

হঠাৎ সন্নেসীর চটক ভাঙল ডাকাডাকিতে। একটা বেজে তিন মিনিটে ওকে কলাটি খেতেই হবে। সন্নেসী দেখল নতুন কলাই করা থালায় চুড়ো করা ভাত, মাছ, ডাল, তরকারী, দই, মিষ্টি। তান্ত্রিক ওর মাথায় হাত রেখে কি বলে ঘড়ির দিকে চেয়ে একটা ছোট্ট কলা খেতে দিলেন। পুজোর কলা যেমন হয়, ছোট ছেলের কড়ে আঙুলের মত ছোট।

সন্নেসী এক গ্রাসে কলাটা খেল। সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখ যেন জ্বলে উঠল প্রত্যাশায়, নিশ্বাস পড়ল স্বস্তির।

তান্ত্রিক বললেন, এখন ও খাক গে। আর চিন্তার কিছু নেই। চল, ভেতরে চল, একটু চা খাওয়া যাক।

সন্নেসীচরণ ভাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাত, এত ভাত, বাপ্ রে, দুনিয়ার সব খামারের সব মিহি চালের ভাত তার পাতে? চোখ ঘোলাটে।

হাতে টিপে ও বুঝে বুঝে ও খেতে থাকল। খেতে খেতে ওর পেট ফুলে উঠল।

খেতে খেতে বুকে চাপ ধরল, শরীর ভেঙে এল ভাতের ভারে, কিন্তু সন্নেসী খেতে থাকল। হাতড়ে হাতড়ে ও সব ভাত খাবে। এক দানা ফেলবে না। এমন সুগন্ধি ভাত, রুই মাছের তৈলাক্ত পেটি, পটলের ডালনা, মুগের ডাল, ও ফেলতে পারে? ও কেন? কোন্ ভিখমাঙ্গা কবে এমন অন্ন খেয়েছে?

এ কি নেমন্তন্ন বাড়ির পাতা চেটে খাওয়া ?

সন্নেসীকে দেখতে দেখতে ঝি দারোয়ানকে বলল, এবার বেঁচে গেল গো! কিন্তু উ লোকটা ?

দুস্। ভিখ্‌মাঙা।

মানুষ তো ?

দুস্। ভিখ্‌মাঙাটা!

সন্নেসী খেতে থাকল। ও চোখেও দেখে না, কানেও শোনে কম, ঝি ও দারোয়ানের কথা ওর কানে ঢুকলই না।

তারপর, এক সময়ে, প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে ও বাড়ির মুখোমুখি পার্কে গেল। গাছের নিচে গড়িয়ে পড়ল, চোখ বুজল।

সকাল না হতে মহা গোলমাল। পার্কের গায়ের রাস্তা গাড়িতে গাড়িতে ভরে গেল। বোম্বাই খাট, ফুলের পাহাড়, কর্তা রাতেই মারা গেছেন। কাতারে কাতারে লোক আসতে থাকল। মদন নিজের অধিকার জাহির করবার জন্যেই শবযাত্রার ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল। কর্তার ছেলেরাও বুঝলেন, যখন হয়-কে-নয় করা গেলই না তখন মদনের হাতেই সব ছেড়ে দেয়া ভাল। ওকে চটিয়ে, শত্রু করে, এখন আর লাভ নেই। বরঞ্চ যে দিনকাল, ওকে সপক্ষে রাখাই লাভজনক।

কর্তাকে নিয়ে ব্যবস্থা করতে সবাই এত ব্যস্ত থাকল যে, বিকেলে পার্কে অবসরপ্রাপ্ত বুড়োরা এসে বসতে শুরু করার আগে কারও নজরেই পড়ল না উৎকৃষ্ট বাসমতি চালের ভাত বমি করে ভাত সর্বাঙ্গে মেখে সন্নেসীচরণ মরে কাঠ হয়ে আছে।

১৬ নিজের জন্য

তরা ভাবিস আমার নিজের লোক কেও বলতে কেও নাই। তাতেই বন্দী কইরা রাখছস। আমি মনসা মেলায় যামুই যামু। আমার লোকও লাগব না। আমি একাই যামু।

পিসির কথায় পলাশ খুব অসুবিধেয় পড়ে। বালিগঞ্জ সার্কুলারে ওর সাত তলার ডিলাক্স অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে ওর কথার কোন দাম নেই। রিমাই সর্বেশ্বরী। এটা বিয়ের আগেই বলে কয়ে নেওয়া।

দুজনের রোজগার, জয়েন্ট নামে অ্যাপার্টমেন্ট। বাড়ির ভেতরে সব দেখবে রিমা। পলাশ কোন কথা বলবে না।

পলাশ তার অধিকারের বাইরে নাক গলালে ?

রিমার মিগ্রেন হয়।

রিমার নার্ভ বিদ্রোহ করে।

রিমা হিংস্র হয়ে যায়।

এ বাড়ির সব টাইমও রুটিনে বাঁধা।

রান্নাঘরে খাতায় সাত দিনে কি কি রান্না হবে কোন বেলা, তা লেখা। কোন্‌দিন ওয়াশিং মেসিনে কাপড় কাচা হবে, কোনদিন ওয়ার ও চাদর বদলানো হবে।

—ডিসিপ্লিন শেখো পলাশ। দেখবে কাজের সময় বেশি পাচ্ছ, বেশিক্ষণ রিল্যাক্স করতে পারছ।

—নিশ্চয়।

পার্ট-টাইমার দীপালি এসে সব রান্না করে রেখে যায়। সে আসেও চার দিন। ওয়াশিং মেশিনটার পরিচালনা পদ্ধতি পিসিমার মাথায় ঢোকানো যায় নি। ও কাজটা পলাশ করে শনিবার।

পিসিমা এর মধ্যে কোন কাজেই হাত লাগাতে পারেন না। তিনি থাকেন অবশ্য ওদের আত্মজা নিনার ঘরে। নিনা বর্তমানে, মাত্রই মাসখানেক হল, পুনা ফিলম ইনস্টিটিউটে পড়তে গেছে। নিনা থাকতে এ বাড়ির এমন অবস্থা হয় নি। নিনা যাবার সময়ে পিসিকে বলে গেছে, দিদা! মার ডিসিপ্লিনের ভয়ে পালাচ্ছি। আমি একদিন দারুণ অ্যাকট্রেস হব। স্মিতা পাতিলের মত।

—কিসের পাতিল?

—আঃ সেই যে সিনেমা দেখালাম, দুধ দোয়ানো বউটা, যার মোষ মরে গেলে তুমি দুঃখ করছিলে।

—করুম না? এট্টা মোষ মরণ কি কম দুঃখ?

—তুমি একটা···তার মত অভিনয় করব।

—ওই কাম করস না নাতিন। তাহলে ভাস্কর তরে বিয়া করব না, ছিনেমা বইলা কথা!

—আসল কথাটাই তো জান না। মা জানে ভাস্কর চলে গেছে। সে তো ওখানেই গেছে।

—সর্ব্বনাশ! তর মা জানলে?

—বিয়ে করে নিলে কি করবে? আর, আমি কথা দিচ্ছি দিদা, বিয়ে কেন, কাজ পেলেই তোমাকে নিয়ে যাব। সেখানে তুমি বেড়াবে, হাসবে, গিন্নি হবে, বুঝেছ? আর শোন, এই দুশো টাকা রেখে দাও।

—তর লাগব।

—বোক না। রেখে দাও। দিদা! তুমি গিন্নি হতে খুব ভালবাস?

—ল! মাথা সোজা রাখ। চুলটা বাইধা দেই।

—তোমাকে আমি অনেক জায়গা ঘোরাব। কি কি জায়গা যেন বল?

—তা ধর, গয়া—কাশী—প্রয়াগ—বিন্দাবন—কিছুই ত দেখি নাই।

—কে দেখাবে? আমার পিসি যেমন ধুরন্ধর, মা একটি! এরা তোমায়

বেরোতে দেবে ?

নিনার ঘরে ঢুকলে পিসি ওর টেবিল ঝাড়েন, মোছেন। রিমার নির্দেশ, আপনি মাটিতে শোবেন।

মাটিতেই শুতেন। কিন্তু নিনা তো কম জেদী ছিল না। ও বলত, দিদা কি ঝি, যে মাটিতে শোবে? আমার কাছে শোবে। নইলে আমিও শোব মাটিতে।

নিনা এ বাড়িতে একটা অঘটন। কে বলবে ও রিমার মেয়ে। মা বাবা বিদেশ ঘোরা, মস্ত বিজ্ঞাপন আপিসে দুই ডিরেক্টর। বাড়ি বোঝাই বিদেশী গ্যাজেটে। রিমা বাংলা বলে চিবিয়ে চিবিয়ে, ইংরিজিতেই ও সহজ।

পলাশও তাই। আগে অমন ছিল না, কিন্তু বউয়ের মত হবার সাধনায় ও নিজেও বাংলা ভুলে গেছে।

নিনা ইংরিজি ইস্কুলে পড়লে কি হয়, বাংলা বলত, শাড়ি পরত। কোমর ছাপানো চুলে পিসিকে দিয়ে একটা লম্বা বেণী বাঁধিয়ে নিত। মা বেরিয়ে গেলেই পিসিকে বলত, ঝাল ঝাল আলু চচ্চড়ি, আর লুচি করো দিদা। ভাস্করের মা ফার্স্ট ক্লাস নারকেল নাড়ু দিয়েছে। তুমি আর আমি খাব।

বলত, দিদা! তুমি তোমার জন্যে যে তরকারি রাঁধবে, আমার জন্যে রেখে দিও।

হবেই তো! ভাস্করের সঙ্গে ভাব ছোটবেলা থেকে। ভাস্করের বাবা মা ভীষণ রকম বাঙালী। ভাস্করের সঙ্গে নিনার ভাব খেলার মাঠে, পাড়ার পার্কে। রিমা মেয়েকে নিয়ে এই অ্যাপার্টমেন্টে খুবই লজ্জিত। নিনা বাংলায় কথা বলে ও দাবী করে ওর সঙ্গে বাবা, মা বাংলা বলবে।

ও শাড়ি পরে। বাংলা বই পড়ে। বাংলায় থিয়েটার করে। কেন ও এমন হল ?

—ছোটবেলা থেকে পিসির কাছে থেকে .

নিনা একটু বড় হয়েই বলত, নিজেরা রাতদিন বাইরে থাকো, সেজন্যেই তো দিদাকে এনেছিলে। দিদা আমাকে দেখবে। নিজেরা বাইরে থাকবে।

কথাটা তো খুব সত্যি। পিসির কবে বিয়ে, কবে বিধবা তা মনেও নেই। বিয়ে অবশ্য আঠারো বছর বয়সেই হয়েছিল। তা হলে পঞ্চাশ বছর আগে। তখন ফরিদপুরে গ্রামের বাড়ি, অনেক ধান চাল, বাবা বিয়ের পর জেনেছিলেন, যে জমিজমা দেখে বিয়ে দেন, তা ছেলের জ্যাঠার। ছেলের বাবার, সেই সময়ের পক্ষে খুব নিন্দের ব্যাপার, বাগদী দোষ আছে। আর ছেলেও ম্যাট্রিক পাস নয়।

বাবার ছিল মেজাজ! ধান-চাল-বাগান-পুকুর-টাউনে বাড়ির মেজাজ। বাবা অষ্টমঙ্গলার পর পিসিকে যেতে দেন নি। বলেছিলেন, চাকরি কর, মানুষ হও, বউকে নিয়ে যেও। আমি হরকালী বসু, মেয়েকে চিরকাল পালতে পারি।

পিসির বরের বয়স মোটে বাইশ ছিল। ভাসা ভাসা মনে পড়ে—বেঁটে, রোগা মানুষ। লাজুক ও অপ্রতিভ।

শ্বশুরের কথা শুনে মনস্তাপে শ্বশুরবাড়ি থেকেই ঢাকা চলে যান। শ্বশুরকে লিখেছিলেন, "যোগ্যতা হইলে ফিরিব। আপনার কন্যাকে লইয়া আসিব।"

তিনি আর ফেরেন নি।

নিনা এ সব কথা বার বার শুনেছে।

—তারপর ?

—বারো বৎসর সধবা চিহ্ন রাখছিলাম। বারো বৎসর হইতে সকলে আমারে লইয়া গাঙে ছান করাইয়া, শাখা ভাইঙা. সিদুর মুছাইয়া, থান পরাইয়া বাড়ি লইয়া আইল।' আমারে দেইখা মায়ে এক চিকুর পারল, 'অমানিষ্য আমার মাইয়ারে মাইরা ফালাইল !' তারপর টান কইরা মাটিত্ পরল আর মরল।

—ইশ! দিদা! কত কষ্ট পেয়েছ গো! তারপর কি হল দিদা ?

—দ্যাশ তো ভাগ হইয়াছিলই। হুকল বেইচা বুইচা এহানে আসা হইব, তা বাবারে কে বুদ্ধি দিল কে জানে। আমারে পাঠাইয়া দিল, তর বাপের ঠাকুরদার বারি রানাঘাটে। বাবার কেমুন বা ভাই, জানি না। পরে শুনছি যে বাবার এক দূর সম্পর্কের মামার পোলা। দাদা আইসা থুইয়া যায়।

—সেই থেকে এখানে ?

—আর কি করতাম ? বাবায় দ্যাশ ছারল না, মায়ের লিগ্যা তাপাইয়া তাপাইয়া মরল দ্যাশেই। দাদা হকলটি বেইচা বুইচা আসামে গেল বউদিরে লইয়া খুরাশ্বশুরের কাছে। তিনি চা বাগানে মেনেজার। তা কি বা জ্বরে দাদা মরে, তা জানি না।

—দিদা! তোমার কেউ নেই ?

নিশ্বাস ফেলেন পিসি।

—কেউই আছিল না। অহন তুই...

—তোমার টাকা নেই. কিচ্ছু নেই ?

—তুই এতও জাইন্তে চাস !

—বল না ?

—আমি জানি না। তহন শুনছি কত্ কথা! অহন মনেও পরে না।

তুমি বললে না। একদিন ঠিক শুনব।

সব কথা কেমন করে বলতেন পিসি ? বাবার মনস্তাপ ছিল খুব। বলতেন। বিজয়রে আমিই ঢাকায় লইয়া আইন পরাই। রানাঘাটে আমিই পাঠাই। যৎদিন না হেয় দারাইছে, অর মায়েরে টাকা দিছি। হেই সকলের হিসাব করি না, তয় কি, হেয় বলত, কুনদিন ভগবান দিন দেয় তো আপনার লিগ্যা করুম! আজ আমার দরকার। হকলই বিতং কইরা লেইখা দিছি, অহন তোরে নিঃশব্দীও পাঠাইনা রে মা!

পাঁচ হাজার টাকা, বিশ ভরি সোনা, সবই ধরে দিয়েছিল দাদা ওই কাকাকে। বলেছিল, বাবায় কইছে, একখান জমি দ্যাখতে। আইয়া পইরা বাবায় বারি কইরা নিব। মা চইলা গেল, মুন্তিরে আর রাখতে চায় না বাবা। কইছে আপনে অর নামে থুইয়া দিবেন টাকা আর সোনা। অর খরচ চইলা যাইব।

বিজয় কাকা সেই মুহূর্তে মহান হয়ে যান।

—হরকালী দাদা আমার লিগ্যাযা করেছেন ···সম্পর্ক বিচারে তিন রাইতের জ্ঞাতি, কিন্তু মনের বিচারে মুন্তি আমার মাইয়া। তার লিগ্যা ভাইব না। অর টাকা লাগব আমার বাড়ি থাকতে? এই দালান কোঠা, এই কইলকতায় পেকটিস, হকলডির মূলে তোমার বাবা। তোমরা আইয়া পরো। দিন থাকতে দিন কিইনা লও।

সেই দিন কেনা তো হল না। বাবা মারা গেলেন। দাদা বা খুড়শ্বশুরের কথায় কোথায় গেল। কি এক জ্বরে ধরল, হার্ট নাকি বিকল হল। দাদা লিখেছিল, "এখানে বর্ষা খুব বেশী। পূজার সময়ে তোমাকে লইয়া আসিব। এখানে টাকা আছে, তবে জল ভাল নয়।"

দাদাও মরে গেল।

বিজয় কাকা সে টাকা আর সোনা কি করলেন, পিসি জানেন না।

ও সংসারে তিনি হয়ে গেলেন আশ্রিতজন। খাটো খাও। আত্মীয় মানুষ, মাইনে দেবার কথা ওঠে না। জামা-কাপড়-তেল-সাবান পাবে। আঁশ রান্নার আগে নিরিমিষ যা হয় করে নিও। বিধবা বলে কথা! ঘি-দই-দুধ ভোজনে দেহে গরম বাড়ে। সাদাসাপ্টা খাবে, দম দিয়ে খাটবে।

আস্তে আস্তে পিসি আশ্রিতজনই হয়ে গেলেন। ও সংসার যতদিন বিজয় কাকার ছিল, ওঁদের কাছে।

তারপর পলাশের বাবা কলকাতাবাসী হলে তাঁদের কাছে।

পলাশের বাবাই দেশের ভাষা ছাড়েন।

তারপর পলাশের বড়দিদি নীলিমার কাছে।

নীলিমার বরের কিছু জ্ঞানগম্যি ছিল। সে পিসিকে মাঝে মধ্যে দশ-পাঁচ টাকা দিত।

—রাখুন পিসি। পান দোক্তা খেতেও লাগে।

নীলিমা ওঁকে ভয়েলের থান ধরাল, নরম সাদা জামা। বাড়িতে লোকজন আসে, কেতাদুরস্ত থাকতে হয় পিসি। নইলে আমার মাসিদের তো জানো, বলবে, পিসি হয়, ঝি করে রেখেছে?

পিসি মনে মনে বলতেন, ঝি কইরাই ত রাখছ মা।

জিনিসে ঘর ভরতেয়াছ, হকল ঝারা মুছা, নিত্য তিন চার পদ পাক করা, কি করি না?

নীলিমা জানত কাজ আদায় করতে।

—ওরা কাচলে পরা যায় না। পিসি কাচলে দেখ, জামা অন্য রকম দেখায়। পিসি! এই জামাগুলো . মোটে আছড়াবে না...হালকা করে...

নীলিমার ঝি বলত, মানে বটে কাজ আদায় কত্তে। তুমি বলে কত্তেচ। আমি হলে কবে ঝ্যাটা মেরে চলে যেতাম!

—নিজ কাজে যাও রে মা!

যেতেন, তিনিও যেতেন। যদি মাইনে করা ঝি হতেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা যে অন্য রকম।

—যে খাটনি খাটো, ওই গুজরাটী ফেলাটে গেলে একনি শ' টাকা মাইনে দে' রেকে দেয়।

—নিজ কাজে যাও।

নীলিমার মেয়ে গেল বরের সঙ্গে বিলেতে। তারপর ছেলে যখন কোথায় আমেরিকা না কোথায় গিয়ে থিতু হল। নীলিমারা দেশের পাট গোটাল।

পিসির কপাল যাকে বলে!

সেই সময়েই ছোট্ট নিনাকে নিয়ে পলাশ আর রিমা এল দেশে। অ্যাপার্টমেন্ট কিনল, কোম্পানি করল, কিন্তু মুশকিল নিনাকে নিয়ে।

নীলিমা বলল, তুমি ভীষণ লাকি রিমা! পিসিকে নিয়ে যাও, আমিও জানব যে উনি ফ্যামিলির মধ্যেই রইলেন। নইলে ওই পারেখরা, কাপুররা, ওপরের জয়া রায়, সব তো হাঁ করে আছে। আপনি যখন যাচ্ছেন, তখন প্লীজ ওনাকে আমার কাছে দিন। সে আমি করব কেন? ফ্যামিলির মধ্যেই...

রিমা বলেছিল, আণ্ট? হু ইজ শী?

—সে ভীষণ গোলমেলে ব্যাপার। আমি বোঝাতে পারব না। মোট কথা যা শুনেছি, ইস্টবেংগলে ওঁর বাবা ছিলেন আমার গ্রাণ্ডফাদারের...

—পুওর রিলেটিভ?

—ভেরি, ভেরি পুওর। তিনি যখন মারা যান, তখন...আমাদের গ্র্যাণ্ডপা ছিলেন ভেরি জেনারাস্। ওঁকে শেলটার দিলেন...

—উনি তো কিছু শিখে আর্ন করতে পারতেন! ওহ, আওয়ার উইমেন আর সো ব্যাকওয়ার্ড!

—কি যে বলো রিমা! তখন ও সব কনসেপ্ট ছিলই না। আর্ন করেন নি বলেই আমরা বেনিফিট করেছি।

নীলিমা গা দুলিয়ে হেসেছিল। পিসি সবই শুনেছিলেন, একেবারে বোঝেন নি তাও নয়।

একবার মনে হয়েছিল, চলে যাবেন পারেখদের বাড়ি। তারপর মনে হয়েছিল, অচেনা গরুর লাথি খাবেন? তার চেয়ে চেনা গরুর লাথি ভাল।

এটাও মনে হয়েছিল, কলকাতায় থাকলেন এতদিন, তেমন চেনেন না কিছুই। কাগজে পড়েন, বাড়ির ঝি খুন হয়। কত কি ঘটে!

ভয় করছিল।

পলাশ বলেছিল, আমাদের পক্ষে তো গড সেণ্ড।

রিমা বলেছিল, ইমোশনাল হোয়ো না।

—আরে ফেথফুল, বিশ্বাসী, কলকাতায় চেনেন না কাউকে, গসিপ করেন না, নিনাকে রেখেই তো বেরোতে হবে আমাদের।

—নিনার আয়া আছে।

—উনি যা পারবেন, আয়া তা পারবে?

—বেশ ..উনি আসুন...তবে আয়াই নিনাকে খাওয়াবে, নিয়ে বেড়াবে...

—যা বলো!

কিন্তু নীলিমা দেশ ছাড়বার আগেই রিমা আর পলাশকে ছুটে আসতে হয়েছিল।

দাসী আয়া, বাড়ি থেকে দামী কাপড়-চোপড় নিয়ে সরে পড়েছে লিফ্‌ট-ম্যানের সঙ্গে।

—নিনা একা, বাড়ি বন্ধ, ও হরিবল! নিনা কাঁদছিল, তাই শুনে ডি-এইটের মাথুর আমাদের ফোন করে। ওঃ, সে কি ব্যাপার।

—নিনা কোথায়?

—আমার মার কাছে রেখে এলাম।

—তার কাছে রেখে আপিসে যেতে পারতে।

—শী ইজ্‌ সো অ্যাকটিভ! টিপিকাল গ্র্যান্ডমা' তো নন।

রিমা ফোঁস ফোঁস করেছিল। মায়ের বিষয়ে রিমা অত্যধিক সেনসিটিভ।

—তা ছাড়া মা দেশে থাকে ক' মাস?

—বম্বেতেই তো বেশি থাকেন!

—ন্যাচারেলি।

—আজই কি নিয়ে যাবে ওঁকে?

—তোমার অসুবিধে হবে?

—হলে হবে। আমার বাড়িতে তো কোন বেবি নেই। আমি কষ্ট করে সামলে নেব।

শুনে পিসির পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল। দুটো রাতদিনের লোক আছে ওঁর ওপরে। জামাইয়ের ভাই এসে সর্বস্ব গুছিয়ে দিচ্ছে, "কষ্ট করে!"

—ফ্ল্যাট কি বেচে দেবে?

—পাগল? ও দেশে থাকতে পারব কি না তাই জানি না। কাজ করার লোক মেলে না, সর্বস্ব কাজ নিজেদের করতে হয়, দেশে আমরা অনেক আরামে থাকি।

রিমা বলল, লণ্ডনে সব নিজেরা করেছি বটে, কিন্তু ওখানে কাজ করা যায়। এখানে আমি হাউসওয়ার্ক করতেই পারব না। অসম্ভব।

—তা...অন্য সব কাজ কে করে?

—পার্ট টাইম কুক, দু'জন পার্ট টাইমার ওয়াশিং আর ক্লিনিং করে, আর

আয়া ছিল। ওঃ, তিনশো টাকা মাইনে, অল বেনিফিট্স...ইনি কেমন ওয়োন দেখি।

পলাশের মন কোথাও বাধা ছিল।

—রিমা। উনি একজন সিনিয়ার রিলেটিভ। টিপিকাল ওয়ার্কিং হ্যান্ড নন।

—ইউ মীন, উই ডোণ্ট পে হার?

—ওয়েল,···দিদি দেয় না।

—বাট দ্যাট্স ক্লীন এক্সপ্লয়টেশান! দ্যাট আই কান্ট ডু।

—যা দেবে, বলবে হাত খরচ দিচ্ছ।

—একটা কথা পরিষ্কার, আমি ওঁকে বাড়ির কোন কাজ করতে দেব না। বেংগলি হাউসহোল্ড মার্কা কাজ আমার পছন্দও হবে না। আর, পলাশের আণ্ট মেইডের মত কাজ করবেন, সেটা পলাশের পক্ষেই···

নীলিমা ঝড়ের বেগে পিসিকে সব বলেছিল। ওঁর স্যুটকেসে ভরে দিয়েছিল গরদের থান, ভালো শাল। স-ব তোমার জামাই কিনে এনেছে। এই একশোটা টাকা পিসি, অবশ্য ওখানে টাকা লাগবে না। সব দেবে ওরা···

—তোমরা তবে চল্লো?

—হ্যাঁ পিসি। এবার তো ..

—ভাল। বাইচা জীয়া থাকো।

নীলিমার ঝি গড় করে প্রণাম করেছিল।

—ভুলে যেও না গো দিদা।

—না মা! তাই ভুলি?

মনটা কেমন করেছিল একটু। প্যাণ্ট পরা বউ, না জানি কেমন হবে।

জামাই এসে প্রণাম করেছিলেন।

—আপনার ঋণ আমি জীবনে ভুলব না পিসি।

—থাক্ বাবা, থাক্।

নীলিমা বলেছিল, পিসি রাতে ভাত খায় না। আজকের দুধ-সন্দেশ-ফল দিয়ে দিলাম। ঠিক বলেছে ও, পিসির ঋণ কি ভোলবার?

পিসি মনে মনে তিক্ত হেসেছিলেন। ঋণ ভোলবার নয়? তোমাদের ঠাকুরদা আমার বাবার দয়াতে অত বৈভব করেছিল। বাবার ঋণ সে মনে রেখেছিল? আমার টাকা, অত অত সোনা, সব তো ঘাপ করল।

তোমাদের বাবাও বলেছিল আমার ঋণ ভুলবে না। কিন্তু নিজের বাপের মত সেও দাসীবৃত্তিই করায়। তুমিও দাসীবৃত্তি করিয়েছ। এখন ঋণের কথা বলছ।

এতর পরেও চলে আসার কালে মনটা খারাপ হয়েছিল খানিক। যে পলাশকে অনেক আগে দেখেছেন, যে বর্ষার দিনে মুড়ি আর পাঁপড় খেতে ভালবাসত, কলেজে ডিবেট করত, সে পলাশ একেবারে বদলে গেছে।

বদলে গেছে ওরা সবাই। একদা ফরিদপুরে শাপলাবাড়ি গ্রামে ওদের

বাস ছিল। রানাঘাটে চকমেলানো বাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ভুলিয়ে দিল শ্যাপলা-বাড়িকে। তারপর কলকাতায় এসে ওরা ভুলে গেল রানাঘাটকে। কলকাতা মানে বালিগঞ্জ সার্কুলার, আলিপুর পার্ক স্ট্রীটের কলকাতা। শ্যামবাজার-বাগুইআটি-বেলেঘাটায় পলাশদের যে সব কাছের ও দূরের আত্মীয়, থাকে, তাদের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। বালিগঞ্জ সার্কুলারের কলকাতাকেও শ্যামবাজারের কলকাতাকে ভুলে যেতেই হয়।

ভুলতে না জানলে উন্নতি হয় না।

এই যেমন, পিসির বাবার ঋণ, পিসির ঋণ, ওরা কেমন ভুলে থাকছে।

পলাশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল আয়রনসাইড রোডে এক বাড়ির সামনে। চার বছরের নিনাকে নিয়ে এল ওরা। সঙ্গে একজন চুল ছাঁটা, কাফতান পরা মেয়েছেলে। রিমা, "বাই. মা।" বলে চুমো খেল বলে পিসি বুঝেছিলেন ওই মহিলা ওর মা।

বাপরে! দ্যাশেও থাকে, বিদ্যাশেও যায়! —পিসি সসম্ভ্রমে চেয়েছিলেন। কেমন স্বাধীন তাই দেখ! যা মন লয় তাই করে।

বাড়িতে ঢুকে পলাশ বলেছিল, নিনা, এই দেখ এই একটা দিদা!

—কেমন দিদা?

—সত্যি দিদা।

- আমার দিদার মত আপিসে যাবে?

—না না, সব সময়ে তোমার কাছে থাকবেন।

—নিনার খাওয়াটা পিসি ...

রিমা বলেছিল, কিছু খেতে চায় না।

পিসি ক্ষীণ স্বরে বলেছিলেনে, দেখুম!

—আমি সব বুঝিয়ে দেব। আটটায় স্কুলে যায়, বারোটায় ফেরে। সকালে ডিম, দুধ, টোস্ট...কি অসম্ভব রোগা, কি কম ওজন...

খুব তাড়াতাড়ি নিনা আর পিসি পরস্পরকে আঁকড়ে ধরেন। গল্প বলে বলে খাওয়াতেন. ঘুম পাড়াতেন।

যেদিন রিমা শোনে, সকালে নিনা গলা ভাত' মাখন, আলুসেদ্ধ খেয়ে স্কুলে যায়, দুপুরে মাথায় তেল দিয়ে স্নান করে, বিকেলে পিসির সঙ্গে পার্কে যায়, রিমা খুশি হয় নি।

—ওর ব্রিংগিং—আপটা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

রিমার এক কাকা, ওদের ডাক্তার। তিনি হলেন বছর বছর বিদেশে সেমিনার করা এক ভেতো বাঙালী। বিদেশেও ভাত খোঁজেন। শিশু-বিশেষজ্ঞ।

তিনি বললেন, চমৎকার গ্রোথ হচ্ছে, ওজন বাড়ছে। আগের চেয়ে অনেক খুশি থাকে। কই, তেমন জেদ, চেঁচামেচি, সীন তো করে না।

—তবুও...

—দেখ, ওর দরকার ছিল স্নেহ মমতা, কারো সাহচর্য। আমি তো মনে

করি তোরা খুব লাকি। নিনার যা দরকার তা পেয়েছে।

—হ্যাঁ···আগে আমরা সন্ধ্যায় বেরোলে···

—তবে ?

—কিন্তু ওকে সে সব গল্প বলেন, ও সব বেংগলি ফেয়ারিটেলস্ কি ভাল ?

—রিমা, রিমা! তোর মেয়ে খুব লাকি। তুই নিজে তো দেশের কালচার, সাহিত্য, কিছু জানিস না। এখন এ সব জানলে তবে ইজ্জত পাবি।

পলাশ বলেছিল, কিসে তুমি খুশি হবে রিমা? নিনা ভাল আছে, হ্যাপি আছে, সুস্থ আছে। কত হাসে, ক্লাসেও ভাল করছে, এটা তো ওঁর জন্যে।

নিনাও কম পাজি নয়। একটু বড় হলেও ও বলত, অ দিদা! আজ রবিবার! মা যতক্ষণ না বেরোয়, কাছে যাই একটু, নইলে তোমার সঙ্গে জেলাসি করবে।

নিনাকে নিয়েই সময় কেটেছে পিসির। বাড়ির কাজ সত্যি করতে হয় নি। ক্লীনিং আর ওয়াশিং মানে ঝাড় মোছ, ঝাঁটপাট, মোছা, বাসন ধোয়া, রান্নার ঝাড়ন টাড়ন কাচার লোক আছে। নাইলনের শাড়ি পড়ে, উঁচু খোঁপা বেঁধে, গম্ভীর মুখে রান্না করে যাওয়ার লোক আছে।

রাক্ষুসে একটা ডীপ ফ্রিজ আছে। রবিবারই সাতদিনের বাজার করে আনে পলাশ। খাবার-দাবার মাইক্রোওয়েভে গরম করে পরিবেশন শুধু করে নেয় রিমা।

সবাই সব কাজ করে যাবার পরে পিসিমাকে করতে হয় শুধু নিনার কাজ।

না, নিনা ওঁকে কোন কষ্ট দেয় নি।

স্বাবলম্বী হবার জন্যে কি জেদ ওর।

বিছানা নিজে তুলবে, বই গোছাবে, স্কুল থেকে এসে মোজা কাচবে।

—তুই যদি সব করস, আমি কি করি?

বা, তুমি তো বুড়ো মানুষ, তোমার কষ্ট হয় না?

দশ বছর বয়সে নিনা একদিন গম্ভীর মুখে বাবা-মাকে কার্ড দিল।

—পার্কে "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতা রবিবার। আমিও আঁকছি। তোমরা যাবে।

—সিট অ্যান্ড ড্র?

—ওঃ মা! "বসে আঁকো!"

—তুই এর মধ্যে আছিস?

—নিশ্চয়। আমাদের ক্লাবই তো করছে।

—তোদের ক্লাব?

—বেশ ভুলে যাও! আমাদের বাড়ির পেছনে বিপ্র চৌধুরীর বাড়ি! ক্লাবে তো তোমরাই ভর্তি করলে।

—ও হ্যাঁ। না, বিপ্র চৌধুরী খুব ভাল কাজ করছেন। ছোটদের নিয়ে...

—পার্কে কত রকম খেলা শিখিয়েছেন জানো?

—তুই ফার্স্ট হবি তো ?

জানি না। ভাস্করটা যা ভালো আঁকে।

—ভাস্কর কে ?

—ও'র নাতি। এর মধ্যেই ভুলে গেলে ? কাগজে ওর নাম দেখনি ? লেকের জল থেকে একটা বাচ্চাকে তুলে প্রাণ বাঁচিয়েছে ?

—দারুণ ছেলে বলতে হবে !

—নিশ্চয়। সাউথ পয়েন্টে ক্লাসে প্রথম হয়। ডিবেট করে, খেলে, সব পারে।

—আঁকেও ভালো ?

—এখন অবধি ভীষণ ভালো। হবে না ? কার ছেলে তা দেখতে হবে তো ?

রিমা বলল, কার ছেলে ?

—যার ছবি থেকে ক্যালেণ্ডার করেছ ?

—রুদ্র রায়চৌধুরী ?

—আর মা অদিতি রায়চৌধুরী।

—যিনি গান করেন ?

—আর কে !

—নিনা, এবার চুল কাটতে হবে।

—বয়ে গেছে। আমি লম্বা চুল চাই।

রিমা পলাশকে বলেছিল, বড্ড ইনডিপেনডেণ্ট হয়ে যাচ্ছে বয়স আন্দাজে।

—কার মেয়ে দেখতে হবে তো ?

—কোথায় যাচ্ছে...

—রিমা ! বিপ্র রায়চৌধুরী একজন নামকরা হকি প্লেয়ার ছিলেন, ফ্যামিলি ডোনেশানে "মমতা আই ক্লিনিক" করেছেন। ছোটদের নিয়ে ও'র...আওয়ার ক্লাব" খুব নাম করা। নিনা ভাল জায়গাতেই যাচ্ছে।

—কি রকম বদলে যাচ্ছে না ?

—পিসির জন্যে ? পিসি আছে বলে...

—ইয়েস...অফ কোর্স...

– স্কুলে ও তো ভাল রেজাল্টই করে।

--কিন্তু বন্ধু যত সব ওখানে।

—কি আর করা যাবে। খারাপকিছু দেখলে বলা যেত। শী ইজ অল্ রাইট।

—বড্ড বাঙালী, বাট হাউ ? আমার মেয়ে হয়ে ?

—জানি না। মিছে ভেবো না।

—মিছে নয় পলাশ। ওদের সময়টা আরো কম্পিটিশনের হবে। ইংরিজি ছাড়া...

পিসি সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। পলাশটা যেন কি ? বাঙাল ছিলি, তাতে লজ্জা পাস। অহন বাঙালী তুই, তাতেও লজ্জা পাইতে হইব ? আ

রে গাধা! যারা ফটফট কইরা ইংরিজি কয় না, তারা উপাস কইরা মরতাছে? দেইখা আর তর দিদির দেওরের পোলা-মাইয়ারে। বাংলা ইস্কুলে পইড়াই কেমন কাম করে, কত নাম করছে! তোর ঠাইরদা কুন্ ইংরোজিতে ফটফটাইত?

পলাশ তা বলল না। বলল, রবিবার যেতে হবে।

এখন পিসির হাতে অনেক সময়। নিজের পুরনো কাপড় দিয়ে কাঁথা ধরেছেন একটা। একটা কালো গরম চাদরে নিনার জেদেই তো সবুজলাল-হলুদ দিয়ে কাঁথা ফোঁড় দিতে হয়েছিল। নিনা শীতকালে সেটা গা থেকে নামাত না। সেটা দেখে "ও, লাভলি" বলে রিমা যেন মরে গেল। তখন তাকেও একটি করে দিতে হয়।

নিনা ওঁকে এত সুতো দিয়ে গেছে।

—চমৎকার কাঁথা করো তো দিদা।

· করবি তো ছিনেমা, কাঁথা কি হইব?

—আমার আর ভাস্করের বিয়েতে উপহার দেবে।

কাঁথা সেলাইয়ের অপার সময় এখন। অপার সময় নিনার কথা ভাববার। নিনাই তো ওঁর দগ্ধ মনে প্রলেপ দেয়। ভালবাসা দিয়ে ঢেকে দেয় ওঁকে।

এর কিছুদিন বাদেই, পুজোর সময় রিমা যখন বাড়ির কাজের লোকজনকে পুজোর বোনাস কত দেবে তা হিসেব করছে, নিনা হঠাৎ বলল, বাবা, দিদা তোমার কে?

—পিসি। কেন?

—এটা বেশ মজা। পিসি হলে তাকে কিছু দিতে হয় না, তাই না?

—নিনা! শী ইজ গিভন অল শী নীড্স!

—চুপ করো মা! আমি জানতে চাই, দিদাকে তো তোমরা মেইডই মনে করো, টাকা দাও না কেন?

—মেইড মনে করি?

—রেগে যেও না মা! ওঁকে মাটিতে শুতে বলেছিলে, মনে আছে? তোমার মাসিকে বলতে পারবে? দিদাকে কাপড় দাও, যখন আমিনাদের দাও। টাকা তো...

রিমা হিসহিস করে বলেছিল, আমি তোমার পিসি নই। ওঁর নামে অ্যাকাউন্ট করেছি। যেদিন থেকে এসেছেন, প্রতি মাসে একশো টাকা জমা পড়ে।

—হাতে কি দাও? কিছু না।

—ওটা উনি একসঙ্গে পাবেন যখন চান...

—কি করবে বাবা, দিদা সে টাকা নিয়ে? একশো টাকা আর উনি যা খান আর পরেন সব জুড়লেও খুব কম হয়। হয় ওঁকে টাকা দেবে, নয় আমার হাত—খরচ বাড়িয়ে দাও, নইলে আমি ভাস্করের মত টিউশানি করব।

—ভাস্কর...টিউশনি করে?

—"আওয়ার ক্লাব"—এ অনেকেই করে। দাদু বলেন, টিউশনি করে হাত-খরচ চালাও, কাজ করতে শেখো। মা! হিস্টিরিয়া কোর না। তাহলে আমিও চেঁচাব। সকলকে বলে দেব তোমরা ওঁকে টাকা দাও না।

পিসি তো ভয়ে বাঁচেন না।

—এ তুই কি করলি নিনা? তর মা কথাই কয় না, তারে আমি যমের মত ডরাই। অরা ভাবব, আমিই তরে শিখাইছি ওই কথা বলতে।

- মজাটা দেখ না। ভয় পেও না। ভয় পেয়ে পেয়েই তো তোমার এই অবস্থা। আমি তোমার হয়ে লড়ছি, ভয় পাবে কেন?

এর পরেই রিমা একদিন ওঁর ঘরে ঢোকে। পিসি তো ভয়ে কেঁপে অস্থির।

—নিনা কোথায়?

—বারিন্দায়। নিনা।

—এই যে!

—দেখ নিনা, আমাকে আর বকতে পারবে না। পিসিমা সো সরি, সাত কাজে থাকি, ভুলেও যাই। এই টাকাটা রাখুন পিসিমা! ইচ্ছেমত খরচ করতে তো সাধ যায় মানুষের। আই অ্যাম গ্রেটফুল নিনা! তুমি না বললে ..

—মা তুমি কি ভালো!

নিনা মাকে চুমু খেয়েছিল। পরে পিসিকে বলেছিল, এরা শক্তের ভক্ত বুঝেছ? ওই যে বলেছি সবাইকে বলে দেব...এখন দিদা! আমার হাতখরচ. তোমার টাকা থেকে আমরা বাংলা বই কিনব, বাংলা গানের ক্যাসেট কিনব। দেখবে তোমার কত ভাল লাগবে।

—কত্‌কাল পরনের অভ্যাস নাই!

—বন্ড বকো! এ বাড়িতে বাংলা খবরের কাগজ ঢুকিয়েছি, কাগজ তো পড়ো। ভাস্করের কাছ থেকে বই আনি. তাও তো পড়ো। বইও পড়বে।

বইগুলো এখনো আছে, পড়েন। ক্যাসেট বাজাতে মন চায় না। তবু তো নিনার প্রিয় গানগুলো শোনেন।

নিনা যখন স্কুলের পড়া শেষ করল মায়ের লক্ষ জেদেও ও পড়তে গেল না দিল্লীতে। বলল, বাপ্‌রে! আমাদের নাটক নিয়ে দিল্লী ঘুরে এসেছি। ওখানে কেউ যায়? আমাদের প্রেসিডেন্সি অনেক ভাল। পড়ব তো ইংরিজিতে অনার্স।

এই সময় নিনা পিসিকে শুধু ভাস্করের কথা বলত। ওদের নাটকের ছেলেমেয়েরা পিকনিক করবে, পিসিকে নিয়ে গেছে ম্যাসাঞ্জোরে কাঁকড়াঝোড়ে ভাস্করকে বলেছে, দিদার কাছে যদি পাশ করিস, তাহলে তোকে বিয়ে করব নইলে নয়।

—তোর বাবা, মা?

—তারা মূর্ছা যাবে।

নিনাকেই তো বলতে হত জীবনের যত কথা। বলো, বলো দিদা। ব

হালকা হও।

সেদিন ওদের বন্ধু রূপা বিয়ে করল না বলে আরেক বন্ধু তীর্থংকর আত্মহত্যা করে, নিনা ভীষণ কেঁদেছিল। বলেছিল, এমন কাজ কেউ করে?

—ভালবাসার জনরে না পাইলে করতে পারে।

নিশ্বাস ফেলেছিলেন। নিনা আর ভাস্করকে দেখে, তীর্থের কথা শুনে, পিসির কি নিজের কথা মনে হত?

তীর্থদের বাড়ি আর যায় নি নিনা। সারাদিন মর্গ আর শ্মশান ঘুরে এসে স্নান করে শুয়েছিল। আকাশ কালো করে বৃষ্টি নেমেছিল।

রিমা আর পলাশ মেয়েকে ঘাঁটায় নি।

পিসি বললেন, কিছু খা!

—না দিদা। তুমি আমার পাশে শোও।

তারপর বলল, রূপা তো চিরকালই একসঙ্গে তিনজনের সঙ্গে প্রেম করে। তীর্থকে ও বিয়ে করত না। ও বলে, বিয়ে করব কোন বক্সওয়ালাকে...

—বাসকো বেচে যারা?

—না না, বড় চাকরি করা লোক! গাড়ি, বাড়ি, সব থাকা চাই। তীর্থটা এমন ইমোশনাল কি করে বসল!

অন্ধকারে পিসি সকরুণ হেসেছিলেন। সেদিন-নিনা আর পিসি বোধহয় সব চেয়ে কাছে আসেন।

আমাগো কাল হইলে মাইয়ারে মাইনা লইতে হইত। পোলারেও। তহনকার মানুষ পোলাপানের মন বুঝত না।

—কার কথা বলছ দিদা?

—এই দেখ না, আমাগো কালের কথা! গাঁয়ের পোলা, ছুডকাল হইতে একলগে খেলা করছি, ঠাকুর ভাসান দেখছি, একলগেই বরো হইছি।

—তুমি?

—হ রে, আমি। তা হেয় আমারে বিয়া করতে চায় শুইনা আমি তো লজ্জায় মরি। হেয় কইল, ক্যান! বিয়া তো দিতই তোমায় বাপ, তা আমার বরো ইচ্ছা...

—তুমি কি বললে?

তহন নো পোলায় গিয়া নিজের বিয়ার পরস্তাব দিত না। মুরাব্বি ধরত! কারে বা ধরে! পাত্রপক্ষ তো পরস্তাব আনত না, মাইয়া পক্ষ যাইত। পারাগাঁয়ে কতই কেচাল আছিল তহন!

—কি হল তারপর?

—এক ছিল দয়া পিসি। বামুনের বিধবা। সন্তান নাই, সকলের ঘরেই যাইত। আমাগো বার বার তো শিখাইত, পাঠশাল লইয়া যাইত। তিনিই আইয়া বাবারে পরস্তাব দেয়।

—সেখানেই বিয়ে হয়?

—দূর হেমার। বাবায় তো তাগো বংশ ছুট, গাঁয়ে কুটুম্ব করতে নাই, তাগো জমিজমা নাই, পোলা দুখান পাশ দিয়া মাস্টারি করে, এই সব কইয়া পরস্তাব ফিরাইয়া দিল।

—তারপর?

—আমার উপর যম পাহারা বস্‌ল। আর মাস না ঘুরতে আমারে বিয়া দিল।

—তিনি কিছু করলেন না?

—কি করত? মনের কষ্টে চইলা আইল এ দ্যাশে। পরে যখন সকল বেচতে যায়, তখন তো আমি এক নিউদ্দিশের বউ। হেয় কইল, তোমারে আমার হাতে দিল না, আবার জলেও ফালাইয়া দিল।

—দিদা! কত কষ্ট পেয়েছ! তুমি বা বিয়ে করলে কেন? জেদ কেন করলে না?

—জিদ করা যায়, তাই জানতাম না।

—এখানে এসে খোঁজ কর নি?

—কারে জানতাম? আইসাই তো ঘরে বন্দী। কাম কর, ভাত খাও। আর তহন...হেয় কি বিয়া না কইরা বইসা আছে? কি করতে পারত?

—তাঁর নাম কি?

—নাম আছিল একখান। ক্যান্ শুধাস?

—যদি বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দি ই? ভাস্কর বলে, তাতে খুব কাজ হয়।

—দূর পাগল!

—তুমি কি ভালো!

—শোন্, একটা কথা কই।

—অনেক কথা বলো।

—তাইলে কই। তুই খাস নাই, আমিও উপাসী সারাদিন, চল্ একটু খা। আমি দই সন্দেশ ঘরেই রাখছি।

—কিন্তু....

—জীবন বরো কঠিন রে মা। পলাশের জ্যাঠা যখন রেলে কাটা-পরল, অর ঠাইরমা ত শয্যা লইল। একদিন...দুদিন...তারপর উঠল, খাইল সবই করল। তীর্থের মায়েও ক'দিন দাপাইব। তার পরে আবার...

— কিন্তু তোমাকে বিধবা দেখে তো তোমার মা...।

নিশ্বাস ফেলেন পিসি।

—মায়ে তো হেই পোলার লগেই বিয়া দিতে চাইছিল। আর জামাই নিউদ্দিশ হইতে বাবারে সর্বদা বলত, মাইয়ার সুখ দেখে নাই, নিজের জিদ দেখল, আমার বুকে চিতা জ্বাইলা দিল...বাবায়ও খুব জ্বইলা জ্বইলা মরছে। চল্ নিনা।

—চলো।

এখন কাঁথা সেলাই করতে করতে সে সব কথা কেন মনে ধুরে ফিরে আসে?

স্বদেশ যখন গ্রামে এল সব বেচতে, সে বলেছিল, এ বিয়া কি বিয়া? তুমি কও তো আমি তোমায় অহনো লইয়া যাইতে পারি।

—কেমন কইয়া?

—কে চিনে আমাগো?

পিসির কোঁচড়ে শাক ছিল। হাতে লগি। লগি দিয়ে টেনে টেনে কলমী শাক তুলছিলেন। চুলের চালে ঢল নেমেছে, আকাশের মেঘে বিশ্বভুবন ম্লান।

—আর হয় না গো। বাবার মুখ পুরব, আমিও শান্তি পাইতাম না।

—অহন শান্তি পাইত্যাছ?

পিসি জাম গাছে হেলান দিয়ে মুখ ফিরিয়েছিলেন। নাকের পাটা ফুলছিল। চোখে জল আসছিল।

—তুমি বিয়া বস, সংসারী কর। আমারে ভুইলা যাও ' আমার কপালে··· যা আছিল - তা হইছে…

—হেই দ্যাশ ভাগ হইল ..কুনখানের মানুষ কুনখানে গেল···সব উলট পালট…তুমি যদি কও···

—তুমি যাও গো…আমারে আর অশাইন্ত কইর না···দয়া কর···

পিসি ছুটে চলে যান বাড়ি। স্নান করতে নেমে তবে কাঁদতেন। বুকে পাথর চাপা দিতেন।

বারো বছর পুরে আসার মুখে বাবা হাট থেকে বড় বড় মাছ আনতেন। সাতব্যঞ্জন ধরে দিয়ে মা কাঁদতেন। বারো বছর পুরে যেতে সেদিন বাবা কপালে হাত রেখে দাওয়ায় বসা। মা তো সাতদিন ধরেই আছাড় খাচ্ছেন। পিসি কাঁদতে পারেন নি। ওরা শাঁখা ভাঙছে, নোয়া খুলছে, হাহাকার করে করে কাঁদছে, পিসি যেন পাথর।

আজ, এতকাল বাদে পিসির মনে হয় বড় নিষ্ঠুরভাবে অপচয় হয়ে গেছে জীবন।

নিনাই একমাত্র অবলম্বন যেন।

নিনা সেবার থিয়েটার করে গেল শেষবারের মত। "আওয়ার ক্লাব"-এর নাটক দলের কল শো।

রিমা বলল, কালীহাটতলায় থিয়েটার করতে যাবে, রাতে থাকবে কেন?

—মনসা মেলার ভি.ডি.ও. ডকুমেন্টারি তুলবে যে ভাস্কর আর ব্রততী।

—অ্যান্ড হোয়াট ইজ্ মনসামেলা?

—মনসা সাপের দেবী, ওখানে বিরাট মনসা মন্দির, মনসার গান হবে, শতখানেক সাপুড়ে আসবে সাপ বেচতে।

—ও, স্নেক্স! ছরিবল!

—মা! ওখানকার কালচারাল ক্লাব আমাদের ডেকেছে। বলেছে, এটাও দেখে যাবেন। ডাইং কালচার! ভাবছ কি? রাজদান যাচ্ছে স্টীল তুলতে।

—যাচ্ছে? রাজদান? পলাশ, ওকে ফোন করো। আই ওয়াণ্ট সাম স্টীল্‌স।

—আমি যাচ্ছি তা হলে…

—পিসিমাকে…

—নিশ্চয়। সব মেয়েদের চার্জেই দিদা থাকছে।

ভরা শ্রাবণে মনসা মেলা। ঝমঝমে বৃষ্টিতে বিশাল আটচালায় নিচে মনসা-মঙ্গল গান। খুব, খুব ভাল লেগেছিল পিসির। কলকাতা থেকে দেড়-ঘণ্টার তো পথ, সেখানে এমন জিনিস হয়? মনসাতলায় কমিটির পাণ্ডা বলেছিল, আবার আসবেন।

—নিনা বলেছিল, জায়গাটা কেমন?

—খুব ভাল রে।

—আসছে বছরও আসব, কেমন?

—লইয়া আসিস।

বি. এ. পাশ করেই তো নিনা চলে গেল পুনা ফিল্ম ইনস্টিটিউটে।

মা বাবা জানে না, কিন্তু পিসি জানেন, ওখানে ও আর ভাস্কর বিয়ে করবে। এ বাড়িতে নিনা ফিরবে না আর। যদিও মাকে বলে গেছে, সিনেমাটোগ্রাফি শিখব, অ্যাড্‌-ফিল্মে করব।

পিসি জানেন ও ও-সব করবে না। নিনা ওঁকে বলে গেছে, তোমার মতো আমি আমার জীবনকে মা-বাবার হাতে ছেড়ে দেব না দিদা! আমি অন্য রকম ভাবে বাঁচব।

ভাস্করের মা-বাবা মেনে নেবেন।

রিমা পলাশ মানবে না।

নিনা বলেছে, তুমি কাছে না থাকলে আমি এ রকম হতামই না। বাবা মার সঙ্গে লড়তে লড়তে লাফাংগা হয়ে যেতাম, ড্রাগ ধরতাম, যাকে তাকে নিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। মার বোনের মেয়ে তুলি যা করল। তাকে দেখেও কি মা শিখেছে কিছু?

—তরে ভাল তো বাসে।

—আমাকে সম্পত্তি মনে করে।

—তর বাবা?

—বেচারি বাবা! মাকে খুশি করতে করতে ক্লাউন হয়ে গেল একটা!

নিনার কথা ভাবতে ভাবতেই পিসির দিনরাত যেন পাথরের মত ভার হয়ে উঠেছে।

এর মধ্যেই শ্রাবণ এসে পড়ল।

আর পিসির মনে হঠাৎ দুর্বার বাসনা জাগল, আরেকবার যাবেন মনসাতলা।

পলাশ ও রিমার অনুমতি পাওয়া সহজ হয় নি।

রিমা বলেছিল, যাবেন যান, রাতে থাকবেন কেন ?

—রাতেই গান হয়।

—থাকবেন কোথায় ?

—সবাই বইসা গান শোনে।

নিনা নেই, তাই রিমা কথা বলার সময়ে আর নরম গলা বের করে না। রিমা রূক্ষ হতে পারে, কড়া হতে পারে।

পিসির তো যাবার জায়গা নেই।

—বাড়ির সিকিউরিটির জন্যে আপনার থাকা দরকার, সেটা যদি না বোঝেন—

পিসি বললেন, কাল ভোরেই বারামু।

—ফিরবেন ?

—তোমরা বারাইবার আগেই আইতে চ্যাণ্টা, করুম।

তবে গারি তো আপন মর্জিতে চলে।

—যা ভাল বোঝেন, ডু ইট।

—বুজাছি।

মনসামেলার দিন বৃষ্টি হবেই, নিয়ম।

সারা দিন মেলা দেখে সময় কেটেছিল। মনসা থানে সবাই ঢেলা বাঁধে, পিসিও বাঁধলেন, পুজো দিলেন। নিনারে সুখে রাখ মা, অর জানি ভাস্করের লগে বিয়া হয়। ও জানি সুখ পায়, শান্তি পায়।

পুজো দিয়েই মনে শান্তি এল। যেন মস্ত একটা কাজ সারা হল। আর যেন কোন তাড়া নেই।

দোকানে দই মিষ্টি খেলেন।

সন্ধ্যায় বসলেন আটচালায়। সেই পাণ্ডা বলল, দিদ্মা এবারও এয়েচেন ?

—আইলাম।

—আসতেই হবে। মায়ের টান বড় টান ! এখনো মা জাগ্যত, যা মাংবে তাই দেবে।

—বাইচা থাক বাবা।

গানে গানে রাত ভোর। কিন্তু ভোর রাত থেকে প্রলয় নামল। যেমন জল, তেমন ঝড়।

পিসি সকলের সঙ্গেই নেমেছিলেন নিচে। আটচালা মটমট করছিল।

নেমে কোথা যাবেন, কি করবেন, হাঁটতে হাঁটতে শেষে বুঝলেন, এটা স্টেশনের পথ নয়।

স্টেশনে পেঁছে বা কি শুনলেন।

ট্রেন চলবে না। তার ছিঁড়ে গেছে।

পিসি স্টেশনের চালের নিচে যাবেন, তা লোকের ভিড়ে দইথই। ঠেলা

খেতে খেতে ছিটকে পড়লেন বাইরে।

—আরে আরে! বুড়া মানুষ! দেখি, ধরেন, আমার হাত ধইরা ওঠেন!

পিসিকে তুলে দাঁড় করালেন ভদ্রলোক। তারপর বিস্ময়ে বললেন, তুমি!

পিসি মুখ তুললেন।

—তুমি!

—এই দেখ। কপালে ল্যাখা থাকলে…চল চল…আমারে ধইরা চল।

পিসি ঈষৎ হাসেন।

—তাই চল।

স্বদেশের ঘর একখানা, টিনের চাল। ঘরেই স্টোভ, বাসন, সংসার।

চা খেয়ে পিসি টোপলা থেকে পান বের করেন।

—তা, একজনের কি সংসার নাই? একার ঘর?

—আছিল হকলই। ঘরণী মইরা ছুটি দিয়া গিছে। পোলারা নিকম্মা মাস্টার বাপরে ধইরা থাইকা জীবন নষ্ট করে নাই।

বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি আজ থামবে না।

—তারা গিছে কুনখানে?

স্বদেশ মোটা কাচের চশমা মোছেন, ঈষৎ হাসেন।

—বর্ধমানে জমি কিনছিলাম…বারি করছিলাম…পোলারা ধরল মস্তানি। তা অগো মায়ে মরল তা বছর চৌদ্দ তো বেবাক…অগো লিখ্যা দিলাম সব… লালগোলা…বাসুদেবপুর কত জায়গা ঘুরতে ঘুরতে শ্যাষম্যাষ এখানে…

—একাই?

—হ মুক্তি। আপনি আর কপনি প্যানশানও লেইখা দিই…এই ঘরখানা তুইলা নিছি।

—বউ মরলে বিবাগী।

—সেই বিয়াও বিভ্রান্ত! গরিবের খোরা মাইয়া…আমিও এক খোরা… কষ্ট পাইয়া গিছে। তোমার খোজ কত করছি…রানাঘাটেও গিছিলাম একবার…

—কবে?

—ধর, সেও চল্লিশ বছর হইল ..

—আমি তো ওখানেই তহন, কেও তো বলে নাই?

—আমারে, কইল, তোমারে চিনে না। তহন আশা ছারলাম। নয় তো .. তুমি এহানে?

—সে এক বিভ্রান্ত।

—আকাশ তো ছারত না, আর গারিও চলতে অহন কি করবা?

তা, জীবিকা?

—একটা প্রাথমিক স্কুল অর্গানাইজ করতেয়াছি। সরকার অনুমোদন দিবে কি না কে জানে! মনসাতলার পশ্চিমে স্কুল নাই। দেখ মুক্তি…

—মুক্তি নামে কতকাল কেও ডাকে না!
দ্যাশের কথা মনে পরে?
—খুব।
—আমারও। যাউক্ গা, একখানা ধুতি দেই, কাপর ছার।
তারপর জল ধরলে দোকানে···
—ঘরে চাল নাই?
—আছে।
—তাতেই হইব।
—তুমি কেমুন কাটাই লা?
—কইমু।
অনেক, অনেক সময় যায়। বৃষ্টি দেখতে দেখতে স্বদেশ বলেন, অকারণে তুমি কষ্ট পাইলা, আমিও তোমারে খুইজ্জা···
—মনসার দয়ায় পাইয়া গেলা।
—হ। মুক্তি?
—কও।
—অহন আমার বাহাত্তর, তোমার আটষট্টি। তোমারও কেও নাই, আমারও কেও নাই। আইয়া পর যদি, মাথায় কইরা রাখতাম! তয় কইতে ভরসা পাই না।
মনে মনে হিসেব করেন পিসি। নিনা খুব খুশি হবে। নিনার বিয়ের খবর না পেলে কিন্তু ক'টা দিন বা আর বাঁচবেন? আর কত ভাববেন?
—কি ভাব?
পিসি নিশ্বাস টানেন।
—নয় ক্যান্? আমি আর কার কথা ভাবুম? এক নিনা, সে বুঝব।
—নিনা কে?
—সে একজন! পরে কইমু।
—তয় আর ফিরবা ক্যান্?
—টাকা যা জমছে, লইয়া আসুম। বইলা কইয়া আসুম, চুরি তো করতেয়াছি না। লও, কাপর দাও একখান। জল কোথায়? তা এহানে একজন কি বলত মানুষরে?
—তারা জানেই না পূর্ব বিত্তান্ত। কইতাম, চইলা গিছিল, ঘুইরা আইছে।
—তয় তাই!
পিসি স্টোভ ধরান, জল চাপান। চালে ডালে মিশিয়ে নেন।
এই প্রথম নিজের কথা নিজে ভাবতে পেরে খুব শান্তি পাচ্ছেন, ভয় করছে না কোন।
নিনাকে একটা চিঠি, স্বদেশকে দিয়েই লেখাবেন।

অনেক করেছিলেন অমলা সংসারের জন্যে, সতেরো বছর বয়স থেকে তিলে তিলে ঢেলে দিয়েছিলেন নিজেকে। তিরিশ বছর বাদে ফেলে দিল সংসার তাঁকে, নিজেদের প্রয়োজন মিটে যেতেই ছুটি দিয়ে দিল। যখন ট্রেনে উঠে বসলেন সুজনীপাতা বিছানার কোণে, তখন অনুভব করলেন নিজের জন্যে শোক করবার মত এক ফোঁটা জল আর বাকি নেই কোথাও। কাঁদবার ক্ষমতাটুকু অবধি নিংড়ে নিয়েছে, অকৃতজ্ঞ সংসার তাঁকে কিছুই দিল না।

জানলায় মাথা রেখে বসে ট্রেনের চাকায় চাকায় শুনতে পেলেন সতীর কথা, 'উনি আমাদের কেউ নন ..একসময়ে অনেক করেছেন...উনি আমাদের কেউ নন।'

যেন কে তোর আপন, কে বা পর, তা শুধু লেখা আছে রক্তের সম্বন্ধে। রক্তের সম্পর্কটুকুই যেন সত্যি। তাই যদি হবে, তবে কোথায় ছিল সেইসব অতি আপনজনরা, কেন কেউ এগিয়ে আসে নি, কেন এই পরজনেরই ডাক পড়েছিল সেদিন?

সতীর ঠাকুমার কথা মনে পড়ল। 'এস, আমার লক্ষ্মী মা এস,' কি আদর করেই টেনে নিয়েছিলেন কাছে। অথচ অমলার দিদি, যাঁর জোরে ও বাড়ীতে যাওয়া, তিনি কি অসন্তুষ্টই না হয়েছিলেন। মুখ অন্ধকার করে বলেছিলেন, 'বৈমাত্র বোন, তায় বিধবা, ওকে আনতে গেলে কেন?'

অথচ তাঁর প্রয়োজনেই অমলাকে আনা। বৈমাত্র দিদির সম্পর্কে অমলার মনে কি ভয় মেশানো আকর্ষণই না ছিল! কত কম দেখেছেন দিদিকে। তিনি ধনী মামাবাড়ীতে মানুষ, সেখান থেকেই বিয়ে। তাঁর মায়ের ঠাঁই কেড়ে নেবার জন্যে অমলার মা-কে কোনদিন ক্ষমা করেন নি। অমলারও ভাগ্য, মা মরে গেলেন, নিজে হলেন বিধবা, শেষে বাপকে হারিয়ে অনাথ যখন, তখন এলেন জামাইবাবু। বললেন, 'চল, তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।'

অবশ্য আজ অমলা বোঝেন, নিঃস্বার্থ পরোপকারিতার প্রেরণায় জামাই-বাবু গলিঘুঁজি খুঁজে খুঁজে আসেন নি। রুগ্ন দিদির মন উঠত না। ছেলে-মেয়েদের দেখবার জন্যে মাইনে করা লোক ছাড়া উপায় ছিল না, অথচ মন উঠত না কিছুতে।

শেষে দিদির শ্বাশুড়ী বলেন, 'বউমা-র বৈমাত্র বোনটিকে আনিয়ে নাও না কেন? সে বেচারী নিরাশ্রয়, তোমাদেরও প্রয়োজন।'

দিদি মোটেই খুশী হন নি। কিন্তু এ সংসারের চাল ছিল অন্যরকম। জামাইবাবুরা দু'ভাই মাকে পেন্নাম না করে বেরুতেন না। মা'র কথা ছিল সবার ওপরে। তাঁর কথাটি থেকে গেল। অমলা আশ্রয় পেলেন।

দিদির কাছে দাঁড়িয়েছিলেন ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে। তাঁদের সংসারে দিদির ঠাঁই ছিল অনেক উঁচুতে। মা-কে দিদি এত অপছন্দ করতেন, অথচ মা সগৌরবে পাড়াপরশীকে বলতেন, 'আমার বড় মেয়ে অসীমা এবার জামাইয়ের সঙ্গে পশ্চিমে গিয়েছিল।' অথবা 'অসীমার মেয়ে এবার ক্লাস ফাইভে উঠল।'

অমলা জানেন বাবা-ও দিদির সব খবরাখবর রাখতেন। দিদির অসুখের সূত্রপাতে কত ব্যস্ত হয়েছিলেন।

বোধহয় জামাইবাবুই সব খবর দিতেন।

অথচ দিদি দেখতে লাগলেন তাঁকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে,খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। রোগে তাঁর আদুরে চেহারা ভেঙে গিয়েছিল, তাই যেন ভাল করে দেখলেন অমলার কাছ থেকে কোন ভয়ের কারণ আছে কি না। দিদির ঠোঁটে একটু আলগা হাসি ঝুলেছিল, তখনো অমলা জানেন না তার পেছনে কাজ করছে গোপন ও ক্ষমাহীন সন্দেহ। তখনো জানেন না, যে-দিদি জীবনের সব পাওনা না চাইতে পেয়েছেন, একটুও ঠকেন নি, তিনিই সব কিছুকে অবিশ্বাস করেন, বিশ্বাস করেন না জীবনে কোন কিছু শুদ্ধ, সুন্দর পবিত্র হতে পারে। অমলা শুধু বাইরেটুকু দেখেছিলেন। প্রশস্ত শুভ্র বিছানায় এলিয়ে থাকা এক সুন্দরী রমণী। সযত্নরচিত বেণী, আর মুখের প্রসাধন দেখলে মনে করতে কষ্ট হয় রোগের কীট ঐ নিটোল সুন্দর শরীর দংশন করেছে।

'কি দেখছ ? বিশ্বাস হচ্ছে না অসুখ আছে ?' দিদির কথায় মৃদু নিঃশ্বাস ছিল।

অমলার মুখে কথা যোগায় নি। বৈমাত্র বোন হন আর যা-ই হন না কেন, জগৎসংসারে উনিই অমলার আপনতম একথা মনে হতেই হঠাৎ বাবা-মা প্রায় অপরিচিত স্বামী, সকলের জন্যে মনটা হু হু করে উঠেছিল।

'কবে কপাল পুড়ল !'

এ প্রশ্নের জবাবে চমকে উঠেছিলেন অমলা। বিধবার অবস্থাকে যে কপাল পোড়া বলে সে তাঁর জানা। কিন্তু কানে শুনে অভ্যেস নেই। বেদনাবিদ্ধ হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছিলেন। চেষ্টা করেছিলেন, বাবা চেষ্টা করেছিলেন। খরচ পত্তর করে অমলাকে পেঁছে দিয়েছিলেন অন্য জীবনে, ভাগ্যে সইল না।

জামাইবাবু উসখুস করেছিলেন, 'এখন এসব কথা থাক।'

'হ্যাঁ থাক। এখন তুমি যাও অমলা, তোমার জামাইবাবুর কষ্ট হচ্ছে, তোমার দাঁড়িয়ে থাকা উনি দেখতে পারছেন না।'

অসীমার ঠোঁটের হাসি কঠিন, নির্মম হয়ে উঠেছিল। আয়না থেকে ঝলসে ফেলা রোদের মত নির্মম, তীব্র।

জামাইবাবু বিব্রত হয়ে বলেছিলেন, 'চল তোমায় আসল মানুষ তিনটিকে দেখাই।'

ঠাকুমার কাছে বসেছিল সতী, অরুণ আর অনীতা। 'এস আমার লক্ষ্মী মা এস,' আদর করে কাছে টেনে নেন মাঐমা। 'এদের নিয়ে থাকতে পারবে

তো মা !'

সংসারী লোক তো তিনিও ছিলেন। অমলাকে কেন আনা, কি জন্যে আনা সে তো তিনিও জানতেন। তবু আশ্চর্য বুদ্ধি রাখতেন। সংসারে কাজ আদায় করতেন সবচেয়ে বেশী, কিন্তু ব্যবহারে কোন খাদ ছিল না। মিষ্টি আন্তরিক ব্যবহার দিয়ে বশ করে রেখেছিলেন সকলকে। অমলার সন্দেহ হয় পুত্রবধূকে বোধহয় আসলে পছন্দ করতে পারেন নি।

'মা থেকেও মাতৃহীন এরা ! তাই তো মাসীকে ধরে আনলাম।'

আশ্চর্য, মাঐমা কেমন করে বুঝেছিলেন। ভাবপ্রবণতায় ছলছলে অমলার মন, স্নেহমমতার কাঙাল ?

কত কৃতজ্ঞ হয়েছিলেন অমলা। সবার ছোট অনীতাকে কোলে তুলে নিলেন। 'এর নাম সতী', জামাইবাবু দশবছরের মেয়েকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। 'আর এ অরুণ। আমরা বলি ভোলানাথ।' অরুণ তাড়াতাড়ি বলেছিল 'আমার বয়স ছয়।'

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? জগন্নাথ ?'

চমকে চাইলেন অমলা। চিন্তার বুকে তরতর করে ভেসে যাচ্ছিলেন। মনেই ছিল না এ ট্রেনের কামরা, অন্য যাত্রী আছে। বৃদ্ধা সাগ্রহে চেয়ে আছেন।

'হ্যাঁ।' অমলা শুকনো জবাব দিলেন।

'খুব সাফসুতরো দেখতে পাচ্ছি। মেয়ের বুঝি কোন ইস্কুলে কাজকরা হয় !'

অমলা রীতিমত অবাক হলেন। ধপধপে জামাকাপড় পরা এমনিতেই অভ্যেস। পথেঘাটে তো আরো পরিস্কার পরে বেরোন।

'মেয়ে বললাম বলে রাগ করলে ? তুমি বাছা আমার কাছে মেয়েরই বয়সী।'

অমলা আরো আশ্চর্য। একটু হেসে বললেন, 'না, রাগ করব কেন ?'

'মুখখানি শুকনো দেখছি, সেই থেকেই তো কি ভাবছ বসে বসে। যাচ্ছ কোথায় ?'

এ প্রশ্নের জবাব একবার দেওয়া হয়েছে বলেই অমলার বিশ্বাস। বৃদ্ধা বললেন, 'জগন্নাথে তো যাচ্ছ, তবে কার কাছে যাচ্ছ ? নিজেদের অথবা আত্মীয়ের বাড়ী আছে কি ? হোটেলে বা আশ্রয়ে যাচ্ছ কি ?'

তারপর বাতাসের ঝাপটায় কথা শোনা যাচ্ছে না মনে করে চেঁচিয়ে বললেন, 'বলি, ওঠা হবে কোথায় ? বাস করবার জন্যে যাওয়া হচ্ছে, না তীর্থে ?'

'পারুল বোসের বোর্ডিং-হাউসে।'

সংক্ষেপে বলে মুখ ফিরিয়ে নিলেন অমলা, বৃদ্ধা একটু নিরুৎসাহ হলেন। আস্তে বললেন, 'তবে আর বাছা, মিছেই বকবকম।'

'কেন বলুন তো ?'

'না, এই বলছিলুম জায়গা স্থির না থাকলে বলতুম আমাদের আশ্রমে আসতে।'

'ওখানে আপনাদের আশ্রম আছে বুঝি ?'

বৃদ্ধা কৌটা থেকে সুপুরি আর ছোট কটকী জাঁতি বের করেন। সযত্নে সুপুরি কুচোতে কুচোতে বলেন, 'আর মা, আশ্রম বলতে আমরা দুজন। তবে যদি কেউ থাকতে-টাকতে চায়, থাকতে দিই বই কি! পাঁচজনের সাহায্য না পেলে আশ্রম চলবে কেন বল ?'

অমলার মনে হয় এখন হয়তো তাঁর জানতে চাওয়া দরকার। তাঁর সামনেও সবই অব্যবস্থিত, অগোছালো। বাকি জীবনটা কি নিয়ে কাটাবেন, কি করবেন. জানা দরকার। এমন অবস্থাতেই লোকে আশ্রম-টাশ্রমের খোঁজ নেয়।

'কি আশ্রম আপনাদের ?' অমলা ধীরে বিনীত ভাবে শুধাল।

'আর কিসের, আমার মত তোমার মত কপাল পোড়া যারা ..'

ট্রেনের শব্দের সঙ্গে বৃদ্ধার গলার স্বর উঠতে নামতে লাগল। কিন্তু 'কপাল পোড়া' শব্দটি শুনে আবার মনে পড়ল দিদির সুন্দর মুখ, নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি। সেই কূলে থাকা আলগা হাসি এখনো দেখতে পান অমলা। মাঝে মাঝেই তাঁর কানের পাশে, মুখের কাছে টের পান বাতাসে কাঁপছে। অদৃশ্য উল্লাসের নীরব হাসি ফেটে ফেটে পড়ছে।

জামাইবাবু বলেছিলেন, 'ছি অসীমা, ওকে অমন কর কেন ?'

জামাইবাবুর গলায় আদর ছিল। খুব আদর জানিয়ে কথা কইতে পারতেন। অথচ. অমলা জানেন সেটাই সব নয়। কেন না, জামাইবাবুর চোখে দেখতে পেতেন তিনি অপরিসীম ক্লান্তি, ধৈর্যের অবসান, যা স্বাভাবিক। স্ত্রীকে পেয়েছিলেন মাত্র বারোবছর। ছ'বছর সুস্থ, স্বাভাবিক, তবু সন্তান বহনে ব্যস্ত। বাকি ছ'বছর শয্যাশায়ী, রুগ্ন, কত আর ধৈর্য থাকে।

সব বুঝতে পারতেন দিদি। রোগ মানুষকে ধূর্ত করে, সাবধানী করে। দিদি বলতেন, 'যেদিন তোমার ধৈর্য ফুরিয়ে যাবে, সেদিন আমায় বিষ দিও।'

আরো অনেক কথা বলতেন। জামাইবাবুর সস্নেহ তিরস্কারের জবাবে বলেছিলেন, 'এ সংসারে সাহায্য করবার জন্যেই অমলাকে আনা। ওকে সেটি ভুলতে দিয়ে কি হবে ?'

আজ রাতের অন্ধকার কেটে সমুদ্রের দিকে যেতে যেতে সব মনে পড়ল অমলার, চমকে উঠলেন। অপরিচিত এক বৃদ্ধার কথায় যেন চোখের সামনে দেখতে পেলেন তাঁর সত্যিকারের অবস্থাটা কি! তাঁর-ও গতি হওয়া উচিত হতভাগা, সবার খেদানো বুড়ী হাবড়ী বিধবাদের আশ্রমে। নিজের দুঃখে নিজে কাঁদা নাকি ভাল নয়। ওর চেয়ে দুর্ভাগ্য না কি মানুষের হয় না, হতে পারে না।

অথচ এখন তেমনি কান্নাই পাচ্ছে। কে দেখবে তাঁকে ? না না, অমলা

কাঁদবেন না।

'বলনে, আপনার আশ্রমের কথা বলনে!'

বৃদ্ধা একটু হাসলেন। বললেন, 'সে বড় আশ্চর্য কথা। আমাদের আশ্রম মা, কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়।'

'তবে!'

'আমি আর আমার এক বন্ধু করেছিলাম, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেব বলে, আর তীর্থস্থানে যে-সব বিধবা টিধবা মরে যায় তাদের গতি গঙ্গা করে দিই।'

বৃদ্ধা শিশুর মত নির্মল হাসেন। তীর্থপথের বাতাসে তাঁর ফুরফুরে চুল ওড়ে। গোপন এক মূল্যবান খবর বলবার ভঙ্গীতে বলেন, 'চোখ দুটি কান্না-মাখা কেন! কাঁদতে নেই। কতজনকেই দেখলুম। যে মাটিতে আছড়ে পড়ে, সেই মাটিই ধরে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। নইলে কি আর দুনিয়া থাকত!'

অমলা কি বলবেন? নিজেকে মনে হচ্ছে পথের ওপর উড়ে বেড়ানো ছেঁড়া কাগজ। তাঁর চেয়ে অবাঞ্ছনীয় আর কে আছে?

'দেখ, আমার কোনদিন সংসারে মন ছিল না। স্বামী আমায় নিয়ে পারতেন না। আমিও বাঁধা পড়ে থাকতুম কর্তব্যের দায়ে ঠেকে, নইলে মনে এতটুকু আঠা ছিল না সংসারের ওপর। খালি ঠাকুরকে ডাকতুম, বলতুম হে ঠাকুর, যে কর্তব্যে বসিয়ে দিয়েছ তা ফেলে দিতে পারি না। কিন্তু তুমি দয়াময় আমায় মুক্তির উপায় করে দাও।'

অমলার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। নিদন্ত মুখের ফোকর দেখা গেল। সে হাসিতে কঙ্কাবতীর গল্পের রহস্য মাখানো ছিল। ধীরে বললেন, 'ডাকবার মত করে ডাকলে ভগবানই পথ দেখিয়ে দেয়, বিশ্বাস কর!'

অমলা কিছু বললেন না।

তাই একদিন স্বামীই এসে বললেন তাঁর এক চেনা ভদ্রলোক মারা গেছেন, অনাথা আর মেয়েটিকে দু'দিন আশ্রয় দিতে হবে। মেয়ে দেখে চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। আমি স্বামীর পা ধরে বললুম দু'দিন কেন, চিরদিন ওকে আশ্রয় দাও, তোমার কষ্ট শেষ হোক, আমিও মুক্তি পাই।

'তারপর?'

'স্বামী আমায় মান্য করতেন। আমার কথা মেনে নিলেন। তবে বললেন, সংসার একেবারে ছেড়ে যাবে? তাতে যে আমার নিন্দে হবে। তার চেয়ে সবার বড় হয়ে এখানেই থাক না কেন! পুজো-আচ্চা করবে যেমন খুশী!'

'আপনি কি বললেন?'

'আমি বললুম না, তোমার কোন নিন্দে হবে না। আমি তোমায় সব নিন্দের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে যাব। তারপর বোন, লোকজন সাক্ষী রেখে উল্টো পাকে ঘুরে সাতপাক খুলিয়ে দিলুম।'

'মা গো! তারপর?'

'তারপর গেরুয়া পরে সেই যে বেরিয়ে এসেছি, আর ফিরে যাই নি। বন্ধু

ছিল একলা পড়ে, কাশীতে। তাকে বললুম আর, দুটিতে পরের কাজ কাঁর।'

'তা, এমন কাজ বেছে নিলেন কেন?'

'কেন, অসহায়কে গতিগঙ্গা করানো সে তো পুণ্য কাজ গো!' বৃদ্ধা আবার হাসলেন।

'আপনার স্বামীর সঙ্গে আর দেখা হয় নি?

'তিনি কোন কর্তব্যে ত্রুটি করেন নি। বিয়ে হতে. ছেলেপুলে হতে আমায় খবর দিয়েছেন। আমাদের আশ্রমে তিনি টাকা দিয়েছেন, এখনো ছেলেরা মাঝে-মধ্যে দেয়।'

'আপনি নেন?'

'তা কেন নেব না বল? তাঁর ওপর আমার রাগ কিসের! আছে, তাই দিয়েছেন আশ্রমে। পাঁচজনে দেয়, কেউ কেউ গিয়ে ওঠে, এমনি করেই তো চালিয়ে এলুম এতদিন!'

বৃদ্ধা ফুরফুরে চুলগুলি বিলি কেটে বেঁধে ফেললেন। তারপর বললেন, 'তোমার মুখখানি অমন কালিমাড়া কেন?' নিজের দুঃখকে অত বড় করে দেখতে আছে? তা হলে পারবে কেন?'

বৃদ্ধা আস্তে শুয়ে পড়লেন। মলিন ও শীর্ণ চেহারা। চোখে কৌতুকের হাসি, 'যাঁর কাছে যাচ্ছ, তাঁর কাছেই ভাবনা চিন্তার ভার ছেড়ে দাও না!'

তিনি চোখ বুজলেন। যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। অমলা জানালার দিকে চোখ ফেরালেন। সব কিছু ঠাকুরের উপর ছেড়ে দেবেন এমন ভক্তির জোরও নেই, এখনো মনের অবস্থা সে রকম নয়। যেন আচ্ছন্নতার ঘোর সবে কাটছে, এখনো অমলা জানেন না কি ক্ষতি হয়ে গেছে। শুধু শূন্যতার বোধ বুকের কোথায় হু হু করে উঠছে।

এখনো বুঝতে পারছেন না যেন, সতী অরুণ আর অনীতার কাছে কত তাড়াতাড়ি তিনি বোঝা হয়ে উঠেছিলেন। জামাইবাবু মারা যেতে না যেতেই কি ভাবে ভাগবাটোয়ারা সুরু হয়ে গেল। এই সেদিন অবধি পঙ্গু, অথর্ব বাপকে অমলার ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল ওরা। সতী আর শৈবাল শুধু মাঝে মাঝে খবর নিয়েছে। অনীতারা তা অবধি নেয় নি। অরুণ আর লতু নিশ্চিন্ত মনে বেড়িয়েছে।

অথচ লতুই কথাটা তুলেছিল। হলেই বা পরের মেয়ে। দয়ামায়া ওর তবু কিছু আছে। অরুণ আর অনীতাকে সামনে রেখে জিগ্যেস করে, 'বাবা, মাসীমার একটা ব্যবস্থা করেছেন তো!'

লতু চিরদিন ছিল পাশের বাড়ীর মেয়ে, তারপর হয়েছে বউ। ও পষ্টাপষ্টি কথা বলতে লজ্জা পায় না।

'মাসীমার কি ব্যবস্থা?' জামাইবাবু যেন কথাটা বোঝেন নি। তারপর আস্তে আস্তে বলেছেন, 'অমলার জন্যে এ সংসারে আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে!'

অরুণ আর অনীতা যেন লজ্জায় মাথা তুলতে পারে নি। লতু কিন্তু বলতে

ছাড়ে নি, 'বা, আমরা যে চিরদিনই ওঁকে দেখতে পারব তার কি মানে আছে? ওঁর নিজের মত কিছু ব্যবস্থা করে রাখা উচিত।'

এ কথায় তখন খুব অশান্তি হয়। কিন্তু জামাইবাবু চোখ বুজতেই সেই সব প্রশ্নই তো উঠলো। শেষকালে স্থির হল যদি ভাল লাগে, অমলা কাশীতে থাকবেন, সবাই মিলে তাঁর খরচপত্তর দেবে।

অমলা আশ্চর্য হয়ে ওদের কথা শুনছিলেন। শেষে বললেন, 'আমি কিন্তু কিছুদিন পুরীতে যাব।'

'পুরী! কেন, পুরী কেন!' সতী যেন অবাক হয়।

'এমনি বেড়াতে! ভেতর থেকে তিক্ততা উঠে আসে। পয়সা, পয়সার হিসেব করছে ওরা। তাই বুঝেই যেন অরুণকে তিনি বললেন, 'তোমাদের কিছু দিতে হবে না। হাতখরচের টাকা দিতেন জামাইবাবু, জমিয়ে রেখেছি আমি।'

অরুণ কি লজ্জাই পেল। এতদিনে মাসী যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চাইল তা-ও নিজের পয়সায়? 'না না সে কি কথা মাসী, তুমি যাবে ।'

'জামাইবাবু গেলেন, এখন তোমাদের খরচপত্তরের সময়!'

গলার স্বরে জ্বালা আনেন নি অমলা। ধীরে বলেছিলেন, নিরুত্তাপ গলায়। যারা তাঁকে আপন ভাবে না তাদের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারবেন না কিছুতে।

লতু হেসে বলল, 'তোমার শখটাও এ সংসারে ন্যায্য খরচার মধ্যেই।'

সতী, শুধু সতী উলটো পালটা কথা কইলে। 'মাসী যখন দিতে চাচ্ছে দিক না! ওরই বা আর কে আছে! হাতে ভালমত টাকা জমাবার কথা। এখানে তো ওর নিজের কোন খরচ নেই!'

লতু অবিশ্যি ঝর ঝর করে হেসে হেসে বলে, 'বড়দি বেশ বল। ভালমত জমাবার কথা! কত জমবে বাপু? কতই বা দিয়েছ ওঁকে? রাতদিনের নার্স, বাড়ীর গভর্নেস, সংসারের হাউসকীপার, বল না মাসীমা, আর কি কি পোস্টে কাজ করেছ? যেমন কাজ করেছ তেমন পেয়েছ কি?'

'লতু, বাজে বক বক কোর না। মাসীমার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক...'

'অতি গভীর।' বলে মুচকে হেসে লতু অন্য কাজে যায়। কিন্তু সতী যেন সেই থেকে গনগন করে বেড়াতে লাগল। অমলাকে সব বিষয়ে কষ্ট ঐ দিয়েছে, সে কথা যেন মনেই রইল না ওর। এমন কি, চলে আসবার আগে রাগের মাথায় এমন কথাও বললে, 'বাবা মারা গেছেন, গুরুজন সম্পর্কে বলতে নেই, কিন্তু ওঁকে নিয়ে এ সংসারে বসিয়ে তিনি বুদ্ধিমানের কাজ করেন নি। মা মনে মনে কষ্ট পেয়েছিলেন।'

এই কথাটি অমলার সবচেয়ে মনে লাগে। তখনি মনে হয় পারুলের কথা। কেউ না, নিঃসম্পর্কের লোক। তবু নিঃসম্পর্কের লোকই ভাল। কি ভাগ্যি যে পুরীর বাড়ীটা জামাইবাবু ওকে ভাড়া দেন। সে জন্যেই তো ঐ সুবিধে-

টুকু আছে। একখানি ঘর আলাদা বন্ধ থাকে। এ বাড়ীর যে যখন যান, তিনি ব্যবহার করেন। অমলা শুনেছেন একটি ঘর, ঢাকা বারান্দা, রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যায়, অসুবিধে নেই কিছু। সমুদ্র কেমন কিছুই জানেন না অমলা। কোথা থেকে আর জানবেন। বাড়ীর ভেতরটুকু ছিল, তাঁর জগৎ। এখন পারুলের ভরসায় এতদূর আসতে পারলেন। কি তেজ পারুলের, মামলা জিতে ফিরে পাওয়া স্বামীর সম্পত্তি নিয়ে কারো ভরসায় রইল না। এখানে এসে বোর্ডিং খুললে।

অমলা মাসী নিঃশ্বাস ফেললেন। পারুলের মত তেজ তিনি পাবেন কোথা থেকে। লেখাপড়া শেখেন নি, তেজ করতে জানবার মত নয়, যৎসামান্য। আর যেতেনই বা কোথায়?

বুকের ভেতর রুমাল বাঁধা পুলিন্দা আঙুল ছুঁইয়ে দেখলেন। সারাজীবন ধরে জমানো একশো পঁচাত্তর টাকা নিয়ে একলা একলা থাকতে যাচ্ছেন।

'তাড়াতাড়ি ফিরে এস মাসীমা', অরুণ হাসতে চেষ্টা করেছিল। ওরই কষ্ট হবে একটু হয়ত! এতদিন তো মাসীমা ছাড়া চলে নি। সেদিন না হয় বউ এসেছে। লতুকে বিয়ে করবে সে কথাটিও বাবাকে দিদিকে বলতে সাহসে কুলোয় নি। অমলাকেই বলতে হল।

সতী স্বভাব অনুযায়ী অদ্ভুতপানা করলে। জানে, সব জানে, তবু এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই জানে না। লতুর সঙ্গে অরুণের বিয়ে! আকাশ থেকে পড়ল যেন ঠাস করে। অনীতা অবিশ্যি কটকট করে বলে গেল, 'দিদির সব তাতে বাড়াবাড়ি। নিজেকে চোখ ঠেরে কি আনন্দ পায় কে জানে।'

সেই যে আড়আড় ভাব, তা আজও ছাড়ে নি সতী। অথচ অরুণের বিয়ে হয়েছে আট বছর আগে। ওদের ছেলেমেয়েই বড় হয়ে গেল, এখনো সতী সহজ হতে পারল না।

অমলা নিঃশ্বাস ফেললেন। এখন তিনি তীর্থে যাচ্ছেন। তীর্থে গেলে মনের জ্বালা জুড়োয়। ভগবান যাকে টানেন সেই যেতে পারে। যাবার একটা ভাগ্য থাকা চাই। এই তো জামাইবাবুর মা। মাঐমার কোন অভাবই তো ছিল না। সঙ্গী পেয়েছিলেন, রামেশ্বর যাবেন, জামাইবাবু ফার্স্টক্লাসের টিকিট কেটে দিলেন। ও মা, যাত্রার দিনই সুরু হল গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা। শেষে তেল জল মালিশ, ডাক্তার এসে ইন্‌জেক্‌শান দেয়, হই-হই কাণ্ড।

এখন অমলার তীর্থভাগ্য হয়েছে। দোরের কাছে তারকেশ্বর, তাই দেখা হয় নি, তিনি চলছেন জগন্নাথ-ধাম।

অনেক দুঃখের মধ্যেও আনন্দের ভাব বইতে লাগল। রাতের পথ, এ বড় দুঃখের কথা যে জানলা দিয়ে চেয়ে কিছু দেখা যায় না। জানলার কাচে চোখ রেখে বসে রইলেন। হাজার হলেও প্রথম পথে বেরোন। দেখতে ইচ্ছে যায় বই কি।

মাঐমা বলতেন তীর্থে যেতে গেলে কষ্ট করতে হয়। যাত্রী কষ্ট করলে

তবে নাকি তীর্থে যাবার ফল পায়। সেকালের লোকেরা সব জানতেন, তাই নাকি দেবতাদের মন্দির গড়ে রেখেছিলেন দূরে, দুর্গমে, যেন দেবতারাই তাঁদের কাজ ওঁদের হাত দিয়ে করিয়ে নিয়েছিলেন। দর্শনে আসতে হলে কষ্ট করতে পারা চাই, এইটি যেন ছিল তাঁদের মনের ইচ্ছে।

আরো কত কথা বলতেন মাঐমা। সংসারের কাজ সেরে তাঁর ঘরে যেতেন অমলা, হাতে থাকত গরম জলের ফ্লাস্ক, সরষে তেলের বাটি। ঠাণ্ডা জল খেতে পারতেন না একেবারে। তাই বারান্দায় কোণে ধরানো থাকত উনোন। রামধারী ঠাকুর চিমটে ধরে উনোন বসিয়ে দিয়ে যেত। দিনেরাতে ঝিনঝিনে গুঁড়ো কয়লার আঁচ জ্বলত। মাঐমার কাজের দিন সেই উনোন সরানো হল বারান্দা থেকে। অমলা অবাক হয়ে দেখলেন মেঝেতে যেন গোল সাদা দাগ হয়ে আছে, সাদা। অথচ উনোন বসানো থাকত চৌকো পাথরের টালির উপর।

তখন রাতে বসে বসে মাঐমার পায়ে তেলহাত বুলোতেন, মাঐমা গুণগুণ করে কত কথা বলতেন।

ঐ অরুণ তখন কলেজে পড়ে, রাতদিন তাঁকে কি উপদেশই দিত। কলেজে ঢুকে খুব মতামতের জাহাজ হয়েছিল কি না, সবসময় খুঁটিয়ে দেখত কে কার ওপর অত্যাচার করছে, কে কাকে মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছে, এইসব। অমলাকে একলা পেলেই বোঝাত ঠাকুমা তোমার ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছেন, তোমার বুদ্ধি নেই তাই কাজের ঘণ্টার হিসেব রাখ না, আমি যেদিন বাড়ীর কর্তা হব সেদিন দেখিয়ে দেব ন্যায্য ব্যবহার করা কাকে বলে, এইসব।

কিন্তু কোনদিন মনে করেন নি অমলা, মাঐমা তাঁর পর। রাতে, উঁচু বালিশে হেলান দিয়ে মাঐমা কত কথা বলতেন গুণগুণ করে। দেশবিদেশের গল্প শোনাতেন, তাঁর মা না কি সেই কোনকালে আটবার কেদারবদ্রী দর্শনে গেছলেন। সে শুধু কষ্ট করে যাওয়া আর পথ কষ্টের গল্প। শুধু না কি হাঁটতে হত, সেথোদের পালা করা থাকত কে কোন চটিতে কোন বেলা রান্না করবে, কিন্তু দুষ্টু সেথোরা সন্ধেবেলা চটিতে পৌঁছেই বলত 'উ হুঁ হুঁ হুঁ, আমার যেন শরীরটা, বুঝলেন দিদি, বড্ড খারাপ কচ্ছে। আমি রাঁধতেও চাই না, খেতেও চাই না।'

তখত মাঐমা'র মা-কেই সব রান্না চড়াতে হত। আবার সকাল হলেই কাপড়ের জুতো পরে লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে হাঁটতে হত। বুড়োমানুষরা চোখে পরতেন রঙীন পরকলা, নইলে সাদা চোখে চাইলে বরফের ওপর ঝলসানো রোদের জ্যোতিতে চোখ যেত ধাঁধিয়ে।

'সে ছিল সার্থক দিন। তীর্থে যাবার কষ্ট ছিল যত, পুণ্যি হত তত। এখনকার মত নয়। এই তো বউমা-র সঙ্গে ওরা হরিদ্বারে গেছল, চাকর রে, বামুন রে, সে হই রই কাণ্ড।'

বিনাবিন গুণগুণ করে কথা কইতেন মাঐমা। শুনতে শুনতে অমলা যত মনে করতেন আশ্চর্য দেশের কথা, যে দেশে কেদার দর্শনে যেতে হয়, যে দেশে হিমবাতাস লেগে নিমেষে পাতায় পাতায় শিশিরের ফোঁটা জমে যায়, যেন মুক্তো-ফল, আবার রোদ লাগলে টুপ করে গলে টপ করে ঝরে পড়ে, ততই মনে পড়ত অসীমার ঠাটবাট করে হরিদ্বারে যাওয়ার ছবি। মাঐমা যেন তার মনের কথা বুঝেই বলতেন, 'এমন আর ভাগ্যি দেখি নি কারো, কিছুই দিল না সংসারকে, দু'হাত পেতে শুধু নিয়ে গেল।'

বলতেন, 'ও কি তীর্থে যাওয়া? ও তো বেড়ানো।'

অথচ এখন তো তীর্থে যাবার পথ কত সুগম হয়ে গেছে। এতটুকু কষ্ট করতে হয় না, ট্রেন, বাস, মোটর, কোন কিছুর অভাব নেই পথে। কষ্ট না না করলে যদি পুণ্য না হয় তাহলে অমলার কি পুণ্য হবে না? মাঐমার কাছে রাজীবের মা আসতেন, পাকাচুল গিন্নী, পুণ্য করবেন বলে সাক্ষীগোপাল থেকে হেঁটে গেছলেন। বালি ফুটে তার পা না কি 'তামাক কাটা' হয়ে গিয়েছিল। তবু কিছু টের পান নি। 'মহাপ্রভুর কথা মনে করে চলে গেলাম, যেন জলের ওপর দিয়ে যাচ্ছি এমনি মনে হল। চারিদিকে রুদ্দুর, শুধু আমাদের যাবার পথটিতে ছায়া, সবই জগন্নাথের দয়া।' বলেই চোখ ঘুরিয়ে কটকট করে এদিক থেকে ওদিক চাইতেন, দেখতেন কেউ অবিশ্বাস করছে কি না।

পথে যাবার কষ্ট না হোক, অমলার এখন অন্যরকম কষ্ট হচ্ছে। সংসার শুধু তাঁকে নিংড়ে নিল, দিল না কিছুই, এই যে রাগ করে চলে এলেন তাতে কিছু বলবে না ওরা, এমন কি রিষ করে সতী বাড়ীর সবকটা ছেলেমেয়েকে পাঠিয়ে দিলে বেড়াতে, আসবার সময় দেখা হল না এ কি কম কষ্ট? কাজের বেলায় কাজ আদায় করে নিয়ে শেষে এক কথায় বলে দিলে আর দরকার হবে না তোমাকে, এবার তোমার ছুটি। সংসারে কেউ তাকে চাইল না এ কি কম কষ্ট?

অমলা কোলের ওপর হাত জোড় করে বসে রইলেন।

॥ ২ ॥

আগে ভেবেছিলেন পারুলকে দেখলেই কান্না পাবে, সামলাবেন কি করে, কিন্তু স্টেশন কাছে আসবার আগে থেকেই ভয়ানক চিন্তা হতে লাগল। বিছানা গুটিয়ে বেঁধে ফেললেন, ট্রাঙ্কের তালা টেনে দেখলেন, জলের ঘটি, হাতপাখা, সব দেখে নিলেন, কুলীরা নামাতে পারবে কি না ঠিক মত, চিন্তা হল। তখন অরুণ ইচ্ছে করে ভেতর দিকের সীটে বসিয়ে দেয়। বলেছিল লম্বা গাড়ীর ভেতরে থাকাই নাকি ভাল। তাহলে মাঝরাতের কামরায় যে-সব মতলবওয়ালা লোক ঢুকে পড়ে তারা দুই কিনারার লোকদের জিনিসপত্তরই চুরি করে বেশী, দরজার সুমুখ না হলে সুটসুট করে আর নেমে পালায় কি করে।

আর শুধু কি মতলবওয়ালা গুণ্ডালাকেদের ভয়? সতী কটকট করে কম কথা বলে নি। ফোলা টেবো গাল আরো ফুলিয়ে গলা ভারী করে বলেছিল,

এ মাঈ, জায়গা দে বলে নাকি নেড়ী বুড়ী, কানা নেংলি ভিখিরীরা সব এসে মেঝের ওপর বসে, টিকিট দেখতে এলেই বেঞ্চের নিচে ঢুকে যায় এমন তাদের বুদ্ধি। তারা কিছুতেই ট্রেনের ভেতর চোখ বুজবে না, ঘুমোবে না, আর সবাই যখন ঘুমোবে তখন তারা নোংরা আঙুল দিয়ে নিঃশব্দে টেনে টেনে আনবে যাত্রীদের পায়ের জুতো, জলের ঘটি, ফলের ঝুড়ি আর যা পায়। তা ছাড়া হয়ত অনেকরাতে টিকিট চেকার সেজে এমন ধূর্তলোক এল, যে মোটেই টিকিট চেকার নয়। যাত্রীদের মধ্যে হয়ত কেউ এমন দুষ্টু রইল, যে জলখাবে ভাই? পানখাবে ভাই? বলে আত্মিশুয়ো দেখিয়ে ওষুধ দেওয়া জল পান খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়ে সব কেড়েকুড়ে নেয়।

এখন নামবার আগে চিন্তা হল কত। বারবার দেখলেন পায়ে চটি আছে কি না, বালিশঢাকা তোয়ালে নিয়েছেন কি? লতুর করে দেওয়া ভাজা মশলার কৌটা আছে না কি থলিতে। তাঁর ব্যস্ততা দেখে আশ্রম-করা বুড়ী বললেন, 'এর পরে আর স্টেশন নেই। ট্রেন কোথাও চলে যাবে না।'

তাঁর কথা ইচ্ছে করেই শুনলেন না অমলা। নিশ্চয় তাঁর ব্যস্তবাগীশপনা দেখে অন্যদের বেজায় হাসি পাচ্ছে, কিন্তু হাসি পেলে কি হবে, অমলার এখন উদ্বেগ কত। ট্রেন থামলে পরেও নাকি ইঞ্জিন জল নিতে যায়, আরো কত কি হতে পারে, এত মাঝের সীট থেকে কুলীরা মাল নিতে এলে হয়।

ট্রেন থামতে না থামতেই ব্যস্ত হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালেন। ভেবে-ছিলেন জানলা দিয়ে চাইতেই বুঝি দেখবেন সমুদ্র আর সমুদ্র, কিন্তু কোথায় সমুদ্র, চারদিকে শুধু স্টেশন। এখন সব অন্যরকম লাগছে, কিন্তু সাক্ষী-গোপাল থেকে যেই দেখেছিলেন চারিদিকে শুধু বালি আর বালি, বালির ওপর বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলানো, কত মানুষের পায়ের দাগ যেন, তখন থেকেই মনে হচ্ছিল পৌঁছে গেছেন অন্য জায়গায়। বালি আর ফণীমনসার গাছ দেখে মনে কত আরাম হচ্ছিল, এখন থেকে যেন এমনিই থাকবে সব, আর দেখতে হবে না মানুষের ঘরবসত, সব ঘিঞ্জি করে ফেলবার অভ্যেস। কিন্তু এখন যা চোখে পড়ল সব অন্যরকম। শহর যেন।

পারুলকে দেখে তাই কাঁদতে অবধি মনে রইল না। ঠোঁট এঁটে হাতে থলি নিয়ে আস্তে আস্তে নেমে এলেন। চটি আঁট আঁট ঠেকছে, নিচু হয়ে দেখলেন, অনভ্যেসে এমন হয়, পায়ের পাতা ফুলে ঢোল হয়েছে।

পারুল শক্তমুখে কার সঙ্গে যেন কাজের কথা কইছিলেন। অমলাকে দেখে তাঁর বগীথালার মত মস্ত ঢাউস মুখ হাসিতে ভরে গেল। প্রথমেই শুধোলেন, 'দোক্তা এনেছ? নেবুর আচার?'

'এনেছি', খুব আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগলেন অমলা। পারুলকে দেখে তাঁর আনন্দ হয়েছে, যদিও তাই বলেই এখনি গাবিয়ে গল্প করতে যাবেন না। হাজার হলেও এখন ওর সঙ্গেই কাটবে অনেক অনেক দিন, গল্প করা কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

'এই যে রানীপিসীমা, আপনিও আজ এলেন ?'

আশ্রমকরা বুড়ি বললেন, হ্যাঁ। ইনি তোমার এখানেই আসছেন ? কই, বলেন নি তো ?'

অমলা অবাক হয়ে বললেন 'বলেছিলাম।' পারুল তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার এখানে এসেছেন মানে কি, ও'দেরই তো বাড়ী। নিজের বাড়ীতেই এসেছেন।'

'অ।' বৃদ্ধা যেন একটু অসন্তুষ্ট হলেন। যেন অমলা সব কথা ভাঙেন নি আগে। 'আমাদের ওখানে একবারটি বেড়াতে নিয়ে এস।' খুটুর খুটুর করে এগিয়ে গেলেন জবাব না শুনেই। এখন অমলা দেখতে পেলেন ও'র পিঠ খুব কুঁজো, ধনুকের মত বাঁকা যেন, 'ভারী সিধে মানুষ', পারুল অন্যমনস্ক ভাবে বললেন।

ও'র বোর্ডিং হাউসের নিজের রিকশা। চেপে বসে মনে মনে কি যেন হিসেব করতে করতে বললেন, 'কালীবাবুর দোকানে ঘুরে যাব দাশুয়া, লাউ, ওষুধ আর তেলের টিন নামিয়ে রেখেছি।' উদ্বিগ্ন হয়ে চশমার ফাঁক দিয়ে অমলার দিকে তাকালেন, 'তোমার কষ্ট হবে না তো অমলাদি ? একটুখানি ঘুরে যাব। ট্রেনে কষ্ট করে এলে অবিশ্যি কষ্ট হয়।'

'না, ভিড় ছিল না।'

'এ-সময় ভিড় থাকে না মোটে, এত বর্ষায় আসে না বেশী যাত্রী, সে আমি একপক্ষে ভাল মনে করি। অবিশ্যি, ব্যবসার দিকে মন্দ।' পারুলের চোখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এমন হাসতে জানা চোখ অমলা কম দেখেছেন। ঐ চোখের মধ্যে দিয়ে যেন ভেতরের মানুষটি কথা কয়। নইলে ঐ অতবড় বেঢপ চেহারা, লিকলিকে চুল, মুখটা দিনদিন বড় হচ্ছে তো হচ্ছেই, কপালে ভাজের পর ভাজ, ও মুখ দেখত কে ? কি করে যে পারুলেরও বিয়ে হয়েছিল অমলা এক একসময়ে ভাবেন। নিজে সুন্দর না-ই বা হলেন, সুন্দর মানুষ দেখতে অমলা ভালবাসেন। মেয়েদের চেহারায় কিছু একটা থাকা চাই, রূপ, লাবণ্য, সুষমা।

'বর্ষাকালে যাত্রী না এলে তোমার বোর্ডিংয়ের অসুবিধে।' অমলা চিন্তিত হলেন।

'অসুবিধে বললেও পার, না বললেও পার, আসলে এখন আর আমরা যাত্রীদের ওপর মোটে ভরসা করি না।'

'তা হলে।'

'চারজন আছেন, তাঁরা বরাবরকার বাসাড়ে।'

'এখানেই কাজকর্ম করেন বুঝি ?'

'কি জানি।' পারুল পরম নিশ্চিন্তে হাত উলটোলেন, 'মাখনবাবুকে জন্মেও আপিস-টাপিস যেতে দেখি নি। কি কাজকর্ম করেন কে জানে। দুলাল রেলঅফিসে চাকরী করে, সাতকুলে কেউ নেই, বাপকে নিয়ে থাকে। মলিনার

হাঁপানির ধাত, সমুদ্রে জোলো বাতাসে ভাল থাকে, তাই মা'র সঙ্গে আছে।'

'বিয়ে হয়েছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। জামাই খরচাপাতি দেন। আমার সন্দেহ হয় বুড়ী চায় না মেয়েজামাইয়ে বেশ ভাব হোক। ও মেয়েকে নিয়ে থাকলে জামাই খরচা দেবেন সেই লোভে পড়ে আছে।'

'তুমি কিছু বল না কেন?'

'দূর! ওরা হল বোর্ডার, আমি কি ওদের কথায় কথা কইতে পারি?'

'আর একজন?'

'ওরা হল গে বর্ধমানের লোক। খুড়োভাইপো পাথরের বাসনের কারবার করে। মন্দিরের সামনে বেশ মস্ত দোকান। লোক ভালই। খুড়ো ভারী আচারী।'

'আর?'

'পি, ডবলিউ ডি. আফিস, রেলআফিস, সব জায়গা থেকে এগারোটি লোক আসে, তারা শুধু দু'বেলা খায়। এতেই আমার চলে যাচ্ছে, চালিয়ে নিচ্ছি। তাছাড়া মাঝেমাঝেই যাত্রীরা-ও আসে বইকি।'

পারুল আবার প্রসন্ন রোদের মত নির্মল হাসলেন।

'এইসব রকম রকম লোকের রকম রকম খাওয়া তো?'

'তা আর বলতে? দু'বেলা মাছ মাংস, নিরিমিষ ঘরে ছানার ডাল্‌না একটা না একটা দিতে ছাড়ি না, তবু কি কথা শোনায় না? ঐ মলিনার মা'র মন ওঠে না কিছুতে।'

অমলার দিকে একটু সদয়চোখে চাইলেন। বললেন, 'তুমি ভাবছ এ কোন ঝামেলার মধ্যে এসে পড়লে, তাই তো? তা, তোমার আর ভাবনা কি? এ-সব আমার সঙ্গের সাথী। তুমি তোমার মত থাকবে।'

পাথরের বাসনের দোকানের সামনে দাঁড়াল রিকশা। লাউ, ওষুধের শিশি, তেলের টিন তোলা হল। অমলা অবাক হয়ে চারদিকে দেখেন। একটু পরেই ডানদিকে গাছপালা ঘরদোরের ফাঁক দিয়ে নীল, ঝকঝকে সমুদ্র উঁকি দিতে থাকল। সেদিকে না চেয়েই পারুল বললেন, 'তোমার কপালে দেখছি রোদ উঠেছে আজ। এ ক'দিন সমুদ্রের চেহারা যা ঘোলাটে ছিল।'

অমলা দু'চোখ ভরে দেখছিলেন। পারুল আস্তে বললেন, 'এখন কত দেখবে, আমাদের চক্রতীর্থের দিকটা এখনো ফাঁকা আছে, আমাদের বাড়ীতেও রান্নাঘর থেকে দেখা যেত, পোস্টাপিসের লোকরা নতুন মেসবাড়ী তুলে নজর আটকে দিয়েছে।'

'সমুদ্র দেখা যায় না তা হলে?' অমলার কথায় নিরুৎসাহ হতাশা লক্ষ্য করে পারুল হাসলেন। বললেন, 'বরং বাড়ী সমুন্দুরের দিকে পেছন করে করা ভাল।'

কাপড়ের আঁচল সাইকেলের চাকার শিক থেকে যত্নে খুলে নিয়ে বললেন,

'সমুদ্রের বাতাসে নুন থাকে। বাড়ীর দরজা-জানলা তালাচাবি সব মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ী বালিচাপা পড়ে। অত্যধিক বালি আর নোনা-বাতাসে বাগান হতে চায় না। অনেক অসুবিধে। তোমার ঘরে দেখবে বাতাস খুব। সর্বদা সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়।

পারুলের মুখের কথা শেষ হতে না হতে বোর্ডিং-বাড়ী পৌঁছে গেল। চকমেলানো একতলা বাড়ী। দালানের কোলে সারি সারি ঘর। অমলা দেখতে পেলেন ঘরে ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত, তক্তাপোশ, আর টেবিল-চেয়ার। যে-সব ঘরে মানুষ আছে, সেখানে দরজায় পরদা ঝুলছে। সব ঘর পেরিয়ে লুকোচুরি খেলবার মত ছোট কোণায় এলেন অমলা। 'এই যে তোমার ঘর', পারুল আস্তে দরজা ঠেললেন।

দরজার কবাট ধরে চেয়ে রইলেন অমলা। সদ্য কলিফেরানো চুনের গন্ধ-মাখা ঘর। জানালার পর্দা ঝুলছে। তক্তাপোশ, ছোট টেবিল, চেয়ার, ছোট আলনা, বাক্স বসাবার বেঞ্চি। একদিকে জানালার ধাপিতে জলের কুঁজো গেলাস। ছোট একটা জাল আলমারীও আছে; যদিও তাতে কিছু নেই।

'কেমন লাগছে?'

জবাবের জন্যে অপেক্ষা করা পারুলের স্বভাবে নেই, তা এখন তাকে যত দেখতে লাগলেন তত মনে পড়তে লাগল। ঘরে ঢুকে পারুল দরজা জানলায় আঙুল দিয়ে দেখলেন কটকটে হলদে রং শুকিয়েছে কিনা! তারপর অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'এখনো ভিজে।' অমলার দিকে চেয়ে বললেন, 'ঐ তোমার স্নান-ঘর। জলটল আছে। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে নাও, আমি চা আনছি।'

চানের ঘরের জানলা, ঘরের জানলা, চতুর্দিক থেকে হাওয়া এসে দাস্যিপনা লাগিয়ে দিলে। পারুল বললেন 'এত তাড়াতাড়ি আর এর চে' ভাল বন্দোবস্ত হল না।'

'না পারুল, যথেষ্ট হয়েছে।'

'ঐ যা হল তা হল, অরুণ যে তাড়া দিয়ে তার করেছিল, বাবাঃ!'

'কে তার করেছিল?'

'অরুণ।' পারুল ঘাড় কাত করে দেখলেন দেওয়ালের ওপরদিকে, ছাতের সিলিং-এ ঠিকমত চুনকাম হয়েছে কিনা। বললেন, 'অতবড় তার করার চেয়ে চিঠি লিখলেও পারে। আসলে এরা কেউ মনে রাখে না চিঠি এখন একদিনেই আসে।'

'কি তার করেছিল?'

'এই, মাসী যাচ্ছে, তার যেন কোন কষ্ট না হয়, ঘর চুনকাম করিয়ে রেখ, লোক রেখে দিও, লেখা খুব সোজা। বর্ষাকালে টপ করে রাজমিস্ত্রী পাওয়া যায় না। লোক বলতে বা হুট করে বিশ্বাসী লোক পাই কোথায়। আবার লিখেছে সর্বদা মাসীর মন ব্যস্ত রেখ, এনগেজ্‌ড রেখ। কেমন করে রাখব ভগবান জানেন, আমি সতেরো কাজের মানুষ। কেন, এত কথা তারে জানাবার

মানে কি ? ঝগড়া করে এসেছ বুঝি ?'

এতক্ষণে অমলামাসীর কান্না পেল। হাতের ব্যাগে দোক্তার কৌটো, লেবুর আচারের শিশি ছিল, সযত্নে চৌকির উপর রাখলেন। তারপর চৌকিতে বসে দু'হাতে মুখ ঢাকলেন। ফুঁপিয়ে কেঁদে বললেন, 'ওরা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার কাছে একটু আশ্রয়ের আশায় এসেছি পারুল, আর আমার জায়গা নেই যাবার।'

বিকেলে চা-খাবার পর কোমরে হ্যান্ডলুমের তোয়ালে জড়িয়ে পারুল দাঁড়িয়ে আটা ঠাসছিলেন। অমলা নিচুস্বরে বলে যাচ্ছেন নিজের দুর্ভাগ্যের কথা, একটু যেন ধৈর্য হারালেন, পারুল কেন যথেষ্ট মন দিয়ে শুনছেন না ? তারপর মাথায় ঢুকল পারুল গুণে গুণে লেচি কাটছেন।

'তোমার রান্নার লোকটি এ বেলা গেল কোথায় ?'

'কোথায় আবার যাবে, সামনেই আছে। আমিই তো রান্না করছি এখন।'

এত এত লোকের রান্না তুমি একা ?'

'না, সুন্দরী বুড়ী আর পেল্লাদের পিসী যোগাড় যন্ত্র দেয়।' রুটি বেলতে বেলতে বললেন, 'এত এত জিনিস বেরুচ্ছে, হাতরুটি গড়বার একটা কিছু বেরুলে বেশ ভাল হত। অনেক শ্রম বাঁচত।'

'কিন্তু কেন, পারুল ?'

'কেন আর, একদিন দেখলুম রান্নার লোকের পায়ে গোদ, চিকিৎসা করতে পাঠিয়েছি, জেনেশুনে রুগ্ন লোককে দিয়ে কাজ করানো ঠিক নয়।'

চাটুর ওপর রুটি উলটোতে উলটোতে বললেন, 'আমার তেমন কষ্ট হয় না। বোর্ডাররা যদিও গজগজ করতে ছাড়ে না। আসলে লোকটা রান্না-বান্না শিখেছিল খুব ভাল। বোর্ডারদের তো ঐ ব্যাপার, বুঝে দেখবে না আমি নিজে করছি, খাওয়া উপকার কত।

চিরদিন সংসার করে এসেছেন, এখন সংসারের কথায় চট করে মন গেল। বললেন, 'এখন কি নতুন করে সব কুটবে কাটবে, পারুল ?'

পারুলের চোখ হাসতে লাগল, অমলাদি, তোমার একুশের বি-র ধারণা ছাড়। সংসার যেন একুশের বি-র ছাঁচে ঢালাই। আমাকে কি তুমি পেয়েছ ? এ বেলা তরকারীর ডালা সাজিয়ে নতুন করে উনোন পুজোয় বসব ? এই দেখ।'

অমলা দেখলেন ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়ামের বাসনের ঢাকনার নিচে ডাল সেদ্ধ, মাংস সেদ্ধ, সবজী ভাপানো, দেখতে দেখতে নিজের হাতে গুছনো রান্নাঘরের বিকেলবেলার চেহারা মনে পড়ল। পারুলের চোখমুখ আবার হাসতে লাগল, এবেলার রান্না শুধু ছ্যাকছোক, ভাজ, সাঁতলাও. ফোড়ন দাও।'

তারপর বললেন, 'তুমি কেন গরমে বসবে ? ঘরে যাও।'

অমলা অবাক হয়ে দেখছিলেন। এমন দাঁড়িয়ে রান্না করবার উনোন কোন-

দিন দেখেন নি। 'বেশ ব্যবস্থা, দাঁড়িয়ে সব সারলে কোমর ব্যথা হয় না।'

'হ্যাঁ।' ঘসঘস করে রুটি বেলতে বেলতে পারুল বললেন, শৈলবাবু নিজে করিয়ে দিয়ে যান। বললেন, আপনার কষ্ট হবে।'

'জামাইবাবু?' অমলা ভারী অবাক হয়েছেন।

'হ্যাঁ।' পারুলের মুখ ভাবলেশহীন হয়ে গেল, 'এখানে মাঝে মাঝেই আসতেন।'

অমলার মনে পড়ল না কবে জামাইবাবু একা একা পুরী এসেছিলেন। 'কবে এসেছিলেন পারুল?'

পারুল ক'খানা রুটি ভাজলেন। তাঁর কাজ নিখুঁত, চটপটে, যন্ত্রের মানুষের মত হাত পা নাড়া, বাড়তি, এলোমেলো, ছন্দহীন কিছু নেই। কলাইকরা পেতলের ডেক্‌চিতে রাখলেন। বললেন, 'ওঁর স্ত্রী কতদিন গেছেন?'

'উনত্রিশ বছর হতে চলল', কিছু কিছু হিসেব মনের নিচে গাঁথা থাকে।

'উনি বিছানায় পড়েছিলেন ক'দিন?'

'এক বছর হবে প্রায়।'

'এই বাইশ বছরের মধ্যে প্রায় প্রতিবছর এসেছেন। এমনি বর্ষার দিনে আসতে ভালবাসতেন।'

'ঐ ঘরে থাকতেন?' অমলার গলা কত ধীর। এখন এসব কথা জিগ্যেস করতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। জামাইবাবুর কথা সহজ করে বলতে পারেন না তিনি, বুকের মাঝে কোথায় কি যেন বেধে যায়, কিন্তু এদের সে কথা বলবার নয়, কারুকে বোঝাতে গেলেই যেন গোলমাল করে ফেলবেন সব।

'না।' পারুলের গলায় এতটুকু বিষণ্ণতা নেই। যেন কোন জীবিত লোক সম্পর্কে কথা বলছেন, অথবা যে কোন লোক সম্পর্কে। কিন্তু তাই কি বলা যায়? রোগশয্যায় পড়েছিলেন, চেহারায় অল্প বয়সের সে রাজার মত রূপ ছিল না। রাজার মত! এখন অমলা বোঝেন সতেরো বছরের চোখে জামাইবাবুকে সেদিন অনেক অনেক, দূরের মানুষ মনে হত, যেন অনেক বড়, কিন্তু সেদিন জামাইবাবুর বয়স ছিল মাত্রই বত্রিশ। রোগশয্যায় আরেক ধরনের সৌন্দর্য এসেছিল তাঁর মধ্যে। যারা দেখত তারা শুধু হুতাশ জানাত, তারা অন্ধ, বয়সের রূপ দেখতে জানে না, এখনো অমলার মনে সে রূপের আভা চিরকালের রঙে লেখা আছে, অথচ একটি মাস সবে হয়েছে। কাঁদতেই বা সময় পেলেন কই, সে রাতে অরুণদের সামনে কাগজ জেবলে, নিমপাতা নিমকাঠিটুকু দেবার নেম রক্ষেও তাঁকেই করতে হল, তা ছাড়া কাঁদলে বেমানান হত। বয়স্ক লোক মরলে কেউ কাঁদে না।

'না। শৈলবাবু এখানে থাকতেন না। প্রতিবার উঠতেন রেলের হোটেলে। শেষবার, শুধু শেষবার, উঠেছিলেন এখানে। তবে প্রতিবারই দেখতে আসতেন একবারটি।'

'দিদিকে নিয়ে এসেছিলেন আগে।' অমলার শোনা কথা।

'সেবারও এখানে ওঠেন নি। ঐ রেলের হোটেলে। ওঁর স্ত্রী এ বাড়ী পছন্দ করতেন না।'

'পছন্দ করতেন না।' অমলা পারুলের কথাই পুনরাবৃত্তি করলেন। তারপর বললেন, 'তুমি ভাজ, আমি বেলে দিই।

আস্তে বেলতে লাগলেন। পারুল সামনের দিকে চেয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ এক মনে ভেজে, তারপর, আগেকার কথার খেই ধরে বললেন, 'শেষবার এখানে ঘনঘন আসতেন। মেয়েদের সংসার করার কষ্ট কত, তা নিয়ে প্রায় কথা বলতেন। মিস্ত্রী লাগিয়েছিলাম সেবার, তোমার ওদিকের রান্নাঘরে উঁচু উনোন করালেন, জাল আলমারী দেওয়ালেন, তখনই আমাকেও করিয়ে দিলেন।'

রুটি রাখলেন। হাত ধুয়ে মুছে ডালের ডেকচি চড়ালেন। বললেন, 'কি জান, ছেলেমেয়েরা স্বার্থচেনা হয়েছে। ওদের মা'র মত।'

মা'র মত। অমলার বুকে ছোট ধাক্কা লাগল। পারুল কি জানেন ও বাড়ীতে অসীমার ঠাঁই কোথায়? এখনো উঁচু দেওয়ালে মাথার ওপর তাঁর ছবি, নিত্যি টাটকা ফুলের মালা দিতে হয়। দিদি সবাইকে দেখেন মুখে সেই তাচ্ছিল্যের হাসি মেখে। অসীমা স্বার্থচেনা! কিন্তু অমলা কি বলবেন, পারুলের সঙ্গে ওঁদের পরিচয় আরো পুরনো।

'স্ত্রী ও-রকম হলে অন্য যে কোন পুরুষমানুষ হয়েবয়ে যেত। উনি পারলেন না, কোথায় একটা পিছটান ছিল।'

'স্ত্রী ও-রকম! এ তুমি কি বলছ পারুল?'

'ঠিকই বলছি।' পারুল ধীরে, অতি ধীরে বলেন, 'আমার সঙ্গে ওঁদের অনেকদিনের আলাপ। শৈলবাবু জাত ভদ্রলোক তাই সহ্য করতেন। ওঁর স্ত্রীর দয়ামায়া মমতা কিছু ছিল না। লতু আমার বোনঝি, ওঁদের পাশের বাড়ীতে আমি অনেকদিন কাটিয়েছি। সতীর মা অসুস্থ হবার আগে শৈলবাবু, বাড়ীতে অবধি থাকতেন না।'

'কোথায় থাকতেন?'

'সাধারণতঃ ওঁর বোনের বাড়ী খড়দা। মাঝে মধ্যে আসতেন। সত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়লেন যখন, তখন বাড়ী এলেন শৈলবাবু। তারপরেই অবিশ্যি তুমি এলে।'

মাথা নাড়লেন পারুল। বললেন, 'সতীর মা'র মত মানুষ আমি কম দেখেছি। ভগবান বোধহয় একসঙ্গে সব দেয় না একটা মানুষকে।'

অমলা শুকনো গলায় বললেন, 'আমি ঘরে যাই পারুল, আমার শরীর খারাপ লাগছে।

ফুটন্ত ডালের দিকে চেয়ে পারুল বললেন, 'আমার যেমন বুদ্ধি। তোমাকে সব আজেবাজে কথা বলতে যাই। ভগবান জানেন ডালে নুন দিলুম কি না।'

এমন সময়ে সুন্দরী বুড়ী আর পেল্লাদের পিসী ঢুকল। পেল্লাদ বোধহয় নেহাৎ বালক, কেন না তার পিসীর বয়স বেশী নয়। 'এসে গেলাম দিদি,'

সে একগাল হাসলে।

'আমার মাথা কিনলে। উনোনে কয়লা দাও, তরকারীগুলো জালে তোল। উনোন ধরলে আমায় ডাকবি, তার আগে নয়।'

হাত মুছে বেরিয়ে এসে আঁচল অথবা জামার কোন্ থেকে বের করলেন একখানা কাগজ। বিড়বিড় করে পড়লেন 'দুলালের খাবার দুধ খই, মলিনার মা দুধ সুজি খাবেন। আর সব ভাতে রুটিতে খালি কালীবাবুর ঝোলে নুন পড়বে না।

শুনতে শুনতে অমলার মাথা ঘুরছিল। পারুলের গলার স্বর চিন্তিত কিন্তু দুই চোখ হাসিতে ফেটে পড়ছে। হাসতে জানা-ও না কি মস্ত গুণ।

'চল, রিকশাকে বলে দিই, সমুদ্রের ধারে যাই।'

'তোমার কাজ আছে।'

'কাজ ওরা সেরে নেবে।'

॥ ৩ ॥

বর্ষার আকাশে সূর্য অনেকক্ষণ সময় নিয়ে অস্ত গিয়েছিল। এখনো পশ্চিমে কোথায় যেন তার বিব্রত ভীরু আভা লেগে আছে। ঢেউগুলো তাই কি বড্ড কালো দেখায়? বেড়াবার মৌসুম নয়, তাই বেলাভূমি পরিত্যক্ত, উপুড় করা জেলে ডিঙি আর দূরে দূরে মানুষের নড়াচড়ায় চোখ কেড়ে নেওয়া ছবি। সামনে দিয়ে আঁকাবাঁকা লাঠি নিয়ে পিঠবাঁকা বুড়ী কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে এক মনে, ওরা কাঁকড়া খোঁজে, ঢেউ এসে চলে গেলে বালির ওপর সাদাটে লালচে ছোট ছোট কাঁকড়া মাকড়সার মত কিলবিল করতে থাকে। ওরা লাঠি দিয়ে টেনে টেনে সব পেট-কোঁচড়ে পুরে নেয়।

'সমুদ্রের ধারে এলে এত ভাল লাগে, আসা হয় না।'

পারুল ঘাড় ঘুরিয়ে দূরে, স্বর্গদ্বারের দিকে মানুষের নড়াচড়া দেখছিলেন। 'আস না কেন?' নতুন জায়গায় এখনো নতুন নতুন লাগছে। যেন বিশ্বাস হতে চায় না তিনি সত্যই এমন জায়গায় এসে বসে আছেন।

'কেমন যেন হয়ে ওঠে না। তা ছাড়া, সর্বদাই বলি এই তো কাছে সমুদ্র, এলেই হবে, সমুদ্র তো পালিয়ে যাচ্ছে না। অথচ এলেই মনে হয় কেন আসি না কেন দু'দণ্ড বসি না থির হয়ে।'

পারুল হঠাৎ হাসলেন। বললেন, 'এই করে সতীর শাশুড়ীরও সমুদ্র দেখা হল না। এলেন, থাকলেনও তিনদিন। কিন্তু এসেই টাউনে পেয়ে গিছলেন ছোটবেলার এক বন্ধু। দুই গিন্নী আসতে যেতেই ব্যস্ত রইলেন, যাবার দিনে রিকশা ঘুরিয়ে দেখে গেলেন এক ঝলক।'

অমলার আশ্চর্য লাগল। কি আর আছে এখানে, ঐ সমুদ্র ছাড়া। তা না দেখেও বেশ থাকতে পারেন পারুল, অস্বস্তি হয় না।

'শৈলবাবু অবশ্য কম কথা শোনান নি আমাকে। সেবারও কত কি বলে

গেলেন। নিজে তো খুব একলাটি থাকতে পারতেন। সংসারে শান্তি পেতেন না হয়ত।'

শান্তি পেতেন না! অমলা যেন দেখতে পেলেন জামাইবাবুর বসে থাকা চেহারা, সারাদিনের পর, নিজের বসবার ঘরে, ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে এক হাতে চোখ ঢেকে।

শান্তি পাবেন কি করে। মুহূর্তে শক্ত হয়ে গেল অমলার মন। ছেলে-মেয়েদের কাছে যেন হাজার দোষে-দোষী ছিলেন, তাই ঘুষ দেওয়ার শেষ ছিল না। স্ত্রীকে খোশামোদ করে চলতেন, ছেলেমেয়েকে একটি কথা বলতে পারতেন না জোর গলায়, এত জানতেন, অথচ এ কথা জানতেন না সংসারে ঘুষ দেবার শেষ নেই। যে ঘুষ দেয় তাকে যারা ঘুষ নেয়, তারা চিরতরে ফাঁদে ধরে ফেলে। একবার দিয়েছ যখন, তখন দিয়ে চলতে হবে।

কিন্তু কেন? কার কাছে কি অপরাধ করেছিলেন তিনি? এত বড় চাকরী করতেন, বোর্ড কোম্পানীর অন্যতম ডিরেকটার, সংসারের কোন্ প্রয়োজনটা অপূর্ণ ছিল যে রিটায়ার করবার পর আরেকটা কাজ নিতে হল? না, ঐ ছিল তাঁর মুক্তি, সংসারের হাত থেকে লুকিয়ে ছুটি নেওয়া? প্রথমবার সেরিব্রাল স্ট্রোক হলে কত সাবধানে থাকে মানুষ। এর নাম সন্ন্যাস রোগ, পরপর তিনবার হলে স্বয়ং শিব জীবন দিতে পারেন না। অথচ, প্রথমবার স্ট্রোক হবার পরও বিশ্রাম নিলেন না কিছুতে।

ছেলেমেয়েরা অবধি কিছু বলল না। যেন না বললে খারাপ দেখায় তাই অরুণ বললে 'এত তাড়াতাড়ি জয়েন না করলেও হত।'

এমন কথা বলল না, আর কাজ করবার দরকার নেই, এবার তুমি বিশ্রাম নাও। সংসারের মজা এই, নিজের অসুবিধার কথা নিজে চেঁচিয়ে না বললে কেউ শোনে না।

প্রথম স্ট্রোকের পর, শুধু প্রথম স্ট্রোকের পর, যখন বিশ্রামে ছিলেন তখন একদিন এমন একটি কথা বলেছিলেন, যার সঙ্গে তাঁর আগের বা পরের কোন আচরণ মেলে না। জামাইবাবু বসেছিলেন ইজিচেয়ারে, জানলার ওপর বসে অমলা কাগজ পড়ে শোনাচ্ছিলেন। খবরের কাগজ পড়া অনেকদিনের অভ্যাস, অথচ পড়লেও ক্লান্তি আসে, তাই ঐ ব্যবস্থাই করা হয়। অমলা পড়বেন, জামাইবাবু শুনবেন।

হঠাৎ অমলার মনে হয় জামাইবাবু তাঁর দিকে চেয়ে আছেন। চোখ তুলে তাকান। চেয়ে আছেন সত্যই। দুচোখের ভাষা কি করুণ, অমলার মর্মে গিয়ে বিঁধেছিল।

'অমল', জামাইবাবুর গলা গাঢ়, গম্ভীর, আকুল, 'একটা কথা বলি।' অমলা কাগজ নামিয়ে রাখেন।

'যদি কোনদিন', মাথা নাড়েন। যেন কথা গুছিয়ে বলতে পারছেন না, আস্তে, থেমে থেমে, 'যদি কোনদিন শোন আমি এমন কোন কাজ করেছি

যার ক্ষমা হয় না, তবে তুমি, শুধু তুমি অন্তত আমায় ক্ষমা কোর।'

'যার ক্ষমা হয় না!' অমলা যেন বোঝবার জন্যই পুনরাবৃত্তি করেন।

'হ্যাঁ অমল, যদি শোন, তবে একবার মনে করো তা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। উপায় যখন থাকে না, তখন সইতে সইতে, অমল, সইতে সইতে, মানুষ আর পারে না...'

অমলার চোখের বিস্ময়, বেদনা দেখে বোধহয় শেষ করেন নি কথা। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রুক্ষ, রূঢ় গলায় বললেন, 'যাও, যাও এ ঘর থেকে। যাও!'

উঠে এসেছিলেন অমলা। অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে একবার জিগ্যেস করে জেনে নেন কার কাছে ছিল তাঁর অপরাধ, কোন্ অপরাধ অমলা মার্জনা করলে তিনি শান্তি পেতেন, কিন্তু জেনে নেবার সময় আর হয় নি, তারপরই দ্বিতীয়বার স্ট্রোক হয়। তারপর আর বিছানা থেকে উঠতে হয়নি, যখন ডাক্তার বলে গেল যে কদিন থাকবেন ধরে নিতে হবে উনি সংসারের বাইরে, তখন সতী বিরক্তিতে কি নিষ্ঠুরই হয়ে উঠেছিল। 'যখন জানতেন তিনতলায় উঠে ম্যানেজারদের মিটিং এ বসলে ওঁর শরীরে সইবে না তখন কি প্রয়োজন ছিল বাহাদুরী দেখাবার? এখন কি আশা করছেন আমরা সবাই সংসার ফেলে ওঁকে দেখব?'

এমন ভাবে বলেছিল যাতে প্রতিটি শব্দ পৌঁছয় ওঁর কানে, ওঁকে বিঁধে-বিঁধে। 'এ বাড়ীর রোগে ভোগে আমিই সকলকে দেখেছি, আমিই দেখব ওঁকে, তোমরা বিব্রত হয়ো না,' অমলা কোথা থেকে বলবার সাহস পেলেন কে জানে!

তারপর কি অশান্তি। নিমেষে বদলে গেছল সতী, ওর মায়ের মত তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষে যেন জ্বলে উঠেছিল, 'তুমি কি বলতে চাও তুমি এসে উদ্ধার করেছিলে আমাদের? তুমি আসবার আগে আমরা কি অদেখায় ভেসে যাচ্ছিলাম?' যেন এই মুহূর্তের কোন কথার পিঠে কথা নয়, যেন বহুদিন ধরে জমে ওঠা পুরনো কোন ক্ষোভের কথা, তিরিশ বছর যার দু'হাত থেকে সেবা নিয়েছ তাকে অমন করে কথা কেউ বলে না।

'আঃ দিদি।' অরুণ মৃদু ভর্ৎসনা করে, কিন্তু সতী ভাইয়ের কথা শোনে নি, 'কতটুকু জান তোমরা!'

আরো কত কি বলত হয়ত, কিন্তু জামাইবাবু ও-ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠে-ছিলেন 'স্টপ্!'

সবাই চুপ করে যায়। তারপর, ঘরের বাতাসকে মথিত করে জামাইবাবু চেঁচিয়ে ডেকে উঠেছিলেন, 'ভগবান, ভগবান, ভগবান!' গলার স্বরে নিদারুণ যন্ত্রণা ছিল, অমন করে ঈশ্বরকে কেউ ডাকে না।

ধীরে মন ফিরিয়ে আনলেন। এই সব কথাই তাঁর নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে আছে। শুধু রোগীর সেবা করতে আর সংসার সামলাতে এক বিশৃঙ্খল সংসারে গিয়ে পড়েন নি অমলা। সেখানে শুধু রোগীর আরাম চাইবার

প্রত্যাশা, শিশুদের স্নেহযত্ন পাবার প্রয়োজন, স্ত্রী'র জন্যে স্বামীর উদ্বেগই ছিল না। তিনি যেন গিয়ে পড়েছিলেন অন্যসব সংঘাতের মধ্যে। চাওয়া-পাওয়া, বঞ্চনা, ক্ষোভ, হতাশা, ঘৃণা, আরো কত কিছুর আবর্তের মধ্যিখানে। অথচ বুঝতে পারেন নি ঠিকমত। স্নেহ, সৌজন্য, আন্তরিকতা দিয়ে জামাইবাবু আর মাঐমা রচে রেখেছিলেন আবরণ, ঢেকে রেখেছিলেন সব। অথচ যেন মঞ্চের বাইরে সে আবরণের বাইরে দাঁড়িয়ে-ই মাঝে মাঝে সব শুনতে পেতেন অমলা। ওরা তাঁকে ভেতরে ডাকে নি, কিন্তু সে সংসারের উত্তাপে তাঁর গায়েও আঁচ লেগেছে বই কি।

সে সব কথা মনে করবার ভাববার, অনেক সময় পাবেন পরে। অমলা ভাল করে চাইলেন। পারুলের গলা কখন থেমে গেছে। ঐ স্বর্গদ্বারের কাছের পথ দিয়ে ছোট ছোট আলোর ফোঁটা চলে যাচ্ছে। অন্ধকারের এমন উদার মহেশ্বরের রূপ বা কবে দেখেছেন তিনি, সামনে ঢেউ-এর মাথায় ফসফরাসের ফোঁটা, চারিদিকে সীমাহীন অন্ধকার, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত কান্না, তীর্থে এলে এ-সব বুকে ভরে নিতে হয়, অথচ নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিলেন। তবে কি জামাইবাবুর কথাই ঠিক, দিদির মৃত্যুর পর খাঁচা খুলে টিয়া চন্দনাকে ছেড়ে দেওয়া হল যখন, ওরা উড়তে পারলে না, তখন রাতজাগা লাল চোখ তুলে বলেছিলেন, 'আসল দুঃখটা 'তা ওখানেই, খাঁচাটা অভ্যেস হয়ে যায়, মুক্তি পেলেও বুঝতে পারে না।'

অমলারও কি তাই হয়েছে? তাই কি এতবড় উদার উৎসবের মাঝে বসেও তিনি সে কথাই ভাবছেন, যা, ফেলে দেবার, ভুলে যাবার! তিনি নিজেকে নিজে মুক্তি না দিলে কে তাঁকে মুক্তি দেবে, ছুটি দেবে?

'বাড়ী চল পারুল', অমলা আস্তে বললেন।

'মোট কথা, ওদের কাছে আর তুমি ফিরে যেতে পার না।'

'না। তবে ব্যবস্থা একটা কোন করা দরকার।'

'ব্যবস্থা কি তোমার হাতে সব সময় থাকে?' অন্যমনস্ক ভাবে বললেন পারুল। আসলে তিনি এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছিলেন। আজই স্থির করেছেন অমলা, নিজের মত নিজের ঘরে থাকবেন, ইচ্ছে মত দুটি রেঁধে নেবেন। কিছুরই অভাব নেই এখানে, লকারে বাসনকোসন অবধি সাজানো। পারুলের সন্দেহ হল তাঁর রান্নাঘরের ব্যবস্থা দেখে বোধহয় অমলার খারাপ লেগেছে।

'রান্নাঘরে মাংস, ডাল সব একজায়গায় দেখে কি তোমার আপত্তি হল।'

'না না,' অমলা ভাবতে চেষ্টা করলেন ছোঁয়াছুঁয়ি এঁটোসকড়ির হিসেব খুব একটা কোনদিন ছিল না কি তাঁর, ভেবে পেলেন না। মাঐমা থাকতে অবশ্য অনেক মানতে হয়েছে, আর, চাও না চাও কিছু কিছু জিনিস সঙ্গের সাথী হয়ে গেছে, ইচ্ছে করলেও কি পারেন তিনি সব ভুলে যেতে! ভাত চড়িয়ে হাতটি না ধুয়েই অন্য কাজে যেতে? কিন্তু বাড়াবাড়ি তাঁর কবে

ছিল ? অর্ণ তো ইস্কুলে পড়বার সময়ে দিনের পর দিন, বর্ষাকালে, চবটবে শব্দ করা খেলার ব্টজ্তো জলে ভিজিয়ে এনে উনোন পাড়ে রেখে দিত, নিবন্ত উনোনের ওপর ঝ্লিয়ে ধরত উনোন খোঁচাবার শিকে টাঙিয়ে, কই, তখন ত' খ্ব অশান্তি করেন নি তার সঙ্গে ? হাঁড়ি ক্ড়িও ফেলে দিতে যান নি। একে কি খ্ব সংস্কার থাকা বলে !

'না পার্ল, ছোঁয়াছ্ঁয়ির জন্যে কিছ্ মনে হয় নি আমার, এমনিই, মনে হচ্ছে যা হোক নিজের ব্যবস্থা নিজেই করি, থাকব যখন ক'দিন।'

'তা ছাড়া প্রীতে তো ছোঁয়াছ্ঁয়ি এ'টো বিচার করতে নেই।' পার্ল যেন আশ্বস্ত হলেন, হেসে বললেন, 'আমার তো জান ও-সব খেয়াল থাকে না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাট্কু মেনে চলি, নানাজাত নিয়ে থাকা।'

'তোমার বোর্ডিং-এ যারা আসে তারাও বোধহয় সেই জন্যই আসে।' অমলার মনে করেই তৃপ্তি হল। এ ঠিক সংসারের পরিচ্ছন্নতা নয়, চুনের গন্ধঅলা ঘর, লাইজলের গন্ধঅলা মেঝে, প্রনো, অথচ চুনকাম করা বড় বড় দালান, বাইরের ঘেরাদেওয়া জায়গায় ফণীমনসা, ভেতর উঠোনে বড় বড় টবে পাতাবাহার আর অর্কিড, রান্নাঘরের পেছনে তরকারির বাগান দরজায় জানলায় সাদা পর্দা, পেছনের কম্পাউন্ডে কাপড় মেলবার তারগ্লো অবধি সোজা সোজা বাঁশের খ্ঁটিতে টানটান করে বাঁধা।

ঠিক সংসারের পরিচ্ছন্নতা নয়, আসাযাওয়ার দোর খোলা এ ধরনের একটা নৈর্ব্যক্তিক ভাব আছে, সংসার নয়, তাই এস এস-ও নেই, যাও যাও-ও নেই। অথচ পার্লের দ্ষ্টি সবদিকে, তাই যত্নের ভাব, র্চির ছাপের অভাব নেই, সবচেয়ে ভাল লাগে, পার্লের ঠিক 'আমার, আমার' এ ধরনের আসক্তি নেই। ভারী একটি কাজের লোকের ভাব আছে ও'র মধ্যে, কাজটাকেই ভালবাসেন উনি, তাই সবসময়ে ঝরঝরে সচল, সপ্রতিভ। নিজের ঘরদোর অবধি সাদায় মোড়া। সবসময়ে পরেন দামী দামী সব্জ, নীল, হল্দ, ম্গা পাড়ের ধপধপে সাদা তাঁতের কাপড়, দামী চটি, একহাতে ছেলেদের মত চাউস হাতঘড়ি, রান্নার সময়ে অবধি পোশাক বদল নেই।

'যাক, ছোঁওয়া-ছ্ঁয়ির জন্যে আমার রান্নাঘর ত্যাগ কর নি জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।'

উঠে ঘরের মধ্যে একপাক বেড়িয়ে নিলেন পার্ল। বললেন, 'অস্বিধেই বা কি, আমিই সব আনিয়ে টানিয়ে দেব, ইচ্ছে হয় মন্দিরের পাশে গিয়েও বাজার করতে পার শখ করে, তা ছাড়া যেদিনই ইচ্ছে হবে না স্টোভ ধরাতে আমার রান্নাঘর তো রইলই। আবার, অনেকে মহাপ্রসাদও আনিয়ে খায়টায়।'

অমলা জিগ্যেস করলেন, 'এত লেখাপড়া শিখে হোটেল করতে গেলে কেন পার্ল ?'

পার্ল জানলায় পর্দা আঁটতে আঁটতে বললেন, 'ভাল লাগে। তা ছাড়া আমি ভাতবেচা কায়েতের মেয়ে, ভাতবেচা কায়েতের বউ, জান তো ?'

হাসিমুখে চাইলেন ঘাড় ফিরিয়ে। বললেন, 'বাবার হোটেল ছিল খঙ্গপুরে, সাহেবরা অবধি থাকত। আর শ্বশুরবাড়ীর তো জানই, শেয়ালদাতে অতবড় হোটেল আজও আছে। করতে পারতাম প্রফেসারী অথবা ইস্কুলটিস্কুল, ভাল লাগল না।'

'টাকা পয়সা কি করবে?'

'কি জানি? বাপের বাড়ীর সাতকুলে কি কাউকে পাব না বিজ্ঞাপন দিলে?'

'পেতে পার।. তা ছাড়া টাকার জন্যে অনেকে ছলনাও করতে পারে।'

'তাও তো বটে।' তারপর হঠাৎ হেসে পারুল বললেন, 'এখানে, আমার পোষ্য যারা আছে ঝি রাঁধুনী, জলভারী, রিকশাঅলা এদের কিছু কিছু দিয়ে বাকি সব চ্যারিটি করে দেবখ'ন। তুমি কিছু নেবে?'

পারুল ঠাট্টা করলেন, কিন্তু অমলা ঠাট্টা বিশেষ বোঝেন না। আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'ও মা, আমাকে দিতে যাবে কেন?'

'তা, টাকাপয়সা না চাও, এখানে একটা কাজটাজ চাও কি না ভেবে দেখ।'

হাসতে লাগল পারুলের চোখ। বললেন, 'এখন না হোক, ভাবতে তোমায় হবেই। বয়স আছে, জীবন পড়ে আছে সামনে।'

'বয়স!'

'কতই বা আর হবে তোমার, ছেচল্লিশ কি সাতচল্লিশ, আমি তোমার চেয়ে দুপাঁচ বছরের বড়ই হব, অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে তাই দিদি বলি, কিন্তু আশ্চর্য, চেহারায় এখনো বয়সের ছাপ লাগে নি। দেখলে হিংসে হয়।

অমলার মনে পড়ল এক একজন এক এক কথা বলতেন। মাঐমা বলতেন নাক চোখ মুখে কি সুন্দর করে বউমা, অমলার রঙ কালো হলে কি হয়, ভারি আলগা ঢলঢলে শ্রী আছে, ভাল লাগে। মাঐমা হয়তো সত্যি স্নেহ করতেন, তাঁর কথাতেই সুন্দর সুন্দর পেড়ে কাপড়, হালকা রঙীন শাড়ী পরতে হয়েছে অমলাকে।

অসীমা, পর্দার আড়ালে, শোবার ঘরের একান্ত সাম্রাজ্যে স্বামীকে বলতেন কেন যে হিমানী নার্সকে ছাড়ালে বুঝি না। অমলার হাতে ফলের রস খেতে ভাল লাগে না আমার, তুমি জান আমি কালো, কুৎসিত মানুষ দেখতে পারি না।

তিনি শুনতে পেয়েছেন বলে জামাইবাবুর সে কি মনস্তাপ। বেরিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন, 'দুঃখ পেও না অমল, তোমার দিদি রোগের যন্ত্রণায় সব ভুলে যান। ওঁর কথা কি ধরতে আছে!'

এই সেদিন, বারান্দায় বসে ছিলেন, লতু বললে, 'তোমায় আমি যতদিন দেখছি. ঠিক একই রকম। চির সবুজের সুষমা না কি যেন একটা বলে, অনেকটা তাই।'

অথচ সতী তার কিছুদিন আগে বলেছিল 'যাদের শুনি, মাথার কাজ করতে হয় না, এই যেমন চাষাভুষোরা, তাদের চেহারায় বয়সের ছাপ পড়ে

না।' বলে মুখ টিপে অনীতার দিকে চেয়ে হেসেছিল।

জামাইবাবু কোনদিন কিছু বলেন নি। অমলার সে কথা মনে পড়ল। একটু হেসে বললেন, 'সতী বলে বোকালোকদের চেহারায় বয়সের দাগ পড়ে পড়ে না।'

'বলে বুঝি! বা সতী তো কম অশিষ্ট নয়, তোমায় ঠেস দিয়ে কথা বলে?'

'না না, কিছু মনে করে বলে নি।'

'তুমি আর দোষ ঢেক না ওদের। সত্যি শৈলবাবু ছেলেমেয়েদের এমন অযথা প্রশ্রয় দিয়েছেন, ওতে সন্তান মানুষ হয়?'

বিরক্ত হয়ে পারুল দুটো জানলাতেই পর্দা লাগিয়ে ফেললেন। পুরনো পর্দা হাতে জড়ো করে নিয়ে বললেন, 'ওতে কারো উপকার হয় না। বাপ মা নিজেদের দুর্বলতার জন্যে ছেলেদের সব রকমে প্রশ্রয় দেন, ফলে বড় হয়েও সকলের কাছে তাদের প্রত্যাশা অসম্ভব বেড়ে যায়। আর পরিণামে মন ভাঙাভাঙি, অসন্তোষ, ঘরেপরে অশান্তি।'

অমলার দিকে বাতাসে পোকা খোঁজা পাখীর মত তীক্ষ্ণ, সন্ধানী দৃষ্টি ফেললেন, 'ওদের ছোটবেলা থেকে এই সেদিন অবধি, ফি বছর কলকাতায় গেছি, ওখানেই উঠেছি।'

'তাতেই তো পরিচয়। আজ আমরা কেউ তোমায় পর ভাবি না।'

'দেখেছি সব। তোমাকে না কি সব অধিকার দিয়েছিলেন, পেরেছ কোনদিন শাসন করতে?'

কেমন করে শাসন করতেন? সে অধিকার তো সত্যিই দেন নি জামাইবাবু। দিদির মৃত্যুর পর প্রথমে সতী, তারপর অরুণ, দুজনকেই সর্বদা মন তুষে চলতেন।

'কি যেন একটা কারণ ছিল, তাই, শৈলবাবু ওদের ঘুষ দিয়ে চলতেন,' পারুল বেরিয়ে গেলেন।

অমলাকে রেখে গেলেন অশান্ত করে।

কি সুন্দর স্থির করে এসেছিলেন মন। কালই গিয়েছিলেন গৌরগম্ভীরায়। বাড়ীতে ঢুকবার পথে পা দিতেই ভক্তিতে নুয়ে এল মন। মনে হচ্ছিল পথের সব ধুলো আঁচল দিয়ে ঝাঁট দিতে দিতে যান, হয়ত একেই বলে স্থানমাহাত্ম্য। হলই বা পাঁচশোবছর আগে, তবু যে জায়গায় স্বয়ং তাঁর পায়ের ধুলো পড়েছে সে জায়গার পবিত্রতা ধুলো বা আবর্জনা নষ্ট করতে পারে না। কিছু কিছু জিনিস থাকবে বই কি সব মলিনতার মাঝেও অমলিন, ধুলোর মাঝে অমূল্য হীরে যেন, নইলে মানুষ বাঁচত কোনদিকে তাকিয়ে।

ভেতরের ছোট্ট ঘরের পানে তাকিয়ে, শচীমায়ের শেলাই করা কাঁথা কমণ্ডলুর দিকে চেয়ে, ক্লান্ত কীর্তনিয়ার 'গৌর কীর্তন' শুনতে শুনতে মনটি যেন গঙ্গাজলে ধুয়ে গিয়েছিল। তাই তো অমন করে লুটিয়ে বসে পড়েছিলেন জগন্নাথ মন্দিরের দোরে। অপরাহ্নের মন্দিরের প্রাঙ্গণে তো হলুদ আলো

পড়ে রোদের, প্রাচীন মানুষের রোগেশোকে হলুদ মুখের মত রক্তশূন্য দেখায়। মলিন মহাপ্রসাদের মাটির পাত্র চেঁছে নিতে ব্যস্ত ভিখারী, কুষ্ঠী, কারো বা পায়ে গোদ, ক্ষুধার্ত কাকের কাড়াকাড়ি, ভেতরে গিয়ে দেখেছিলেন সামান্য ক'জন ভক্ত পড়ে আছে সাষ্টাঙ্গে, পাণ্ডা বললে, 'এইখানে দাঁড়াও, এখান থেকে তিনি জগন্নাথকে দেখেছিলেন, অমলা তো জানেন বিগ্রহের পেছনে বারো'শ হাজার বছরের অন্ধকার জমে থাকে, আরসলা ফরফর করে বুঝি বা, তবু মনে কোনরকম কিন্তু ভাব আনেন নি। তিনি কি সংসারী যে বাইরের মলিনতা দেখে কষ্ট পাবেন শুধু, বিশ্বাসে, ভক্তিতে আত্মসমর্পণে যখন এত আনন্দ পাওয়া যায়?

বারবার মনে করেছিলেন রোজ যাবেন, বসে থাকবেন মন্দিরের দোরে, গৌরগম্ভীরায়, 'আশ্চর্য স্থানমাহাত্ম্য আছে' হঠাৎ দেখা হওয়াতে ট্রেনের সাথী বৃদ্ধা বলেছিলেন, 'মহাপুরুষদের পায়ের ধুলো' সে মিছে হবার নয়, এই কলিতেও এখানে কত শান্তি।'

অমলা চোখ নামিয়ে মাটির দিকে চেয়েছিলেন অপরাধীর মত, সাগ্রহে খুঁজেছিলেন, শান্তি যেন ঐ ধুলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছে. খুঁটে তুলে আঁচলে বেঁধে নেবার অপেক্ষা।

এ ঘরে এসেও ভাল লাগল কত। সমুদ্র দেখা যাক না যাক, সমুদ্রের বাতাস সর্বদা আসে, ভাবছিলেন একা বসে বসে শুধু ভাল ভাল কথা ভাববেন, মহাপুরুষদের কথা।

কিন্তু এখনো তো তিনি ধুলোতেই পড়ে আছেন, ধুলোয় আসক্তি। তাই এক নিমেষে তাঁর মনের সব শান্তি অশান্তি হয়ে গেল, পারুলের এক কথায়।

জামাইবাবু ঘুষ দিতেন, কাকে ঘুষ দিতেন? কিন্তু সে কথা তো মিথ্যে নয়, নইলে দিদির মৃত্যুর পরে সতীর কত বা বয়স, তাকে অমন সায় দিয়ে চলতেন কেন? দিদির মৃত্যুর কথা অমলা জানতেন না, তিনি থাকতেন বাড়ীর একেবারে অন্যদিকে। মৃত্যুর একমাস আগে থেকে দিদি সহ্য করতে পারতেন না অমলাকে। দেখলেই চেঁচিয়ে উঠতেন, 'বেরিয়ে যাও, বের করে দে তোরা ওকে, এখনো বাড়ীতে থাকতে দিয়েছিস ওকে?'

আড়াল থেকে সব করতেন, সামনে যাবার উপায় ছিল না, মাঐমা শুকনো মুখে বলতেন, 'যেও না, রোগে রোগে বউমা আর সে মানুষ নেই, হাজার হক রুগী, ওকে উত্তেজিত করে কি দরকার!'

সতীর বয়স তখন কত বা হবে, চোদ্দ কি পনেরো, স্বভাবে এমনিতেই কোমলতা ছিল না কোন, মা-কে পাহারা দিত বাঘিনীর মত, অমলাকে দেখলেই হিস্‌হিসিয়ে উঠত 'সরে যাও, মাসী!'

পরে ভেবেছেন, কত ভেবেছেন, কেন শেষের একমাস ধরে জামাইবাবুর সঙ্গে বন্ধ ঘরের আড়ালে শুধু অশান্তি, চীৎকার ক্ষোভের ভর্ৎসনা চলত? কেন সকাল হতে দেখতেন জামাইবাবুর চোখের নিচে কালি, রেলিং মুঠো করে

ধরে নিচের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একলা ?

আর সেই ভয়ঙ্কর সকাল বেলা ! আগের দিন রাতে ডাক্তারবাবুর হাত ধরে দিদির সে কি চীৎকার, 'জানেন না, আপনারা কেউ জানেন না !'

কি জানত না কেউ ? সকালবেলা শুনলেন দিদি আর নেই। কোন কথা মনে রইল না, ছুটে গেলেন দিদির ঘরে, শুনলেন ঘুমের মধ্যেই হয়ে গেছে, সতীর চোখে দেখলেন বড়দের মত রাগ, জল নেই, তাঁর দিকে চেয়ে ছিল।

কেন তার থেকেই জামাইবাবু অমলাকে এড়িয়ে চলতেন ? কেন বাড়ীর চাকরদাসী সবাইকে বিদেয় করে নতুন লোকজন রাখলেন ! স্ত্রী'র স্বামীর ওপর এত বিদ্বেষ যেমন দেখেন নি অমলা, স্ত্রী'র ওপর এমন মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়াও দেখেন নি আর কারো। শুধু মনে হয়, এত পেয়েও অসীমা এমন করে জ্বলতেন কেন ? শুধু কি স্বামীর ভালোবাসা ? ছেলেমেয়ে কি মা-অন্তঃপ্রাণ নয় ? যারা বলে তারা জানে না ও বাড়ীর প্রতি দরজার ওপর, দালানে, প্রতি ঘরে অসীমার ছবি ঝোলে, ফুলের মালা দোলে। কত ছবি প্রমাণ সাইজের। রোগশয্যায় জামাইবাবু যেদিকে মুখ ফেরাতেন, সেদিকে অসীমার ছবি। দিদি যেন পাহারা দিতেন স্বামীকে। রাতে সব দরজা বন্ধ আছে কি না, উঠোনের বাতি নেভানো হয়েছে কি না, সব পরখ করে জামাইবাবুর আর কিছু লাগবে কি না দেখবার জন্যে যখন ঢুকতেন অমলা, তখন কতদিন চমকে উঠেছেন। মনে হয়েছে রাত হলে অসীমার ছবি যেন বড়ই জীবন্ত দেখায়। কেন ?

কেনই বা জামাইবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব ছবি নামিয়ে ফেললে সতী অরুণ, পাঠিয়ে দিলে চিলেকোঠার ঘরে, একখানি ছোট ছবি শুধু টাঙিয়ে রাখলে ঠাকুরঘরের দেওয়ালে, সেখানে তো আরো গুরুজনদের ছবি, ভোলা-গিরির ছবি, তারকেশ্বর নাথের ছবিও থাকে। সেখানে কি মা'র ছবি কেউ রাখে ? না মা ওদের মনে ছিলেন বাবার সঙ্গে জড়ানো, তাই বাবা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মা-কে আর চোখের সামনে রাখবার দরকার হল না ?

এমন কত প্রশ্নের জবাব অমলা পাননি। এই মনে হয় বুঝে ফেলেছেন ওদের, আবার বুঝতে পারেন না, এত বছরেও পৌঁছতে পারলেন না সতী অরুণ অনীতার মনে, জামাইবাবুর মনও পান নি। অথচ একদিক ধরেই হেঁটেছিলেন, তিরিশ বছর আর কোনদিকে লক্ষ্য ছিল না। যেন তীর্থযাত্রার চেয়েও অন্তহীন সে-পথ, পৌঁছে গেলেও হয়ত শান্তি পেতেন না, দেখতেন রুক্ষ স্নেহহীন প্রান্তরের মত ওদের মনপ্রাণ। সে-মন পেয়েও লাভ হত না, শুধু ক্লান্ত হতেন।

ওদের কথা যতই ভাবেন, ততই মনে হয় ছোটবেলায় অনীতার একটা চীনে ধাঁধার বাক্স ছিল। রঙ আঁকা টুকরো ঠিকমত না মেলালে কিছুতে মিলবে না ধাঁধা। এই সবটা মিলিয়ে ফেলেন, এই আবার সব গোলমাল হয়ে যায়।

কি যেন নেই, কি যেন না পেলে ধাঁধা মিলবে না।

তিনি চলে আসবার আগের রাতে সতী, অরুণ, অনীতা, লতু, সবাই জামাইবাবুর ঘরে একসঙ্গে হয়েছিল। বাইরের উকীল নন। হরগোপালবাবু জামাইবাবুর নিজের পিসতুতো ভাই। কি যে বলে গেলেন সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা জামাইবাবুর ইচ্ছেমত, তারপরই সতী আর রাগ চাপতে পারলে না।

সে-রাতে তিনি মনের ক্লেশে চুপ করে বসে ছিলেন বারান্দার কোণে। সারাদিন ধরে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছিলেন। গলা ধরা, মনে হচ্ছিল কাদের জন্যে বা কাঁদছেন, ওরা কি মানুষ, ওদের কথা কানে এসেছিল ছেঁড়া ছেঁড়া, জোর গলায় কথাগুলো শোনা যাচ্ছিল শুধু, উঠে বলতে রুচি ছিল না, আমি এখানে আছি, তোমরা সাবধানে কথা কও।

'...মা'র মৃত্যুর জন্যে কি...' সতীর গলায় আগে পরের কথা বাদ দিয়ে এটুকু শোনা গেল।

' রা তখন ছোট, তো···মনে থাকবার কথা...', অরুণ বিব্রত। 'দিলীপ বলেছিল, তখন তোমরা শোন নি, দিলীপ বলেছিল' 'অনীতার গলা যেন আদুরে বাঁদুরে মেয়ে, হাততালি দিয়ে নাচছে। আবার স্বামীকে নাম ধরে ডাকে।

'তা দিলীপ তো মুখ খুলেই আছে, কোন্‌টা ওর মনের কথা কে জানে।' সতী অপ্রসন্ন। এ অপ্রসন্নতা দিয়ে সে মনে করিয়ে দিতে চেষ্টা করে, দিলীপ তার বরের কাছ থেকে যে দশ টাকা নিয়েছিল সেটা দিতে ভুলে যাওয়া সে ক্ষমা করে নি। যদিও অমন অনেক দশটাকাই ঈশ্বরের আশীর্বাদে সতীর হাতের ময়লা বললেও মিছে বলা হয় না।

'কিন্তু আমাকে··· ?' লতু এখন বিনীত, কুণ্ঠিত, এত কুণ্ঠিত কেন?

'...কি জানবে ? চিরদিন, চিরদিন আমি দেখে এসেছি···ঘেন্না ঘেন্না··· চক্রান্ত, ওঁর চক্রান্ত...' সতীর হিষ্টিরিয়া চাগাচ্ছে।

···'বাবা নেই!' অরুণ যেন শূন্য সভাগৃহে জরুরী খবর পাঠ করল। সকলের প্রয়োজনীয় এক সংবাদ।

'তা হলে তোমরা বলতে চাও ..' সতী এবং অন্যরা একসঙ্গে গুণগুণ করে সুরু করল।

'তাই ভাল, তাই ভাল · ' অনীতার মনে নেই ও এখন আর স্কুলের মেয়ে নয়, ওর মেয়েরাই স্কুলে পড়ছে। কথা নয় তো হাত তাইতাই।

'হ্যাঁ দিদি, তোমার পক্ষে যত ..'

'আমি জানতাম। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে ..'

'মা'র মৃত্যুর ছবি আমার চোখে ভাল···'

'মা মারা যাবার কথা আমার কেন মনে পড়ে না বলত!'

'মা যখন গেলেন আমি তখন বড় ছোট···'

'সেই জন্যই রাতারাতি গোপালবাবুর মা, আমাকে · ;'

—'বাবুর মা যে মা'র জন্যে হাসতে হাসতে মরতে পারত!' সতীর শেষের গলা শাণিত, তীক্ষ্ন। অমলা উঠে যেতে পারলে বাঁচতেন। এত কথা শুনতে চান নি তিনি, কিন্তু তখন উঠলে আবার অন্য কথা শুনতে হত।

মৃত্যু। বারবার শুধু মা'র কথা! অস্বাভাবিক ছেলেমেয়ে সব। সেদিন অবধি যে লোকটা ছিল, তোদের জন্যে যে তিলে তিলে প্রাণ দিলে তার কথা একবার বল্? তিলে তিলে। এই কথাটি বললে মনে পড়ে ফর্সা ন্যাকড়ার পুঁটলী থেকে তিল বের করে বড়া করতে দেবেন বলে পুঁটলী তুলে দেখেন এই এতটুকুন ফুটো দিয়ে সব তিল পড়ে যাচ্ছে। জামাইবাবু খুব হাসেন 'তিলবড়া খেতে চাইলাম, তা তোমার তিল অমল, যেমন ঝুরঝুরিয়ে পড়ে গেল তা দেখে মনে হচ্ছে তিলেতিলের আসল মানে বোধ হয় ধীরে ধীরে নয়, তাড়াতাড়ি।'

সব কথায় আনন্দ করতেন। ইদানীং ঘরসংসারের সব খবর খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন, চড়াইপাখী যেমন শীতের আগে খাবার খুঁটে নেয়, তেমনি আগ্রহে জানতে চাইতেন সব, সবার কথা। অথচ তাঁর কথা এরা কতটুকু বলল, খালি মা আর মা। তবু যদি অমলামাসী না দেখতেন ছেলেমেয়ের প্রতি মা'র সে অদ্ভুত ব্যবহার, এই ভালবাসার বন্যা, এই মেজাজের অন্ত নেই। সুস্থ থাকলেও দিদিকে ছেলেমেয়েরা কতটুকু কাছে পেত তা ভাববার কথা। মায়ের শোক ভোলাতে নিঃসন্তান মামারা দিদিকে বড় বেশী আদর দিয়েছিলেন। ছেলেমেয়েকে কাছে থেকে সঙ্গস্নেহ দেবার মত ধৈর্যসহ্য ওঁর স্বভাবে ছিল না। পরে ত' অসুখই হয়।

অস্বাভাবিক মাতৃভক্তি ওদের। আর, শুধু ওদের কেন, অমলা অন্যমনস্ক-ভাবে টেবিলে বসে দেরাজ টানতে লাগলেন, না টানলে খুলবে না, পারুলের কাছ থেকে চাবি নিতে হবে, এই গা-তালার ঝামেলা বড় বেশী, চাবিটি আগে খারাপ হয়, শুধু ছেলেমেয়েদের ভক্তি তো নয়, স্বামীর ভালবাসা এত সহজে পেয়েছিলেন দিদি!

স্বামীর ভালবাসা! ভাবতে গিয়ে লজ্জায়, সঙ্কোচে এতদিন পরেও গা হিম হয়ে এল অমলার। কিছু কিছু চূড়ান্ত লজ্জার ঘটনার গুরুত্ব এমনই যে মন থেকে তার দাগ ওঠে না। তাঁকে দেখলেই জামাইবাবু চটে উঠতেন, কপালের রগ ফুলে যেত, তবু দ্বিতীয় স্ট্রোকের আগে জামাইবাবুর ঐ রাত-জেগে জেগে দিদির ছবির দিকে চেয়ে থাকা যেন অমলা সহ্য করতে পারছিলেন না। ওঁর শরীরে তখন বিশ্রাম দরকার।

অথচ, 'দিদির ছবির দিকে চেয়ে আপনি…' বলতেই কি রেগে উঠলেন জামাইবাবু, 'তোমার মুখে তার নাম কেন? তার নাম তুমি করো না' বলে চেঁচিয়ে এককাণ্ড।

তখন ঐ লতুই মিহিগলায় বলেছিল 'হয়, এমন হয়। ও বিষয়ে যখন উনি এমন সেনজিটিভ—।'

চাকরদাসীরা অবধি সামনে এসে পড়েছিল। কি লজ্জা! পৃথিবী দ্বিধা হল না। এখনো সেই লজ্জা তিনি বয়ে চলেছেন। সত্যিকথাটা যে কি তা কোনদিনও বুঝিয়ে বলতে পারলেন না, ও বাড়ীর লোকরা চিরদিন, সবকিছু উলটো বুঝবার জন্যে এত বেশী ব্যস্ত থাকত।

হঠাৎ দেরাজটা ঘটাং করে খুলে গেল। আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরে তিনি দেরাজটা টানছিলেন? কিন্তু আটকাল কিসে?

জামাইবাবুর নামলেখা খাতা। কেমন করে মলাটটা আটকে গেছল দেরাজের খাঁজে।

চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন অরুণের চিঠি, সাদা মোটা লেফাপা দরজার কোণ থেকে উঁকি দিয়ে হাসছে। কে রেখে গেল? খাতাটা টানতেই ওপরের পাতায় নিজের নাম দেখলেন।

॥ ৪ ॥

'অমল কি আমায় ক্ষমা করবে?'

জামাইবাবুর হাতের লেখা আঁকাবাঁকা, কোন লাইনটা সোজা নয়, কোনদিন বাংলা লেখার দরকার হয়নি, অনভ্যেসের লেখা। 'একটা স্ট্রোক হয়ে গেল, তারপর পুরীতে আসা, তিরিশবছর বাদে এ বাড়ীতে থাকতে এলাম, সেই এসেছিলাম বাবা মা'র সঙ্গে।'

অমলা ভেবে পেলেন না তাঁর কোন্‌টা আগে দেখা উচিত। অরুণের চিঠি, না জামাইবাবুর খাতা। জামাইবাবুর খাতা তিনি দেখছেন সেটা কি উচিত হচ্ছে? দেরাজ এত এঁটে যাবার কথা নয়, আবার খুললই বা কি করে বিনে চাবিতে? লোনা লেগে তালাচাবি কি এমনই অকেজো হয়ে যায়?

'সইতে পারছি না আমি আর। এরপর হয়ত আরেকটা স্ট্রোক হবে, তখন সর্বদা ছেলেমেয়েদের চোখের সামনে, সতীর চোখে অভিযোগ, সব জানবার ফলে ও মনে করে আমাকে জব্দ করবার হাতিয়ার পেয়ে গেছে।

'জানে, ওরা সব জানে। সতী, অরুণ, অনীতা। সেই জেনে ফেলাটা ওদের হাতে জল্লাদের খড়্গ। দীর্ঘদিন, বহুদিন হয়ে গেল সেই খড়্গ শানিয়ে ওরা আমায় ভয়ে রেখেছে। তাই কোনদিন জীবন আমার কাছে সহজ হল না। আশ্চর্য, এতদিন বাঁচলাম কি করে? কোন্ দিকে তাকিয়ে বেঁচেছিলাম।

'ভাবতে ভয় পাই। চারদিকে অসীমার ছবি। সতী টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। আমার ঘরে সন্ধ্যেবেলা ঢুকে যখন দেখলাম চারদিক থেকে অসীমা এগিয়ে আসছে, ভয়ে, বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম।

'সেই চেঁচানোই আমার স্বীকারোক্তি। সতীকে দেখতে পাই নি। আলো জ্বালতেই দেখলাম ওর চোখে নিষ্ঠুর আনন্দ জ্বলজ্বল করছে, ধরা পড়ে গেছি আমি। আগেও জানত, এখন আমি নিজেই স্বীকার করলাম।

'অথচ এই জানাজানির ভয়ংকরতা কোনখানে? না, এ নিয়ে আমার সঙ্গে

ওদের কোনদিন কথা হবে না। কথা হবে প্রত্যহ, যেমন হয়, সংসারের কথা, দৈনন্দিনতার কথা। অথচ আমি জানব ওরা জানে, ওরা জানে আমি কি করেছি, তবু আমরা বুঝতে দেব না, জোরে উচ্চারণ করব না মনের কথা, এই আমাদের ছলনা, কুটিল চক্রান্ত প্রতিদিনের।

'অমল কিছুই জানে না। ওকে বুঝতে দিই নি আমি। এতবছর ধরে গোপনতা রেখে চলতে পেরেছি আর পারব কি না জানি না। সতী কি সব বলে দেবে? আমার চেষ্টা আমি করে যাই, তাই উইলে সব নির্দেশ দিয়ে রাখলাম, তারপর ভগবানের হাত।

'এখন ভাবি, কেমন করে অমন কাজ করেছিলাম। ধৈর্য কি আমার অনেক আগেই ক্ষয়ে গিয়েছিল, মনে মনে কি আমি হাজারবার একই পথে মুক্তি খুঁজেছিলাম? তা ছাড়া অসীমা আমায় প্রলুব্ধ করত। 'ইচ্ছে করলেই তুমি মুক্তি পেতে পার', তার গলায় থাকত বিদ্রূপ, 'উপায় তোমার হাতের কাছে।'

'মনে জানতাম অসীমা সত্যিকথাই বলছে। তাই মুখে আমি ছলনার শেষ রাখি নি। ছলনা? না। মনের চিন্তার জন্যে আমার অনুশোচনা হত, তাই প্রতিদিনের ব্যবহার ছিল আমার প্রায়শ্চিত্ত। তাই আমার ব্যবহারে থাকত ধৈর্য, ক্ষমা,, অনুতাপ। আর আমার দুর্বলতা অসীমা অনেক আগেই ধরে ফেলেছিল। অসীমা, অরুণ, সতী, সবাই। ফাঁকি দিতে পারি নি কাউকে। তাই নিজেকে ফাঁকি দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম।

'বোধহয় বিধির নির্বন্ধ। তাই আমি, চিরদিন একটু স্নেহমমতার প্রত্যাশী, বিয়ে করলাম অসীমাকে। ঐশ্বর্যের তাপে ওর অনুভূতি শুকিয়ে গিয়েছিল, এসেও পেল ঐশ্বর্য, সে যে আর কিছু চাইবে না তা আমার স্বপ্নের অতীত ছিল।

'ওকে ভালবাসা যেত না, ও নিজেও স্নেহ, ভালবাসা কিছুই চায় নি। আমাকে এবং সকলকে একান্তভাবে ওর হাতের মুঠোয় রাখবে এই প্রভুত্বের বাসনা নিয়েই ও এ সংসারে ঢোকে। শুনেছি ও ছিল ওর মা'র মতন। দরিদ্রের সংসারে তিনি থাকতেন না, মেয়ে নিয়ে ভাইদের সংসারেই কাটাতেন। বিয়ের সময়ে তাই, ওর বাবার ভীরু-কাতর, কুণ্ঠিত উপস্থিতি দেখে আশ্চর্য হয়েছিলাম। বিয়ের সময়ে অমল নেহাৎ ছোট, ধনী বাড়ীতে দরিদ্র আত্মীয়ের মত কুণ্ঠিত হাসিতে নিজেকে ঢেকে ওর মা ওকে নিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

'সবচেয়ে দামী শাড়ী ছাড়া ওর মন ওঠে নি, দুর্মূল্য উপহার ছাড়া আত্মীয়-দের দিতে জানত না, সবচেয়ে দামী হোটেল ছাড়া বিদেশে কোথাও থাকত না, প্রথম ওর পরিচয় প্রকাশ পায় ওর জ্ঞাতি মামাতো ভাইয়ের উপনয়নকে উপলক্ষ করে। মা আমায় বললেন তিরিশটি টাকা পাঠিয়ে দাও। অসীমা বলেছিল সোনার পৈতে, হীরের আংটি ছাড়া আর কিছু দেওয়া চলবে না। সে আমার সাধ্যাতীত জেনে মা-কে শুনিয়ে বলেছিল এইজন্যে অবস্থার তারতম্যে সম্বন্ধ করতে নেই, মামারা আমার ওপর সুবিচার করলেন না।

'আমাদের মনে আঘাত লেগেছিল। কিন্তু ব্যথা পাওয়ার সেই সবে সুরু। দশবছরের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে গেলাম আমি, বার্ধক্য এসে গেল, পাঁচবছর যেতে না যেতেই। মুক্তি পাব কিসে এ চিন্তা আমার রাতকে বিষাক্ত করেছে।

'স্নেহহীন, মায়ামমতার সম্পর্কলেশ আমাদের এ বিচিত্র সম্বন্ধের মধ্যেও সন্তান এল তিনটি। কিন্তু অসীমাকে মাতৃত্ব-ও কোমল করতে পারে নি। বরঞ্চ, রোগে ভুগে ভুগে ওর জগৎ যখন চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ, তখন বোধহয় ও প্রথম উপলব্ধি করে আমার সকল আন্তরিকতা বাইরের, প্রবঞ্চনা, আমি যে ওকে ভালবাসি না সেটা আমার সংস্কার মতে পাপ, আর আমার ব্যবহার সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

'অনেকদিন ভেবেছি অমলাকে সব কথা খুলে বলি। বললে ও কি বুঝত? হয়ত জিজ্ঞেস করত কেন, পাপ কেন। কি করে বলতাম সবরকম প্রাচীন প্রথা, সংস্কারের প্রতি আমার আনুগত্য রক্তের মধ্যে। স্নেহপ্রেমহীন বিবাহ-বন্ধন রক্ষা করে আমি পাপ করে চলি, এ কথা কি সে বুঝত?

'সেইজন্যে অসীমা আমায় অভিশাপ দিত। বলত তোমার হাতে ওষুধ খাব না, তুমি আমায় বিষ দেবে। আমি নম্র হয়ে বলতাম পাগলামি কর না, খেয়ে নাও। ও বলত জানি, আমি জানি, আমায় সরিয়ে দিয়ে তুমি অমলাকে এ সংসারে আনতে চাও। আমি কানে হাত দিতাম। তাকিয়ে দেখতাম ওর রূপ, গলার গড়ন, চোখের জিজ্ঞাসা। ভাবতাম ও কি করে জেনে গেল প্রতি-দিন মনে মনে আমি বহুবার ঐ গলা হাতে টিপে ধরি, ফাঁস লাগাই, ঐ মুখে ঢেলে দিই বিষ, ঐ বুক ছিন্ন ভিন্ন করে দিই ছুরির আঘাতে। এই একপথ ছাড়া মুক্তির উপায় দেখি না। এই এক চিন্তা এমন অধিকার করে থাকে আমাকে, যে অফিসে বসে বসে বুঁদ হয়ে যাই, তাকিয়ে থাকি শূন্য পানে, টেলিফোন বেজে যায়, কতদিন সায়েব বলেছে, মুখার্জি, তুমি ছুটি নেবে?

'নিপুণ হাতে ওষুধ ঢালি, থার্মোমিটার দিই ওর মুখে, মুছে রাখি স্পিরিট দিয়ে, ওষুধ খাওয়াই। মাঝে মাঝে কেঁদে উঠেছে অসীমা। বলেছে, ওর মা কে বিয়ে করে বাবা আমার মা-র স্মৃতিকে অপমান করেছেন। আমি ভেবেছি মান আর অপমান এই নিয়েই অসীমার পৃথিবীর বিষুবরেখা রচিত?

'ও চেঁচিয়ে উঠেছে ওকে এনে তুমি আমায় অপমান করেছ, এখন মারতে চাইছ আমাকে। আমি ভেবেছি এমন কথা অসীমার বারবার বলা উচিত নয়; এখন আমিও সুস্থ নেই। একটি কথায় আমার মনে সর্বনাশের বীজ রোপিত হতে পারে।

'অসীমা বলেছে বলে যাব সব কথা ছেলেমেয়েকে। ভেবো না ওদের ভাল-বাসা তুমি পাবে! ওরা জানবে তুমি আমার মৃত্যু চেয়েছিলে।

'তখন সতী বড় হচ্ছে। অসীমার প্রতিটি কথা সত্যি হয়। ও জেনে গিয়েছিল ওর বাবা অপরাধী। বাবার প্রতিদিনের ব্যবহারে তাই এমন ভীরু নম্রতা, ভালবাসা দেখিয়ে সব ঢেকে দেবার চেষ্টা।

'এ প্রসঙ্গ আর বেশী টেনে লাভ নেই। অমল যেদিন এল, সেদিন থেকে সংসারের আর এক চেহারা দেখলাম। এল আশ্রিত হয়ে, কিন্তু একদিন বুঝলাম ওই আমার আশ্রয়। অন্যায় কিছু করতে চাই নি, অধিক কোন প্রত্যাশা ছিল না, একটু শান্তি, দুদণ্ড কথা বলা, অথবা কিছুই না, এ সংসারে ও আছে আমার ছেলেমেয়েদের আগলে, এই আনন্দেই আমার মধ্যে পরিবর্তন এল। অসীমার চোখে আমি ধরা পড়ে গেলাম।

'পুরীর এ বাড়ীটি বেশ। পুরীতে আসা এই প্রথম নয়, এখানে বাস করা অনেকদিন বাদে। এবার অনেক কিছু করলাম, যা আগে কখনো করি নি। যেমন কাল গিয়ে বসেছিলাম সংকীর্তন সভায়। ফিরে এসে আবার দেখছি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। এখানে অমল বেশ থাকতে পারবে। আমার শুধু ভয় হয়, আমি মরলে হয়ত ওরা একদণ্ডও দেরী করবে না। তখনি ওরা বোঝা নামিয়ে নিশ্চিন্ত হবে।

'অথচ অমল এমন হতভাগ্য যে, নিজেও জানে না ওদের ভালবাসা ও পায় নি, ওদের পক্ষে ওকে ভালবাসা সম্ভব নয়। ওদের মার মৃত্যু, বাবার অপরাধ সব কিছুর সঙ্গে অমলও ওদের কাছে অংশত অপরাধী। এখনো ওকে সহ্য করে সে শুধু আমার দিকে চেয়ে। অরুণ আর অনীতা হয়ত সবটা জানে না, কিন্তু আমি যেদিন থাকব না সেদিন সতী কি একদণ্ডও অপেক্ষা করবে? ও অসীমার ছাঁচে ঢালাই করা। নিজের হিংসাকে তৃপ্ত করবার জন্যে আর সকলকে ধুলোয় নামাতে ওর বাধে না, আমার মাকেও ও ক্ষমা করে নি।

'একটা কথা ভেবে শান্তি পাই। অমলকে কোনদিন সব জানতে দিই নি। জানতে দিলেও লাভ হত না হয়ত। অন্তত আমি কিছু লাভবান হতাম না। অপরাধ ওর চোখে অপরাধ। অপরাধীকে কি ও ক্ষমা করত? ও-ও যে পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম, এর চুলচেরা ভাগ ছোটবেলা থেকে পুঁথিপড়া করেছে।

'জানতে দিই নি। তবে মাঝে মাঝে অসহ্য হয়ে উঠেছে ওর উপস্থিতি। ওর কাছে সব বলে নিজেকে সমর্পণ করতে চাই, অথচ পারি না, কোনদিন পারব না, ইচ্ছে করে এ শাস্তি আমি নিজেকে দিয়েছি, ইচ্ছে করে নিজেকে বঞ্চিত রেখে গেলাম, আমার ছেলেমেয়েরা কি কোনদিন একে যথেষ্ট মনে করবে না? আমার মত ভীরু, বিবেক পীড়িত লোকের ভালবাসা উচিত নয়। যদিও, ভালবাসা বলতে আমি এই বুঝি পরস্পরের প্রতি মমতা, প্রীতি, স্নেহ, অথবা এমন এক সম্পর্ক যাতে শান্তি পাওয়া যায়। শান্তি, শান্তি, তার চেয়ে বেশী কিছু আর আর চাই নি আমি।

'যা যা চেয়েছিলাম, সব ছিল আমার হাতের কাছে, তবু নিজেকে বঞ্চিত রাখলাম, অমল কি আমায় ক্ষমা করবে?

'জীবনে অনেক সময়ে এমন সব ঘটনা ঘটে যার কোন গুরুত্ব তখন দিই না আমরা, অথচ পরে দেখি তার পরিণাম কি দাঁড়ায়, তছনছ করে দেয় সব। নইলে তিন বছর আগে তারণ মরে গেছে, কেন তার ঘরেই গিয়েছিলাম সেদিন

সকালে ? তারণ আমার নিচ তলার বাইরে দোকানঘরগুলোর একটায় অনেক দিনের ভাড়াটে। আমাদের বাড়ীর গয়নাগাটি গড়াবার অধিকার পায় নি কোনদিন, তবে মাঝে মাঝে মা গয়না ওজন করিয়েছেন, অসীমা অসুস্থ হবার আগে দু'বছর ভুগল অতি ভক্তির জ্বরে। তখন মাঝে মাঝে দেখেছি ওকে ওপরে উঠে আসতে। রুপোর ত্রিশূল, সোনার বেলপাতা, তুলসী, এই সব গড়ত মনে হয়। অসীমার সব বিষয়ে একই নীতি। সবচেয়ে দামী জিনিসই সবার চেয়ে ভাল। কাপড়, গয়না, মেয়ের শিক্ষক, বাজারের মাছ, সব সময়ে এমন দাম হাঁকাও যার নাগাল ছোঁয় এমন মানুষ আশেপাশে নেই। ঠাকুরদেবতার বেলায়ও তাই। পথের ধারে তেলেভাজা দোকানীর শিবতলা হ'ক না কেন, পুজো দেবার বহরটা রাখত রাজকীয়। বোধহয় দেখল ও জিনিস নাগালের বাইরে। সে, অসীমা পুজো দিচ্ছে বলেই দেবতাও সন্ত্রস্ত হয়ে পুণ্য ঢেলে দিচ্ছেন কিনা বোঝা দায়।

'সেই তারণ মরে গেল। শেষের দিকে আর ভাড়াটাড়া দিতে পারে নি। আমিই উদ্যোগ করে হাসপাতালে দিলাম। রিকশায় বসে বললে খোকাবাবু, আমার ভাইপো নবীন এলে বাটখারা আর ওজন নিক্তি দেবেন। আর কিছুই নেই দোকানে, আর সব বেচেবুচে আপনি যা পাবেন উসুল করবেন।

'হঠাৎ আমার মনে উপলব্ধি এল তারণ চলে যাচ্ছে। আমার বালক-বয়সের ভয়, একটা, চোখের মণি সাদা ছিল, যৌবনে ওর অস্তিত্ব মনে রাখি নি, এখন আমিও বুড়ো হতে চলেছি, কিন্তু তারণ বরাবরই নিচের ঘরে ছিল, আজ নিউমোনিয়ার মত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছে।

'এগিয়ে গিয়ে বললাম আপনি এ কথা বলছেন কেন? আপনার জিনিস যাকে ইচ্ছে দেবেন। আমি কেন বেচতে যাব?

'তারণ আমার কথার প্রতিবাদও করল না। একটু ঝুঁকে বসে রইল। রিকশাটা চলে যাবার পর আমার মনে আছে, ওপরে এসে অমলকে বলেছিলাম টুকে রেখে দাও, মনে করিয়ে দিও, তারণের খবর নিতে হবে।

'তার আগের রাত কেটেছিল দুঃস্বপ্নের মত। দুর্ঘটনার আগের রাত। সকালে, মৃত্যুর তিন বছর বাদে হঠাৎ মনে হল কাল নবীন এসেছিল। প্রথমটা ঘর ভাড়া নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ও ঘর আমি ভাড়া দিই নি, দেবও না। পথের দিকের দোর বুজিয়ে এদিকে কাচ লাগিয়ে দোর ফুটিয়ে আমার ইচ্ছেমত একলা হবার একটা জায়গা করে নেব এ সংকল্প তিন বছরের পুরনো।

'মনটা খুব অস্থির। অসীমা সারারাত আমায় পরখ করেছে। মার, আমায় খুন কর, যা ইচ্ছে-তাই বলেছে। জানলার শিক ধরে শক্ত হয়ে বসেছিলুম আমি। ভাবছিলাম আত্মহত্যা কি এত বড়ই পাপ? অরুণ যখন ছোট তখন একবার মা-কে বলেছিলাম এর চেয়ে আমি মরলে বেঁচে যাই। বিয়ে দিয়ে মা মনস্তাপ পেয়েছিলেন তবু বললেন, অমন কথা চিন্তা করিস না। আমার মুখের দিকে চা।'

'রাত্রে সে-সব কথা মনে হল। হয়ত সকালেও মনের কোথাও লেগেছিল তার রেশ, নেমে যখন তারণের ঘরটা খুলতে ইচ্ছে হল তখনো কিছু টের পাই নি। খুলেন, মাকড়শার জাল, বন্ধঘরে সকাল বেলাই বাতি জ্বাললাম। মিট-মিটে আলোয় দেখতে গেলাম তারণের আলমারী। দারোয়ানকে বললাম, সব খুলে দিতে। শিশিটা দেখে প্রথমে বুঝি নি। পরে বুঝলাম স্যাকরাদের ও-সব জিনিস দরকার হয়। ওই দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলাম, দরোয়ানের কথায় চমক ভেঙে ছোট বয়াম পকেটে ফেলে ওপরে উঠে এলাম।

'অসীমাও যেন শেষ দিন এগিয়ে আনতে চাইছিল। তাই, ওপরে এসেই দেখলাম আয়ার ওপর চেঁচামেচি, হিস্টিরিয়া। সারাদিন যেমন তেমন অবস্থায় গেল. ডাক্তারবাবু দু'বার এলেন, সন্ধেবেলা এমন কি অরুণ ওঁকে ডেকে আনল দারোয়ানের সঙ্গে। অসীমা ডাক্তারবাবুকেই বলে বসল কুৎসিত সব কথা। আমি ওর অসুখের সুযোগ নিয়ে লম্পটগিরি করে বেড়াই, বড় কোম্পানীর ডিরেক্টর, চাকরী করে দেব বলে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করি, এইসব।

'ভাগ্যে ডাক্তার আমার খুব চেনা। নইলে এমন অভিযোগ উনি বিশ্বাস করলে আমি যেতাম কোথায়? অসীমা চেঁচালে. জানেন না আপনি জানেন না। ডাক্তারবাবুকে নিচ অবধি এগিয়ে দেব বলে জামা গলাতে গেলাম, পকেটে হাত দিতে শিশিটা ঠেকল।

'তখনই আমি মনস্থির করি। শুনেছি এককথা ভাবতে ভাবতে মানুষের মনের রোগ দাঁড়ায়। অসীমাও বেঁচে রইল, আমি রইলাম মনের রোগী হয়ে, এ আমি ভাবতে পারি না। তাতে ওরই জয়। রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব ভেবে নিলাম মনে। অসীমা হয়ত তাই-ই চায়। আমাকে রুগ্ন, অকর্মণ্য, পঙ্গু না দেখলে ও হয়ত সারবে না, কিন্তু সে আমি হতে দেব বা কেন! খসখস শব্দ শুনে বুঝলাম ওদিক দিয়ে অমল হেঁটে যাচ্ছে। এই প্রথম ওর উপস্থিতি টের পেয়েও চঞ্চল হতে দিলাম না মনকে।

'মাঝরাতে, ও যখন অবিশ্রান্ত বকে যাচ্ছে, আমি বসে আছি, হঠাৎ ওর কথা থামিয়ে দিয়ে বললাম, আমি বিষ দিলে খাবে?

'বলল, হাসতে হাসতে।

'তবে খাও, বলে ঢেলে দিলাম ওর গলায়। তারপরই জল। অতর্কিতে দিয়েছিলাম, মাথাটা চেপে রেখেছিলাম বালিশের সঙ্গে, তুলতে সময় পায় নি, নইলে হয়ত ফেলে দিত।

'কি দিলে আমায়?'

'আমি ওকে বললাম, বিষ। তারণের ঘরে ছিল, ওদের ব্যবসায় কাজে লাগে।'

'বিষ দিলে? তুমি আমায় সত্যি বিষ দিলে? ওর গলার স্বর বোধহয় পাশের ঘরে, সতীর কান অবধি গেল। আশ্চর্য, আমি কিছুই ভাবলাম না

আর। ওকে বিকৃত মুখে চোখ বুজতে দেখলাম, আর আমার ভেতর থেকে যেন হালকা হয়ে গেল সব।

'আজ এত বছরের মধ্যে, সেই আমার প্রথম ও শেষ নিশ্চিন্ত ঘুম। অসীমাকে বিষ দিয়ে। পরদিনই সতীর চোখে আমার দণ্ডাজ্ঞা পড়তে পেলাম।

'আর কিছু বলবার নেই। অসীমাকে মেরেছি সেজন্যে অনুশোচনা করি না! কিন্তু অমলকে যে সব বলতে পারলাম না, কেন ওর সঙ্গে বাইরের লোকের মত, কখনো শত্রুর মত ব্যবহার করেছি, এর ভেতরে টানি নি সেজন্যে দুঃখ হয়, অথচ আমার উপায় ছিল না।

'শুনেছি পরপর তিনবার স্ট্রোক হলে মানুষ বাঁচে না, তা আমার তো মোটে......'

এখানেই শেষ। অসমাপ্তিতে। অমলা চোখ তুললেন।

বিকেলের আলো পড়ে আসছে! অরুণের চিঠি কি পড়ে নেবেন? কি লিখেছে অরুণ? পড়তে ইচ্ছে হল না।

চোখের সামনে ঝাপসা লাগছে সব। নিমেষে যেন জলের ঝালর দুলিয়ে দিল চোখের সামনে। জলে রোদ পড়লে যেমন রামধনু দেখায় তেমনি নানা-রঙা আবরণ দিয়ে যেন সব দেখতে পাচ্ছেন। ধাঁধার উত্তর মেলাবার মত।

ভাবতে গিয়ে সব যেন আবার গোলমাল হয়ে যায়। অরুণের সঙ্গে বাপের সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী, স্বভাবে, চেহারায়। অরুণকে সব চেয়ে ভালবেসে-ছিলেন অমলা, অরুণও বোধহয় এতদিনে জেনে গিয়েছে। যেটুকু মমতা করে, জানলে কি তাও করবে? তিনি কি করবেন, তিনি কি দোষী? না নিরপরাধ. কে বলে দেবে?

তারপর আবার সব স্পষ্ট হয়ে এল। চোখে আর জল নেই। বুকের নীচে শূন্যতা কেঁদে উঠল পরিত্যক্ত অন্ধকার বাড়ীতে ফেলে যাওয়া নেড়ী-কুকুরের মত। এ কি করে গেলেন জামাইবাবু, এ মহা অপরাধ কেন করলেন, যদি করলেন তবে জানালেন না কেন? জানালে অমলা কবে ওঁর মন পাপ থেকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন। হয়ত, মনে হল হয়ত তখন মনে সাহসও পেতেন। এমন একলার বোঝা একলা বয়ে ওঁকে মরতে দিতেন না, হয়ত সেটা তখন অমলার অপরাধ হত, কিন্তু মনে সান্ত্বনা থাকত অন্যায় করছেন না।

ধীরে হাহাকার থেমে এল। আস্তে আস্তে তাকালেন চারিদিকে। চুনকাম করা ঘর। এ ঘরে অমলা থাকুন তাই কি চেয়েছিলেন জামাইবাবু? তা হলে জানানো উচিত ছিল অমলাকে। তিনি বললেই যে অমলা রাজী হতেন তারই বা কি মানে আছে? হাজার হলেও খুন করা মহাপাপ। জামাইবাবু দিদিকে বিষ দিয়েছিলেন। বহুবছর একজন হত্যাকারীর সঙ্গে ছিলেন অমলা? হত্যাকারী। অজানা কথা। জামাইবাবুর নামের পর বসানো যায় না। আর, অমলা ধর্মাধর্ম বিচার করবার কে?

মনের ভেতর থেকে তাগিদ এল। কিসের যেন সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন

আর পেছনে তাকিয়ে লাভ নেই। অরুণের চিঠি অমলা খুলতে চান না। হয়ত লিখেছে মাসী, চলে এস। অথবা এস না। কিংবা বাবা তোমার ব্যবস্থা করে গেছেন! ভাবতে ইচ্ছে হল না।

আরেকটা যেন শূন্যতার ভাব এল মনে। এ শূন্যতা মানে বড় হয়ে যাওয়া, সীমা ভেঙে যাওয়া, ছড়িয়ে যাওয়া, এ শূন্যতায় হাহাকার নেই। ঔদাসীন্য আছে, আনন্দ-বিষাদের অতীত, মনকে বড় করে দেয়। এ শূন্যতা অমলার মন জুড়ে সবটা প্রকাশ পেল না, শুধু তার রাজসমারোহ দেখতে পেলেন মনের চোখে। যেন হাত ধরে কে তাঁকে দেখিয়ে দিলে জলের ওপারের আকাশে সূর্যাস্তের ঐশ্বর্য, এখন কে তাঁর মনে যেন যে শূন্যতার আভাস দিলে, যেন অমলা জানতে পারলেন এখন শুধু দেখে রাখতে হবে, তারপর ওদিকে চেয়ে এগিয়ে গেলেই শান্তি পাবেন। ওর মানে মনের মাঝে আকাশ নেমে আসা। তখন মনে আর বেড়া থাকে না, দুঃখ পায় না মানুষ। তখন মনের মাঝে সবাইকে জায়গা দিতে পারা যায়। জামাইবাবুকে, দিদিকে, সতীদের কাউকে মনে হয় না ঘেন্না করবার মত।

এখনো সে সময় আসে নি। অমলা চোখ তুললেন। পশ্চিমের আকাশ লাল। জানলার ওপারে সন্ধ্যা আসছে। এখন সমুদ্রের ওপারে আকাশ কত রঙে সাজবে, মন্দিরে মন্দিরে আরতি, সংকীর্তন। এখনি বেরিয়ে পড়বেন অমলা, চলে যাবেন সমুদ্রের তীরে, তিনি তীর্থে এসেছেন।

এখনো মনে কষ্ট, বঞ্চনার বেদনা, কিন্তু যেন মনে মনে জানতে পারলেন এ-ও তীর্থে আসা নয়। আসলে তীর্থে যাওয়া মানে হয়ত কোন ঠাঁইয়ে যাওয়া নয়। তীর্থের পথে হাঁটা মানে শুধু সাক্ষীগোপালের পথ ধরে হাঁটা নয়, যেখানে পথে পথে মাথার ওপর দিয়ে মেঘ ভেসে চলে, বালিকে মনে হয় ঠাণ্ডা নরম গালচে।

এই সব কষ্টের বোধ, বঞ্চনার বেদনার ওপারে কোথায় সেই তীর্থ থাকে, পথ কেউ দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে পারে না। নিজে নিজে পৌঁছতে হয় পথ খুঁজে।

তীর্থশেষের সন্ধ্যায় অমলা সেখানে পৌঁছলেন, এখন তো সবে যাত্রা শুরু, বড় শ্রান্তি বোধ হল, রোগের অবসানের ক্লান্তি যেন, আস্তে আস্তে অমলা, দরজার দিকে চোখ তুললেন, এখন বাইরে যেতে হবে, সমুদ্র, মন্দির, কীর্তন, কোনটিই হেলা করবার নয়, কিন্তু তিনি যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে দরজা কি অনেক অনেক দূর ?

কার্তিক, ১৩৭১

—শেষ—